॥ আশ্রম শবরমতী ॥

শান্ত সন্ধ্যা নেমে এসেছে আমেদাবাদ নগরের উপর ছম-ছমিয়ে। চিমনির ধোঁয়ায় আর আলোর বন্যায় আকাশ হারিয়ে গেছে, শুক্ল দ্বাদশীর জ্যোৎস্নাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অদূরে বয়ে চলেছে মৃদুগতি শবরমতী।

যদি ওই লক্ষ লক্ষ গণেশী জনতার একটি মানুষেরও মনে হত, এই জ্যোৎস্নার কোনও নিগূঢ় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দরকার, তবে সে বেরিয়ে পড়ত পথ ভুলে। সোজা চলে আসত এখানে—এই এলিস ব্রীজের তলায়, যেখানে একটি অতি মধুর জনশূন্য পথ শুধু এক ফালি চাঁদের ইশারায় অন্যমনস্ক পথিককে ডেকে নিয়ে যায়।

শুধু আমি নয়, এই এলিস ব্রীজের নীচে নেমে একদা ভারতবর্ষও পথ খুঁজে পেয়েছিল!

পথ অনেক দূর। অতিশয় জটিল, অত্যন্ত কুটিল। বহুদিন আগে বেরিয়ে পড়েছি পথে। দেখে এসেছি দিল্লী। পৃথ্বিরাজ আর জয়চাঁদের কলহ-কলঙ্কের দাগ মাড়িয়ে এসেছি। দাঁড়িয়ে দেখেছি গজনীর মামুদ নিয়ে গেছে অনেক ধন-রত্ন। মহম্মদ ঘোরীর শৃঙ্খল খুলে এসেছি। পা আমার ক্লান্ত হয় নি। আলাউদ্দীন থেকে আকবর, আকবর থেকে আওরঙ্গজেব, অনেকবার আলো নিবেছে, অনেকবার আলো জ্বলেছে। কতবার দাঁড়িয়ে শুনেছি এখানে ওখানে নূপুরের নিক্কণ, তরবারির আস্ফালন, রক্ত নিয়ে হোলি খেলার আনন্দ-কোলাহল। কেঁদেছে সবচেয়ে তারা বেশী, যারা হেসেছে অনেক দিন। দেখে এলুম পদ্মিনীর চিতাভস্ম ভেসে গেল

গাম্ভীর নদীর জলে, উপবাস করে মরে গেল রাণাপ্রতাপ, শুনে এলুম মীরার কণ্ঠে হৃৎপিণ্ডের শির-ছেঁড়া ভজন। পুণায় দেখে এলুম শিবাজীকে, বাঘেলা বংশের কর্ণকে, বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রকে, দেব-গিরির রামচন্দ্রকে। দেখেছি অনেক, আজ তারা কেউ নেই।

কিন্তু পথে-পথে দেখে এসেছি শান্ত নম্র-হাস্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু একজন—তিনি বৃদ্ধ পিতামহ, তিনি সেই মহাপ্রাচীন যোগ-তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারত, অসীম ক্ষমায় তিনি নিমীলিতনেত্র!

মন্দ্রদেশে মহীশূরে মধ্যভারতে—বিজয় পতাকা কতবার ঝড়ের হাওয়ায় ছিঁড়ে গেল, কত রুদ্রচণ্ডের অগ্নিমূর্তি পাণ্ডুর হয়ে গেল মৃত্যুর ছায়ায়। তারপরে এল ভাস্কো-ডা-গামা আর ডুপ্লে, টাভার্নিয়ে আর পেল্‌সির্ট, হকিন্স আর স্যর টমাস রো। ওরা নতজানু হয়ে কুর্নিশ জানাল দিল্লীকে। ধীরে ধীরে লাল রংয়ের তুলি মাখাল ভারতের মানচিত্রে। ক্লাইভের শোষণ দেখলুম, হেস্টিংসের শাসনও দেখে এলুম। ওরা ক্ষমা পেয়ে গেছে পিতা-মহের।

হাঁটতে হাঁটতে এসেছি অনেক দূর। হাজার বছর ধরে হাঁটছি। যে উদ্যত অসি দেখেছিলুম লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে মৃত্যুর জয়টিকায়, আজাদ-হিন্দ্ তুলে নিয়েছিল সেই তরবারি, মৃত্যুর আগে দেখে নিলুম তার ললাটে গৌরবের আভা। সে-আভা অমৃতলোকের।

এই এলিস ব্রীজের নীচে দিয়ে চলেছে শান্ত শবরমতী, উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় প্রভাসে আর দ্বারকায়। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখা যায় আমেদাবাদের সম্পদের সহস্র ধারা। ওরা পূজা করে গণেশের।

এই পুলের তলা দিয়ে যে-পথ, এ পথে ভারত এসেছে অনেকবার কেন না এ পথ সত্যের, এ পথ ব্রাত্যের। এখানে ঝড় থামে, মিথ্যা লুকোয়, লোভ পালায়, হিংসা লজ্জা পায়। চোখে জল নিয়ে

ভারত যখন এসেছিল এই এক ফালি পথ দিয়ে—তখন তার পদক্ষেপ ছিল ধিক্কারে কুণ্ঠিত, অপমানে সে নতশির, উৎপীড়নে নিস্তেজ। কিন্তু এই পথের ধূলি থেকে সে তুলে নিয়েছিল মন্ত্রতিলক আপন ললাটে তার দুর্গমযাত্রার পাথেয় হিসাবে। সে-দুর্দিনে সে-ই ছিল আশীর্বাদের মত।

পায়ের শব্দ না হয়। এ পথের ঘুম না ভাঙে। সন্তর্পণে যাচ্ছিলুম।

খেজুর গাছের উপর দিয়ে উঠেছে চাঁদ, আর ওদিকে দ্বারকার ওপারে সূর্যাস্তের শেষ রক্তিমাভা তখনও চিকচিক করছে পশ্চিমের বৃক্ষজটলায়। এ পাশে আলো নেই শবরমতীতে; এক একটি নৌকা ভাসছে অন্ধকারের ছোট ছোট টুকরোর মত। ধীরে ধীরে চলেছি। আশ্রম উপান্তে এখনও আলো জ্বলে নি। থমকে দাঁড়ালুম।

ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। কে যেন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ঘট কাঁকালে নিয়ে শান্ত পদক্ষেপে উঠে গেল আশ্রমের অঙ্গনে। আশে পাশে গাছপালার ঝাপড়া, এখানে ওখানে একটানা ঝিল্লীর আওয়াজ। হেমন্তের সন্ধ্যা আপন ছায়াচ্ছন্নতায় যেন বাষ্পাকুল, শবরমতীর তটে আর আশ্রমের আনাচে-কানাচে সেই হেমন্তের ধূমল চোখ যেন ছলছলে।

ওঙ্কার উঠছে যেন কোথায়! ঠাহর করা যায় না ঠিক কোনখানে। হয়তো আশ্রমে, হয়তো ভারতে, নয়তো আমারই মনে। সহসা চোখ ছুটে গেল আশ্রমের বারান্দার একটি দরজায়, কে একজন শান্ত মৃদু পদক্ষেপে হাতে নিয়ে এল একটি প্রদীপ, যেখানে রেখে প্রণাম করল, সেটি বোধ হয় তুলসীমঞ্চ।

প্রদীপটি জ্বলবে। মহাকাল এসে ফুৎকার দিলেও নিভবে না।

'হৃদয়-কুঞ্জ'—এককালে আশ্রমটির নাম দেওয়া হয়েছিল। বিশাল

ভারতের এটি ছিল হৃৎকেন্দ্র, নামটি তাই মানিয়ে গেছে। কিন্তু এই 'হৃদয়কুঞ্জ' ছেড়ে চলে গেছে সেই অর্ধনগ্ন ফকির পঁচিশ বছর আগে ডাণ্ডি-অভিযানকালে, সে আর ফেরে নি! প্রতি সন্ধ্যার প্রদীপ আজও রয়েছে তাঁর পথ চেয়ে। কুঞ্জকুটীরের দ্বার আজও রয়েছে খোলা, নিত্যবিরহিণীর কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হচ্ছে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।'

শান্ত শবরমতী বয়ে চলেছে অশ্রুমতীর মত।

আশ্রম অঙ্গনে একটি বেদী আজও বাঁধানো। তার মূল থেকে উঠেছে বৃক্ষ। ওটাও বোধিদ্রুম। ওর নীচে বসে সিদ্ধিলাভ করে সেই পরম ভিক্ষু বেরিয়ে পড়েছে বৃহৎ সংগ্রামের আহ্বানে। কিন্তু সেই ভিক্ষু আজও ফেরে নি। এমনি করে একজন আড়াই হাজার বছর আগে ছেড়ে গিয়েছিল লুম্বিনী, আরেকজন দু-হাজার বছর আগে ছেড়ে এসেছিল বেথ্লেহেম্। কেউ ফেরে নি। ওরা অমনি করে ছেড়ে চলে যায়; স্রষ্টা আপন সৃষ্টির ফাঁদ কেটে পালায়। জীবনশিল্পী আপন শিল্পকে অতিক্রম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পিছনের পৃথিবী ওদের জন্য চিরদিন কাঁদে। কাঁদে আর নৈবেদ্য সাজায়।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের অন্তিম আর্তনাদ শুনে চমকে উঠেছিলুম: তরবারির জোরে ভারত জয় করেছি, তরবারির জোরেই শাসন করব।

এই ভাষাতেই কথা বলেছিল, রেডিং. উইলিংডন, স্যামুয়েল হোর, লিন্‌লিথগো, আর ওয়াভেল। তাদের আজ কোনমতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদপত্রে চার্চিলও বেঁচে নেই, ওরা সবাই বেঁচে মরে রইল। অর্ধনগ্ন ফকিরের প্রসন্ন ক্ষমা পেয়ে গেল মহম্মদ ঘোরী থেকে চার্চিল—সবাই।

আশ্রমটি যেন শান্ত পরিবেশের মধ্যে আত্মসমাহিত। সম্পদের ঔদ্ধত্যে আলোকিত আমেদাবাদ, তারই পাশে এই ম্লানচ্ছায়াময়

নিভৃত তপোবন। ও পাশে অহঙ্কার, এ পাশে আত্মবিস্মৃতি। এখানে যেন অনন্তকালের একটি ভগ্নাংশ রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে দেখছে· কল্পান্তের নতুন ভারতকে, যে ভারত ওই অর্ধনগ্ন ফকিরের বক্ষোরক্তে স্নান করে ক্ষতবিক্ষত দেহে আবার উঠে দাঁড়াতে চাইছে প্রায় হাজার বছর পরে।

নতুন ভারতের মহৎ ইতিহাস রচনার জন্য হয়তো লাল কালির দরকার হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য পরম সত্যাশ্রয়ীর পুণ্যরক্ত দিয়েই কি লেখা হল, সত্যমেব জয়তে !

নিঃশব্দে ক্লান্ত পায়ে ফিরে এলুম আবার এলিস ব্রীজের তলায়। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ নিবিড় জ্যোৎস্নায় জড়িয়ে এল।—

"Father forgive us".

॥ বিন্ধ্য প্রদেশ ॥

রেলপথ পৌঁছয় নি—এমন একটি দেশ ভারতে এখন আর নেই বললেই চলে। পশ্চিম মালাবার, দক্ষিণ ত্রিবান্দরম্, পশ্চিমে রাজস্থান—এসব অঞ্চলেও অল্প বিস্তর রেলপথ গিয়েছে; মধ্য-উড়িষ্যাও এখন নাগালের মধ্যে এসেছে। কিন্তু ভারতের মধ্যে বোধ করি একমাত্র বিন্ধ্যদেশ—যেখানে রেলপথের পরিমাণ খুবই সামান্য। ফলে হয়েছে এই বিন্ধ্যদেশের বহু জনপদ এবং ভূভাগ আজ অবধি যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপিত নয়। এই সেদিন পর্যন্ত —অর্থাৎ বছর দশেক আগেও অনেকগুলি সামন্ত রাজার মধ্যে বিন্ধ্যদেশের প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ ভাগাভাগি করা ছিল। রাজনীতিক, বিধি নিষেধের মধ্যে কড়াকড়ি ছিল অনেক, এবং 'বৃটিশ-ভারত' থেকে লোকজন অথবা কাজ-কারবারীরা গিয়ে চট করে ওখানে আমল পেত না। এ ছাড়া আরও ছিল নানাবিধ কারণ। এই সকল কারণেই বিন্ধ্যদেশ বহু কাল ধরে যেন কতকটা লোকলোচনের বাইরে থেকে গেছে। চেনা পথের বাইরে গিরিশ্রেণীর আড়ালে আবডালে থাকার জন্য বিন্ধ্যপ্রদেশের অগাগোড়া চেহারা অনেকটা যেন অনাবিষ্কৃত মনে হয়। সম্প্রতি এই দেশের দুটি প্রধান আকর্ষণের দিকে মানুষের চোখ পড়েছে। একটি হল 'পান্না রাজ্যের অন্তর্গত হীরকের খনি'—যেটাকে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় বলা চলে এবং অন্যটি হল অজস্র পরিমাণ খনিজধাতু সমন্বিত এই প্রদেশের মৃৎকৌমার্য। বড় রকমের কল-কারখানা এবং যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান বিন্ধ্যপ্রদেশে এক প্রকার নেই বললেই চলে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই প্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হবার কালে আরেকটি উদ্দেশ্য মনে ছিল, সেটিও নেহাত সামান্য নয়। সেটুকু আগেই বলি।

জনসাধারণ সম্বন্ধে একটি অপবাদ সব দেশেই প্রচলিত: তারা বড় বেশি বিস্মৃতি-পরায়ণ। কিন্তু ওই জনসাধারণের মধ্যেই কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এর ব্যতিক্রম রয়ে গেছে। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে বছর দেড়েক আগে কবে যেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীপুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন গিয়েছিলেন বিন্ধ্য-প্রদেশে। তিনি যে ঠিক ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন সেখানে, তা নয়, তবে তাঁর এই রাজনীতিক ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ঠিক কি প্রকার ছিল, তাও এখন আর জানবার কোনও উপায় নেই। তিনি ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলেন সেখানকার পৃথিবী প্রসিদ্ধ 'খাজুরাহো' মন্দিব অঞ্চলে, মন্দিরাদি দর্শন করে অতঃপর তিনি সংবাদপত্রে একটি অদ্ভুত ধরনের বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে মোটামুটি এই কথা তিনি বলেন—এই মন্দিরগুলি যারা নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের বিকৃত রুচির পরিচয় রেখে গেছেন এদের প্রত্যেকটি প্রস্তর খণ্ডে। তাঁদের অশুচি মনের দুর্নীতি এবং অশ্লীলতা এই মন্দিরে প্রকাশ পেয়েছে। যে জঘন্য কুরুচি এবং নোংরা চিত্তের বিকার এই মন্দিরগাত্রে প্রকাশ পেয়েছে তা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরোধী। আমার হাতে কোনও ক্ষমতা থাকলে এই মন্দিরগুলি এখনই ধ্বংস করে দিয়ে ভারতের উদার ও মহান ঐতিহ্যের সম্মান রক্ষা করতুম। এসব মন্দির অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলা উচিত।

বিস্ময়ের কথা এই, খাজুরাহোর মন্দিরগুলি কেবল যে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের জন্যই পৃথিবীর শিল্পকলা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে রয়েছে, শুধু তাই নয়, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্প-বিচারকরা

এদেশে এসে এর আঙ্গিক কৌশল এবং ভাবপ্রকাশের অতি বিস্ময়কর ভঙ্গীগুলি দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করে যান। খাজুরাহোর প্রতিষ্ঠা জগৎ জোড়া।

টাণ্ডনজীর এই প্রখর বিবৃতিটি বিন্ধ্যপ্রদেশ ভ্রমণে আমাকে উৎসাহিত করেছিল। দুটি বিপরীত মতবাদের আলোড়নে ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে একদা শেষরাত্রে বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলাখণ্ডের সংযোগস্থল হরপালপুর স্টেশনে গিয়ে নেমে পড়লুম। গাড়িখানা সেই প্রাক্ প্রত্যুষের অন্ধকারে ঝাঁসীর পথে চলে গেল। উষা-কালের তখনও দেরি রয়েছে—উত্তর বাঘেলাখণ্ডে পাখিরা তখনও তন্দ্রায় ঢুলছে। হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া উঠছে বিন্ধ্যপ্রদেশের মাঠে মাঠে।

প্রত্যুষের ধূসর আবছায়া ক্রমে প্রভাতের রক্তিম আলোয় পরিণত হল। মোটর-বাস পাওয়া গেল হরপালপুর থেকে নওগাঁ এবং অতঃপর ছাতারপুরের পথে। এখান থেকেই বিন্ধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ শুরু হল।

হরপালপুর থেকে নওগাঁ উনিশ মাইল সমতল ও সুন্দর পথ। প্রথমেই যেটি অবাক মনে হয় সেটি হল এই প্রদেশের স্বাভাবিক জনবিরলতা, বাংলা দেশে যেটি আমরা আজ দেখতে পাই নে। দাক্ষিণাত্য যেমন ভারতের মালভূমি, উত্তর ভারতে বিন্ধ্যপ্রদেশেটিও তেমনি একটি অনতিউচ্চ অথচ বিশাল পার্বত্য মালভূমি। এই মালভূমির প্রধান শিরদাঁড়াগুলিই হল বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর শাখা-প্রশাখা—এই জন্যই এই প্রদেশটির অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশ এমন জনবিরল নয় এবং মৃত্তিকার এমন অক্ষত কৌমার্যও সচরাচর কোথাও চোখে পড়ে না। আধুনিক-কালের পায়ের শব্দ আজও বিন্ধ্যপ্রদেশে তেমন শোনা যাচ্ছে না। মাটির স্বভাবের সঙ্গে মানুষ নিশ্চিন্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

বিন্ধ্যপ্রদেশ এই সেদিন অবধি অনেকগুলি সামন্ত রাজতন্ত্রের

দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল আগেই বলেছি। তাদের মধ্যে টিকমগড়, ছাতারপুর, অজয়গড়, পান্না, মাইহার, রেওয়া ইত্যাদির রাজন্যরা ছিলেন প্রসিদ্ধ। আজও তাঁরা আছেন, তবে রাজত্ব এবং প্রভুত্ব তাঁদের নেই। ভৌগোলিক দিক থেকে এই প্রদেশ চারদিকে তিনটি বৃহৎ প্রদেশের দ্বারা অবরুদ্ধ—তারা হল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং মধ্যপ্রদেশ। শুনতে মন্দ লাগে না, এই প্রদেশটিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে এলাহাবাদ-বোম্বাই রেলপথটি। পশ্চিম খণ্ডের নাম বুন্দেলখণ্ড, এবং পূর্বখণ্ডের নাম বাঘেলাখণ্ড। একাদশ শতাব্দীতে যখন চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠী সগৌরবে এই ভূভাগে রাজ্য শাসন করেছিলেন, সেইকালে গজনীর মামুদ তৎকালীন বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ এবং রাজধানী লুঠ করেন। চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠীর ইতিহাসই হল বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রকৃত পরিচয়। তিনটি প্রধান নদী এই প্রদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। একটি হল সুবর্ণা অর্থাৎ শোন্, দ্বিতীয়টি তমসা, এবং তৃতীয়টি কর্ণবতী অথবা কংসবতী। বিলাসপুর থেকে কাটনি যাবার পথে বিন্ধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশটুকু পেরিয়ে যেতে হয়। প্রদেশের রাজধানী হল রেওয়া, রেলপথের বাইরে।

বাংলার সঙ্গে বিন্ধ্যপ্রদেশের একটি আত্মিক যোগ আজও বর্তমান। ঠিক জানা নেই, বোধ হয় ষাট-সত্তর বছর অগে ছাতার-পুরের মহারাজা বিশ্বনাথ সিং বৃন্দাবনে গিয়ে বাংলার অদ্বৈত বংশের নীলমণি গোস্বামীকে সেখানে দেখতে পান।

মহারাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। ছাতারপুরের রাজপ্রাসাদের সামনে যে বিশাল বৈষ্ণব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার ভিতরে গিয়ে দেখলুম, তিনটি মূর্তি—অদ্বৈত গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ। বর্তমানে অনেক বাঙালী ওখানে বিশেষ বিশেষ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ছাতারপুর থেকে রাজধানী রেওয়া অনেক দূর।

রূপকথার গল্পের মত এই পার্বত্যপ্রদেশ। বনময় পাহাড়গুলির ভিতর দিয়ে চলে গেছে নামহারা সব নির্ঝরিণী, অরণ্যের শ্বাপদের দল আপন মনে বিচরণ করে, ময়ূরের দল উড়ে যায় পাহাড়ে পাহাড়ে, হরিণ-নয়না 'ছত্রী' মেয়েরা রাজপুতানীর মত নর্তকীর ঘাগরা ঘুরিয়ে হেসে চলে যায় 'দশহরা' উৎসবে, গান গেয়ে-গেয়ে তারা ঘাট থেকে ঘট ভরে নিয়ে যায়—তারা দেখতে পায় না মানুষের ভিড়, জীবন সমস্যার বিবিধ যন্ত্রণা ; জানে না এ যুগের তরঙ্গাঘাতে একালের মানুষ আহত প্রতিহত। আধুনিক কালের আর্তনাদ বিন্ধ্যপ্রদেশে পৌঁছায় নি।

নওগাঁ থেকে ছাতারপুরের দূরত্ব বেশী নয়, তেরো-চৌদ্দ মাইল মাত্র। মোটর স্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছাতারপুরের পাহাড়ের চূড়ায় যে মন্দিরটি নগর সঙ্কেত-স্বরূপ দণ্ডায়মান, সেটি হল হনুমানজী ও সীতারামের মন্দির। সেই মন্দিরের অতি বৃদ্ধ পূজারীর নামও সীতারাম—বয়স ৯৯ বছর। ষাট বছর আগে সে এখানকার তোপখানায় কামান দাগত এবং সেই থেকে এখানে পূজারীর কাজ নেয়। একা থাকে নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়। একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলুম, ভগবান দেখেছ ?—বৃদ্ধ জবাব দিল, হ্যাঁ দেখেছি।

কেমন করে দেখলে ?

অম্লান বদনে প্রসন্ন হাস্যে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ বললে, আপনা দর্শন দেতা।

অতঃপর আমার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বলেছিল, আর এক বছর মাত্র সে বাঁচতে চায়।

ছাতারপুর নামটি এসেছে মহারাজা ছত্রশালের থেকে। নওগাঁ নামক শহরটি ছেড়ে মোটর পথে যাবার কালে 'মাহেবা' নামক গ্রামে অতি প্রাচীন সুন্দর প্রাসাদ এবং তার স্থাপত্য শিল্প চোখে পড়ে। এটির নাম 'ছত্রশাল মকবারা।' সম্রাট আকবরের কালে 'ছত্রশাল' রাজত্ব করেছিলেন।

ছাতারপুর থেকে 'বমিঠা' হয়ে খাজুরাহো পর্যন্ত আটাশ মাইল মোটর পথ। পথ অতি মসৃণ এবং আনন্দদায়ক। প্রদেশের সর্বত্রই ঠিক এই প্রকারই মোটর পথের জালবোনা। দ্রুত গতিতে গাড়ি যায়, কিন্তু চারদিকের মধুর পরিবেশের মাঝখানে আরোহীরা যেন তন্দ্রার ঘোরে থাকে, পথের চেহারা এমনই নিরুদ্বেগ। কিন্তু ওই আটাশ মাইল পথের মধ্যে আমার মনে ছিল পুরুষোত্তমদাসের সেই বিবৃতিটি। বমিঠা থেকে মাত্র সাত মাইল হল খাজুরাহো। অসুবিধা ছিল এই, আসার আগে খাজুরাহো সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ-খবর আনি নি—অর্থাৎ ওখানে বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে কিনা এটি সঠিক জানা ছিল না। পথের চেহারা অনেকটা বন্য, অনেকটা বা গ্রাম্য। সর্বাপেক্ষা যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেটি এখানেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ জনবিরলতা। মোটর পথের বাইরে শস্যপ্রান্তর ও পাহাড়তলি। সবই নিরিবিলি। শুধু এখানে বলে নয়, সমগ্র বিন্ধ্যপ্রদেশেই লোক-সংখ্যা কম। এ অবস্থাটি রক্ষিত হয়ে এসেছে সামন্ত নরপতিদের শাসনকাল থেকেই। রেলপথ ও কাজকারবার যেখানে সেখানে ঢোকে নি বলেই আধুনিক যুগের তাড়না কম। এমনিতরো অন্যান্য কারণেও বিন্ধ্যপ্রদেশের স্বাভাবিকতা থেকে গিয়েছে এখন পর্যন্ত।

হেমন্তের অপরাহ্ণ পেরিয়ে দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম খাজুরাহো গ্রামে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব রয়েছে। মন্দির-প্রান্তরের পাশেই মহারাজার প্রাসাদ ও প্রাঙ্গণ। বর্তমান মহারাজা হলেন বয়সে তরুণ, নাম ভবানী সিং। তাঁর বৃদ্ধা জননীর পূজার্চনার সুবিধার জন্য ভবানী সিং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রসহ এখানেই থাকেন। তাঁর সাধারণ পরিচয় হল, তিনি ছাতারপুরের মহারাজা। এমন একটি নিরি-বিলি গ্রাম্য আবহাওয়ায় কোনও মহারাজার পক্ষে বসবাস করা সম্ভব হয়, ঠিক জানা ছিল না আগে। শোভা-সমারোহ অথবা আড়ম্বর কোথায়ও দেখছি নে, এটি কিছু বিস্ময়জনক। জমিদারকে মহারাজা বলে আগে ঠাওরাতে পারি নি।

গ্রামে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বাসস্থানের সঙ্কট দেখা দেয়। শুনতে পাওয়া গেল প্রায় তিন ফার্লং দূরে একটি নবনির্মিত সারকিট হাউস রয়েছে, কিন্তু তার জন্য ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি পাওয়া দরকার। তিনি এখানে থাকেন না, আগে থেকে তাঁকে জানানোটাই রীতি। কিন্তু রীতিটি যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হয় নি, এও সত্য। যাই হোক, কপাল ঠুকে সোজা এসে সারকিট হাউসের ফটকে দাঁড়াতে হল এবং ভিতরের খানসামা এসে যখন অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করলে, তখন তার জানা নেই— আমি সেই দুর্লভ অনুমতিপত্রের অধিকারী কিনা। অবশ্য মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রশ্নটা উঠল, এবং তখনই একটি লোককে ডেকে একখানি চিঠি পাঠাতে হল স্বয়ং মহারাজার দরবারে। সে-চিঠিতে ছিল ঈষৎ কূটনীতিক ভাষা, এবং আমার আগমনের প্রধান হেতু বর্ণনা। আধ ঘণ্টার মধ্যে জবাব এল আমি এখানে অনায়াসে থাকতে পারি, এবং আগামীকাল সকাল এগারোটায় মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। সারকিট হাউসের চাকাটা একটুখানি ঘুরে গেল, এবং কপালগুণে দু-একটা সেলামও জুটতে লাগল। আজ রাত্রের মত এই অর্ধচন্দ্রাকার বৃহৎ সারকিট হাউসে আমিই একমাত্র বাসিন্দা। বাগানের উত্তর দিকে কোনও বাঁধন নেই, এখানকার বারান্দায় বসেই বিশাল খোলা প্রান্তর চোখে পড়ছে। এমন নিরিবিলি রাজ্য উত্তর ভারতে বোধ করি আর কোথাও নেই।

পরদিন প্রভাতকালে 'খাজুরাহো' দেখতে বেরোলাম। খাজুরাহো হল বর্তমানে একটি গ্রাম, কিন্তু পুরাকালে ছিল এটি সুবিস্তীর্ণ এক ভূভাগ। প্রকাশ, প্রাচীন যুগে এখানে নাকি ছিল দুটি স্বর্ণমণ্ডিত খেজুর গাছ। সেই অনুযায়ী এখানকার নাম হয় খাজুরাহো, এবং প্রায় নয় শো বছর আগে চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠী ওই নামেই এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কমবেশি পঁচিশ বর্গমাইল জুড়ে

সেকালের কীর্তির নানাবিধ ক্ষয়িষ্ণু অবশেষ ও বিভিন্ন মন্দিরাদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এখানে আসেন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ। চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠী এই অঞ্চলের সতেরো বর্গমাইল ভূভাগে অল্লাধিক চার শো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ছয় শো পঁচিশ বছর আগে মরক্কোবাসী ভ্রাম্যমাণ ইবন বতুতাও আসেন এই খাজুরাহোতে। বিস্ময়ের কথা এই, এখানে সপ্তম শতাব্দীতে একটি অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ নির্মিত হয়েছিল, এবং তৎকালীন নরপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে এসে প্রথম নিশ্বাস নিলেই উপলব্ধি করা যায় অতীতকালের সমস্ত মহিমা এবং ইতিহাসের গৌরবসহ খাজুরাহো যেন আপন বিস্ময়টিকে বক্ষে ধারণ করে রয়েছে।

রাজবাড়ির প্রাচীরের পাশেই খাজুরাহো মন্দির অঞ্চলের বিশাল প্রান্তর। বাইরে থেকে সহসা বুঝতে পারা যায় না, কি বিপুল ঐশ্বর্য উৎকীর্ণ রয়েছে প্রতি মন্দিরে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি মন্দির। প্রত্যেকটি নির্মিত হয়েছিল উঁচু বেদীর উপরে। কালক্রমে জীর্ণ হয়েছে কোন কোনটি, কিন্তু তাদের সতেজ ও জীবন্ত অভিব্যক্তি প্রত্যেক শিল্প-রসিক দর্শককে প্রথম দর্শনেই অভিভূত করে। সর্বাপেক্ষা যে মন্দিরটি এখানে প্রসিদ্ধ, সেটি হল খাণ্ডারিয়া কন্দর্য মহাদেবের মন্দির। তারপরে একটির পর একটি। পার্শ্বনাথ, রামচন্দ্র, বরাহ, ঘণ্টাই, চৌষট্টি যোগিনী, শঙ্করজী, পার্বতী, জগদম্বা, লক্ষ্মণজী, মাতঙ্গেশ্বর, লক্ষ্মী, এদের দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। এদের সঙ্গে রয়েছে নন্দী, কালী, প্রতাপেশ্বর, লালগোয়ান, ওয়ারা, ভরতজী ইত্যাদি বিবিধ দেউল। সমগ্র ভূভাগই হল মন্দিরপ্রধান। গ্রাম ছাড়িয়ে পূর্বদিকে রওনা হয়ে মাইল দুই গেলে জনহীন অঞ্চলে একাধিক জৈন-মন্দিরও দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কেউ অনাদিনাথ, কেউ শান্তিনাথ, কেউ বা পরেশনাথ, অধুনা এরা

কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। নানা স্থানে এইসব জৈন এবং বৌদ্ধ-স্থাপত্য কীর্তি ছাড়াও অন্যান্য হিন্দু-মন্দিরও কম নয়। তারা কেউ হনুমানজী, চতুর্ভুজ, বামনজী, ব্রহ্মা দুলাদেও ইত্যাদি।

শঙ্করের মন্দিরটি বিস্ময় উৎপাদন করে। ঠিক মনে পড়ছে না এতবড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখেছি কিনা। আঠারো ফুট একটি গোলাকার 'গৌরীপট্টের' উপর প্রায় ছয় ফুট উঁচু শিবের লিঙ্গ, এটি অভিনব দৃশ্য সন্দেহ নেই। সমগ্র স্থাপনাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি উঁচু বেদীর উপরে, এগুলি আগাগোড়া সবই পাথরের। বাইরে এসে মন্দিরের সুউচ্চ বিশালতা দেখে সত্যই থমকে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের বহিরঙ্গে অনেক স্থলে নর-নারীর মৈথুন-চিত্র খোদিত। তাদের নানা ভঙ্গীর নানাবিধ অভিব্যক্তি। একটি-দুটি বা পাঁচটি নয়, তারা সংখ্যাতীত। কিন্তু এরা ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পে নতুন নয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, কোনার্কের সূর্য-মন্দিরে, কাশীর গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র পশুপতিনাথের মন্দিরে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এসব পাথরের ও কাঠের ছবি শত শত বছর ধরে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থেকে গেছে। মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতী, নেপালী স্থাপত্য শিল্পে এসব ছবি অগণিত ক্ষেত্রে উৎকীর্ণ। সমগ্র নেপালে এর প্রাধান্য। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প এইসব চিত্র আপন অঙ্গে ধারণ করতে কোনদিন ভয় পায় নি। শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার বিতর্ক নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এমন কিছু মাথা ঘামায় নি কোনও কালে। স্থাপত্য শিল্পকলা যেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিব্যক্তিতে সার্থক হয়েছে, সেখানে সে অশ্লীলতাকে অতিক্রম করেছে। দেবতাকে সামনে রেখে যেখানে জন্ম ও সৃষ্টির আদি রহস্যকে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে তথাকথিত নীতি বিচারের ঠাঁই কতটুকু? শিল্প-কলার ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার অপেক্ষা সৌন্দর্য বিচারই প্রথম ও প্রধান। এই মন্দিরগুলি দেখবার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশের স্থাপত্য শিল্প-বিচারকরা ভারতবর্ষে আসেন এবং তাঁরা এদের

চমকপ্রদ ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অকুণ্ঠ স্তবগান করে যান। অশ্লীল যদি অসুন্দর হত, তবে তার মৃত্যু ঘটত অনেক আগে, কিন্তু সৌন্দর্যের কালজয়ী মহিমাই তাকে হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। একালের ক্ষুদ্র মানুষের ওপর মহৎ ঐতিহ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, সেই কারণে ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মহৎ শিল্পকে নিন্দিত করার চেষ্টা পাই। সুখের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডনের কথা ভারতবাসীদের কেউ কানে তোলে নি এবং তাঁর এই ছেলে-মানুষি ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিও ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট প্রশ্রয় পায় নি।

রাজবাড়ির নীচের তলাকার একটি ঘরে গিয়ে বসলুম। একটি বাঙালী ভদ্রলোক রয়েছেন রাজকুমারের গৃহশিক্ষক হয়ে, নাম, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই একজন মাত্রই বাঙালী এ তল্লাটে। তাঁর বাড়ি হল বরিশালে। তাঁর সঙ্গে আলাপের মাঝপথেই এসে দাঁড়ালেন মহারাজা। পরনে হাফ প্যাণ্ট এবং গায়ে বোতাম খোলা ফুলশার্ট। কেউ যদি বলত ইনি রাজবাড়ির মাইনে করা পালোয়ান, বিশ্বাস করতুম। কেউ যদি বলত, ইনি একজন কুস্তিগির, তাও মানাত। আপাদ-মস্তক এমন কোনও লক্ষণ নেই, যাতে 'মহারাজা' বলা চলে। আনন্দের কথা এই, ঘণ্টা-দুয়েক বসে গল্প করলেন, কিন্তু একটিবারও মনে হয় নি যে, তিনি ছাতারপুরের মহারাজা। তাঁর সরলতা ও স্বাভাবিকতা দেখে আমি অনেকটা যেন হতবুদ্ধি হয়েছিলুম।

পান ও মশলা মুখে দিয়ে ভবানী সিং বললেন, আপনিই প্রথম এলেন টাণ্ডনজীর বিবৃতির পর। এতবড় একটা অন্যায় মন্তব্য তিনি করে গেলেন, কিন্তু কেউ কিছু বললে না, এটি আশ্চর্য। কাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে এই জন্যই আনন্দ হয়েছিল।

মহারাজা তাঁর ছবির অ্যালবাম এনে হাজির করলেন। তার সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের ফটো। ওই সঙ্গে আনলেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত স্টেলা ক্রামরিশের স্থাপত্য-শিল্প চিত্র-সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থ এবং ফ্রেঞ্চ আকাদামী ও ফাইন আর্টসের প্রকাশিত মস্ত ছবির বই, তাতে দেখতে পাওয়া গেল প্রায় আশিখানি চমৎকার খাজুরাহোর ছবি। তারপর ওই সব নিয়েই তিনজনে গল্প চলতে লাগল দীর্ঘক্ষণ।

এক সময় ভবানী সিং সহাস্যে বললেন, খাজুরাহোকে গালি দেবার পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে টাণ্ডনজী এখানে আসেন নি এবং আমাদের এক বিরুদ্ধ-পক্ষীয় ব্যক্তির প্রভাবের মধ্যে ছিলেন। খাজুরাহোর সঙ্গে আমাকেও তিনি যথেচ্ছ গালি দিয়ে গেছেন, এটি কৌতুকের বিষয়! আমার নৈতিক চরিত্র না কি মন্দ।

আমরা হাসছিলুম। মহারাজা বললেন, একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী, আরে, রাজা-রাজড়ার চরিত্র একটু-আধটু মন্দ না হলে মান-সম্ভ্রম থাকবে কেন?

প্রশ্ন করলুম, তাঁর এবম্বিধ আচরণের কারণ?

কারণ? তবে শুনুন, তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া হয় নি। তিনি পূজা চেয়েছিলেন, বন্ধুত্ব চান নি!

এরপর ব্যক্তিগত কথাবার্তা এসে পড়ল অনেক। তিনি এখন প্রিভি পার্স পান, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে তাঁর শিকার অভিযান বেশ ভালো লাগে। নিরিবিলি এই গ্রামে বাস করা তাঁর বেশ পছন্দ।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোতে বেলা দুটো বাজল। সেই দিনই অপরাহ্নকালে খাজুরাহো ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম।

সমগ্র বিন্ধ্যপ্রদেশকে স্বপনপুরীর মত মনে হয় পদে পদে। মাঝে মাঝে দেখা যাবে তেপান্তরের মাঠ, দূর দিগন্তে পাওয়া যাবে নীলবর্ণ গিরিশ্রেণী, কোথাও অরণ্যলোকে স্বচ্ছন্দচারী হরিণের দল, কোথাও নির্জন পাহাড়তলিতে নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝঙ্কার। পর্যটকের

চোখে বাস্তবের আবরণ যেন পলকে পলকে সরে যায়, এবং শিশু-পাঠ্য কাহিনী থেকে উঠে আসে সেই সেকালের রাজপুত্র—যিনি ঘোড়ায় চলেছেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নদী-উপনদী ছাড়িয়ে জনহীন বনভূমির ভিতর দিয়ে, যেখানে সন্ধ্যা হলে বাঘের ভয়, গাছের কোটরে মস্ত সাপ! এই রূপকথার জন্ম বুঝি-বা বিন্ধ্য-প্রদেশেই।

পান্না রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলুম। এদিকের পাহাড়ে সাপের ভয় নাকি প্রচুর। একটি পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় 'পাণ্ডব জলপ্রপাত।' পান্না শহরটির চারদিকে পাহাড়। মাঝখানে প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ। বর্তমান মহারাজা প্রবীণ কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর নাম যাদবেন্দু সিং। কথাবার্তার কালে তিনি সহাস্যে বললেন, রাজাদের রাজত্ব গিয়ে ভালই হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অনেকে। যন্ত্রণার থেকে মুক্তি। এক সময়ে হেসে তিনি বললেন, বাড়িঘরদোরগুলো নিয়ে নিলেও বাঁচতুম, এত খরচ যোগাতে হত না। রাজ-পরিচয় চাই নে। আমি ভারতীয়, এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পান্না শহর থেকে উনিশ মাইল দূরে এশিয়া-প্রসিদ্ধ পান্নার হীরক খনি। সেই খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন পান্না ডায়মণ্ড সিণ্ডিকেটের সুদর্শন চেয়ারম্যান এবং প্রধান অংশীদার মিঃ কুলকার্নি। তিনি মারাঠী এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এক সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অনেকদিন অবধি তিনি পলাতক অবস্থায় ছিলেন আফ্রিকায়। যাই হোক, ভিতরে যখন এলুম, তখন কাজ চলছিল হীরক খনিতে। পাথরের ডেলার ভিতর থেকে হীরকবিন্দু চিনে-চিনে বার করার কাজে মেয়েরা না কি বিশেষ পারদর্শিনী, তাদের দৃষ্টি পুরুষ অপেক্ষা প্রখরতর। সুতরাং ওই কাজটি অধিকাংশ মেয়েরাই পায়। আমি এই প্রথম হীরের খনি দেখলুম। আরেকটি আছে দক্ষিণ ভারতে।

পান্নায় একটি মস্ত মন্দির দেখলুম—তার নাম বলদেও মন্দির। এমন অনেক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল, যারা আজও রেলগাড়ি চোখে দেখে নি। সমগ্র পান্না রাজ্যটি অনেকটা লোকচক্ষুর বাইরে এবং পাহাড়ের অন্তরালে। সর্বত্র ভূমি অতি উর্বর এবং জনসাধারণ অধিকাংশই চাষী। কলকারখানা অথবা কুটীরশিল্প কোথাও গড়ে ওঠে নি—একমাত্র ওই হীরার খনি ছাড়া।

পান্না থেকে সাতনা বহুদূর—বোধ করি পঁয়তাল্লিশ মাইল। সাতনা হল বাঘেলাখণ্ডের অন্তর্গত। এটি বোম্বাই-এলাহাবাদ রেলপথে পড়ে। চুনের জন্য সাতনা বিখ্যাত। শহরটি প্রাচীন, কিন্তু প্রশস্ত।

সাতনা থেকে রেওয়া হল মোটর-পথে বত্রিশ মাইল। বিন্ধ্য-প্রদেশের রাজধানী হল রেওয়া, কিন্তু রেলপথের সঙ্গে এটি যুক্ত নয়। পাহাড়ী নদী আর প্রান্তর পেরিয়ে আসতে হয়। গ্রামের মধ্যে সভ্যতা এসে পৌঁছয় একখানি মোটরবাসের সঙ্গে। এমন নিরুদ্বেগ এবং নিরিবিলি সংসার সহসা ভারতের কোথাও চোখে পড়ে না।

রেওয়া হল মস্ত আধুনিক শহর। উপকরণ সবই আছে, কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দূরে দূরে। জায়গা পেয়েছে অনেক। বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা বিন্ধ্যপ্রদেশে প্রচুর। বড় বড় চাকুরে বাঙালী বহুকাল থেকে, এখানে নানা সরকারী বিভাগে পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হল। একজন স্থানীয় দরবার কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জয়ন্ত দাশগুপ্ত এবং অন্যজন ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ শ্রীযুক্ত সুবীর সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের পুত্র।

রেওয়া থেকে উনত্রিশ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ 'চাচাই' জলপ্রপাত। পূর্বোক্ত বন্ধুবর সুবীর সেনই আমাকে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে গেলেন 'চাচাই' প্রপাতে। নিরিবিলি নির্জন প্রান্তরের কোণে হঠাৎ নেমে গেছে প্রপাত প্রায় দেড় শো ফুট নীচে। তখন বিশ্বাস করি, এতদিন ছিলুম একটি মালভূমিতে।

রেওয়া থেকে বেরিয়ে চল্লিশ মাইল ছাড়িয়ে চললুম। কিন্তু শেষের দিকে সহসা মোটর নামতে লাগল পাহাড় থেকে। বুঝতে পারি নি চার শো ফুট উঁচুতে বাস করছিলুম এতদিন। পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দেখি, উত্তরে উত্তর-প্রদেশের বিরাট সমতল দিক-দিগন্তে প্রসারিত। আমাদের গাড়ি নেমে এল আরও দশ মাইল পেরিয়ে তমসা নদীর তীরে। নদী পার হয়ে চকঘাট—আর এক মাইল দূরে এলাহাবাদ-জেলার সীমানা। এখান থেকে এলাহাবাদ শহর আরও তিরিশ মাইল এবং যমুনার পুল অতিক্রম করে যেতে হয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের মোটর চলল নাইনী হয়ে এলাহাবাদের দিকে।

॥ অগ্নিক্ষেত্র জুনাগড় ॥

অগ্নিতীর্থ সোমনাথের দিকে যাচ্ছিলুম সৌরাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে। পথে পড়ে শবরমতী। সবাই জানে, এটা সিংহ শিকারী কিরাতের দেশ, শবরের মুলুক। এককালে পাশুপত শাস্ত্রেব দ্বারা এ অঞ্চল নাকি নিয়ন্ত্রিত হত। শিবের উপাসক ছিল সবাই। পাশুপত অস্ত্রাদি এখানে নির্মাণ কবা হত, সেই কারণে কাথিয়াওয়াড়ের প্রাচীন নাম ছিল অগ্নিক্ষেত্র। এই ভূভাগটিকে মহাভারতের আমলে বলা হত প্রভাসপত্তন, কিন্তু পরবর্তীকালে এরই নাম হয়েছিল সোমপুরা। সোমপুরাব শৈব-সম্প্রদায অতঃপব সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করে।

এ পথ আমার অপরিচিত নয়। উত্তব-পশ্চিমে গেলে সমুদ্রপ্রান্তে দ্বারকাপুরী, দক্ষিণ পশ্চিমে জুনাগডেব ভিতব দিয়ে এলে বিরাবল, অর্থাৎ সোমনাথ। যেমন হাওডা স্টেশনে এসে নামলে কালীঘাট। পথেব টানে এবারেও এসেছি বটে, কিন্তু পশ্চিম গুজরাট তথা কাথিয়াওয়াড় আমার কোনদিন ভাল লাগে নি। অনভ্যস্ত আহার্যের তালিকায় যে দৈন্যটা থাকে, সেটি বাঙালীর রসনায় অসহ্য। পথে-ঘাটে অনেক অখাদ্য গিলতে হয়।

দ্বারকা একটি নয়, একাধিক। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে একটি করে নতুন-নতুন দ্বারকার সৃষ্টি হয়। সৌরাষ্ট্রের এই উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে পুরাণ বর্ণিত একটি দ্বাবকা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সেটি নাকি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একথাটা বিশ্বাস করতে বাধে না, কেন না 'টাইফুনের' ধাক্কায় উদ্বেলিত সমুদ্র এক একটি তীরপ্রান্তবর্তী নগরকে ধ্বংস

করেছে, এর পরিচয় ভারতে ও পৃথিবীতে অনেক আছে। মহাভারত এবং পুরাণের দ্বারকা আজও নির্ণীত হয় নি। এখনও দুটি দ্বারকা পাশাপাশি বিদ্যমান। একটি হলো রুক্মিণীপুরী, আরেকটি সত্যভামাপুরী। উভয় মন্দিরে দর্শনী না দিলে দর্শন মেলে না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আঞ্চলিক নাম হল রণছোড়নাথ। কেউ কেউ বলে, রণছোড় রায়। দ্বারকা হল ভারতের চতুর্ধামের অন্যতম।

অগ্নিতীর্থ সোমনাথের পথে পড়ে জুনাগড়। মুসলমান রাজত্ব-কালে জুনাগড়ের নাম দেওয়া হয়েছিল মুস্তাফাবাদ। কিন্তু এর প্রাচীন নাম ছিল গিরিনগর। গিরিনগর এখন গিয়ে উঠেছে গিরনার পর্বতে, নীচে পড়ে আছে জুনাগড়। পুরাণে বলে বস্ত্রপথক্ষেত্র। এমন উদ্ভট নামের পিছনে পৌরাণিক উপকথা ছিল কিনা আমার জানা নেই। গিরনার পাহাড়ের উপরে ওঠবার সর্পিল সিঁড়ি রয়েছে, তার সংখ্যা নাকি দশ হাজার। কিন্তু এপথে যাবার আগে যে প্রাচীন সুদর্শন হ্রদ পাওয়া যেত, সেটি অরণ্যবিটপীর মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখানকার পাহাড়ও যেন বিচিত্র চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে, আশেপাশে কোথাও পার্বত্য ঐতিহ্য নেই, এ যেন যূথভ্রষ্ট একখণ্ড ক্ষুদ্র হিমালয়। দেরাদুনের দিকে কালসী অঞ্চলের এক প্রস্তর গাত্রে যেমন সম্রাট অশোকের শিলালিপি দেখা যায় এখানেও ঠিক তেমনি। ওই 'বস্ত্রপথক্ষেত্র' অঞ্চলের এক দীর্ঘাকার প্রস্তর গাত্রে সম্রাট অশোকের চতুর্দশ শিলালিপি পথিক মাত্রেরই চোখে পড়ে। এই শিলালিপির বয়স বাইশ শত বছরেরও বেশী।

একটি অলক্ষ্য পাখির চূর্ণ কণ্ঠ, চকিত-চঞ্চল কাঠবিড়ালীর একটি ছুট, একটি সরীসৃপের সরসরানি, সামান্যতম আকর্ষণেও আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। আমার উচ্চকিত মন মৃদু বায়ু-মর্মরের পথ ধরে কোথায় উধাও হয়ে যায়, বুঝতে পারি নে। আমার অস্থির

চক্ষু কেবল যে প্রাচীনকে দেখতে চায়, তাই নয়, প্রাচীন ভারতের সমস্ত অমৃত চিহ্নগুলিকেও যেন বাঁচাতে চায়। 'সুদর্শন হ্রদের' বাঁধ ভেঙেছে বার বার দুইটি নদীর আঘাতে, ওদের নাম হল সুবর্ণসিকতা ও পলাশিনী, কিন্তু ওরা যেন ওদের সেই আঘাত আমার বুকের মধ্যেও রেখে গেছে। ওই শিলালিপিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গেছে আঠারো শো বছর আগে রাজা রুদ্রদমন এবং দেড় হাজার বছর আগে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত। ইতিহাস মরে গেছে, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ঝরে গেছে, শক-হুন-তাতার-মোগল চার্চিল একে একে প্রত্যেক আসুরিক শক্তি তার অন্তিম দশা রচনা করে গেছে, কিন্তু ওই চতুর্দশ শিলালিপি তার শান্তি ও মাধুর্য-বার্তা নিয়ে অম্লান রয়ে গেছে আজও। ভারতের আত্মার স্বাক্ষর নিয়ে পাথরখানা আজও দাঁড়িয়ে।

প্রায় হাজার বছর আগে রাজা গ্রহরিপু জুনাগড়ের দুর্গটি নির্মাণ করেন। এই দুর্গের পূর্ব নাম ছিল উপরকোট। পরবর্তীকালে আমেদাবাদের সুলতান এর মুসলমানী চেহারা দেন এবং একে আরও দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় করে তোলেন। বলাবাহুল্য সৌরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন, এখানেও তেমনি নানা ধর্মমতের একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া চলে। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম, এই পাঁচটি ধর্মমতের পাঁচ প্রকারের স্থাপত্য শিল্পের যে প্রাচুর্য এখানে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস ভারতের আর কোন প্রদেশে এমনটি নেই। সমগ্র আমেদাবাদ অঞ্চলে আমিষভোজী মাত্র গুটিকয়েক লোক, কিন্তু পাঠান আর মোগল স্থাপত্য জুড়ে রয়েছে তিন চতুর্থাংশ অঞ্চল। জুনাগড় দুর্গের মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধ গুমফা আজও বর্তমান। একটি কূপ রয়েছে, সেটি প্রায় পৌনে দুশো ফুট গভীর এবং রাজা গ্রহরিপুর পৌত্র নির্মিত প্রায় আড়াই শত সিঁড়ি বৃত্তাকারে এই কূপের তলায় নেমে গেছে। জৈন মন্দিরের সংখ্যাও এই দুর্গে কম নয়, যেমন দেখে এসেছি জয়শলমেরের

দুর্গের ভিতরে। একটির পর একটি সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের ঝঞ্ঝা-প্রলয় চলে গেছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। কিন্তু সেটি বাহ্যিক, তার সাময়িক বিলোড়ন এখানে দাগ রেখে গেছে মাত্র। কিন্তু ভারতেব আত্মিক চেহারাটা হল বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতার অভিযান পরীক্ষা। মতবাদের প্রাধান্য নয়, বিভিন্ন দর্শনের সমন্বয়। সংঘর্ষ নয়, সংযোগ। অনৈক্যের ইতর সাম্প্রদায়িকতা নয়, কিন্তু শান্তিময় সহস্থিতি। ঘৃণার দ্বারা এক কর্তৃক অন্যকে ক্ষয় নয়, প্রেমের দ্বারা পরস্পরকে জয়।

সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটা পরিভ্রমণ করা এখানে দুঃসাধ্য। গিরনার পর্বতের চূড়াটি ছাড়াও অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য চূড়ায়ও এখান থেকে যাওয়া যায়। ওদের একটির নাম হলো গুরুদত্ত এবং অপরটি গোরক্ষনাথ। কামরূপের কামাখ্যা ছাড়িয়ে উপরে উঠলে যেমন পাওয়া যায় ভুবনেশ্বরীব মন্দির, এখানেও তাই, গিরনারের উপর দিয়ে অগ্রসর হলে দেবী অম্বিকার মন্দির। মন্দিরের বাইরে এসে স্থিব হয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়ে নদী-অরণ্য-পর্বত-সমতলসহ সমগ্র জুনাগড়। ভারতের এই একমাত্র অরণ্য যেখানে আজও পশুরাজ সিংহ বিচরণ করে। কিন্তু সিংহ শিকারের অনুমতি কোনমতেই পাওয়া যায় না, কারণ তারা অতি স্বল্প সংখ্যক। অনেকের ধারণা এই গিরনার পর্বতের কোন একটি অঞ্চলে অপর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু জৈন মন্দিরগুলিই এখন প্রধান, দুর্গের কথাটা চাপা পড়ে গেছে। বলাবাহুল্য এ মন্দিরগুলি আধুনিক কালের নয়, এদের উপর দিয়েও প্রায় আট শো বছর চলে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর বাস্তুপাল এবং তেজপালের প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে তারা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে সগৌরবে।

জুনাগড ছাড়িয়ে চললুম পশ্চিমের পথে। জুনাগড়ের প্রাক্তন নবাব—যিনি পুতুলের বিয়েতে খরচ করতেন লক্ষ টাকা এবং হারেমে বাঁদী পুষতে যাঁর যেত কয়েক লক্ষ, তাঁর প্রাসাদের প্রাকারটি

দেখিয়ে দিলেন আমার পাঞ্জাবী বন্ধু মিঃ নাগিয়া। কয়েক বছর আগে নবাব পলায়ন করেছেন পাকিস্থানে। সময় বুঝে ওরা পালাতেও জানে!

আমরা রাজকোটের পথ ধরেই যাচ্ছিলুম। পথটা সত্যই ক্লান্তিকর এবং ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাপনাটা নিতান্তই কষ্টদায়ক। প্রতিবাদ কোথাও নেই বলেই পুরনো ব্যবস্থাটা কায়েমী হয়ে বসে আছে। ভারতের আর কোনও অঞ্চলের রেলপথ বোধ করি এত কষ্টসাধ্য নয়।

অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে সবান্ধবে এসে নামলুম বিরাবলে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ, বেলা দুটো বাজে। একালে দু শো সত্তর মাইল পথ সতেরো আঠারো ঘণ্টা লাগে, এ অসহ্য। হেমন্তকাল বটে, কিন্তু রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। সমুদ্র কাছাকাছি, সুতরাং ঠাণ্ডা নেই।

বিরাবলের ভিন্ন নাম হলো 'বেলাকূল'। স্টেশনের বাইরে এসে অগ্নিক্ষেত্রের বায়ুতে যখন নিঃশ্বাস নিলুম, গায়ে গায়ে তখন রোমাঞ্চ লাগল। এটি যে ভারতের একটি প্রধান তীর্থস্থান সেজন্য কারও কোন উদ্বেগ নেই। জীবনযাত্রার চেহারাটা এত মন্থর যে মনে হল, আধুনিককাল আজও এখানে এসে পৌঁছয় নি, পরম নিশ্চিন্ততার আস্বাদ সবাইকে যেন পেয়ে বসেছে, কারও ঘুম ভাঙে নি। আমার উদ্দীপনার জন্য আমি যেন লজ্জিত, ওদের কারও মাথা ব্যথা নেই।

স্টেশন থেকে একটি টাঙ্গা পাওয়া গেল। সেটি চারিদিকে ঘেরা, অনেকটা একটি বাক্সর মত। বন্ধুবর নাগিয়াসহ আমরা ছিলুম তিনজন। আমাদের তৃতীয় বন্ধু মিঃ সত্যবান। ওঁরা উভয়েই পশ্চিম পাকিস্থানের লোক, আপাতত দিল্লীবাসী। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং দিল্লীর লক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের কর্মচারী। আমাদের টাঙ্গা এক হোটেলে এনে হাজির করল।

বিরাবল থেকে সোমনাথের মন্দির কমবেশী তিন মাইল। এতকাল ধরে ছিল সোমনাথ কেবলমাত্র একটি স্থানের নাম, কিন্তু

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সোমনাথ প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে জুনাগড়ের ভারত অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে সোমনাথ সম্বন্ধে। এই চেতনাকে মূর্ত করে তুলে ছিলেন স্বর্গত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। নিরিবিলি পথ ধরে আমাদের টাঙ্গা চলেছিল সোমনাথের দিকে।

একদা ভারত প্রদক্ষিণকালে আমার ডায়েরীতে লিখেছিলুম, অবিভক্ত ভারতের যে বিশাল সমুদ্র সীমানা পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে কমবেশী প্রায় চার হাজার মাইল বিস্তৃত—যেটাকে জম্বুদ্বীপ বলা হত পুরাণে—সেই সুদূর-বিস্তৃত তটপ্রান্ত করাচী থেকে আরাকান অবধি সমুদ্র সীমানার তটভূমি অঞ্চলে সহস্র সহস্র দেব-মন্দির দণ্ডায়মান। ভ্রমণকারীরা বলে থাকেন, পৃথিবীর কোথাও এ দৃশ্য চোখে পড়ে না।

সোমনাথে পৌঁছবার আগে আমরা এসে উপস্থিত হলুম ত্রিধারা সঙ্গমে। এখানে অবগাহন স্নান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান বিধি। একটি নারিকেল কুঞ্জবীথি সোজা এসে পৌঁছেছে সঙ্গমে। আশেপাশে মন্দির, তাদের কোনটি রামজী, ত্রিবেণী মাতা, সূর্যনারায়ণ কোনটি বা কালিকা মাতা এবং মহাকালী। কিন্তু ত্রিধারা সঙ্গমের সামনে এসে সমুদ্রের খাঁড়ি, বালুময় চরা এবং বিস্তীর্ণ সমুদ্র জলরাশির আভাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। পাণ্ডা কিন্তু সোৎসাহে বোঝাতে লাগল, ত্রিধারার বিভিন্ন নাম। একটি হিরণ্য, একটি কপিলা এবং অন্যটি সরস্বতী। পিছনদিকের একটি মন্দিরের নাম মানকেশ্বর।

বন্ধুবর নাগিয়া ভক্তি সহকারে সঙ্গমে স্নান করে নিলেন। চলতি গল্প হল, এই ত্রিবেণী সঙ্গমে আনা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের নশ্বর মৃতদেহ। এইখানে তাঁর দেহকে ভস্মীভূত করা হয়। এই ঘাট থেকে উঠে গিয়ে দেখা যায় 'দেহোৎসর্গ' মন্দির; এখানে একটি স্মৃতি-ফলক নির্মিত রয়েছে। কিন্তু এই দেহোৎসর্গকেই আবার বলা হয়

নাগস্থান, এখানে বলরাম পাতালের নীচে প্রবেশ করেছিলেন। বলরামের মৃত্যুকালে তাঁর মুখগহ্বর থেকে নাকি সহস্র নাগ নির্গত হয়েছিল।

ইচ্ছা করে সমস্তটা বিশ্বাস করি, কিন্তু উৎসাহ পাই নে। বুদ্ধিবিচার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যুক্তি কেবল তর্কের পথ ধরে। অথচ একথা জানি, মানুষ এত যত্নে এতকালের বিশ্বাসকে গড়ে তুলেছে, আমার কী অধিকার তাকে সন্দেহ করব? মুশকিল এই, বিশ্বাস যদি না কর, তুমি নাস্তিক। যদি বিশ্বাস কর, হিন্দু ভারতে তুমি ঠাঁই পেয়ে গেলে, ভদ্র সমাজ তোমাকে অভ্যর্থনা জানাল, সাধুবাদ দিল তোমাকে সবাই। ভারতীয় দর্শন এক বস্তু, হিন্দুধর্ম ভিন্ন বস্তু, একথা বোঝাতে গেলে চলবে না। আনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানীতে রস পায় না আধুনিক মন, কাকে বোঝাব? কিন্তু অনুষ্ঠানের বাইরেও তো কিছু আছে—যেটার নাম দর্শন! সেই নির্জন সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে সমস্তই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম।

আনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানীর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অতি নিকট সম্পর্ক এ মানতে পারি নে। অনুষ্ঠান হল অভ্যাস, যেটা চলতি সংস্কার, কেউ ওটাতে রস পায়, কেউ পায় না। দক্ষিণ ভারতে মহাকালী নেই, পশ্চিম ভারতে দুর্গা নেই, অর্থাৎ এক একটি অনুষ্ঠান একেকটি অঞ্চল বেছে নিয়েছে। কিন্তু তেলেগু সম্প্রদায় যদি কালীপূজা না করে, তাকে কি অ-হিন্দু বলব? পশ্চিম ভারতে যাও, দেখবে 'সীতারাম' আর 'রাধেশ্যাম' নিয়ে বিবাদ। একজন আরেকজনকে কেবল বিদ্রূপ করছে। এগুলো সমস্তই আনুষ্ঠানিকতার ইতিবৃত্ত। বাঙালী যদি গুজরাটীদের মত শোভাযাত্রা সহকারে গণেশের পূজা করে, তাহলে হাসাহাসি পড়ে যায়। পাঞ্জাবী শিখরা কলকাতায় সরস্বতী পূজার হিড়িক দেখে অবাক হয়ে থাকে। এগুলো আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের বাইরে।

টাঙ্গায় চড়ে এবার আমরা 'ভালকা' তীর্থের দিকে। সমস্ত

মিলিয়েই প্রভাস পত্তন, যেটাকে আগে বলা হয়েছে অগ্নিক্ষেত্র। এর মধ্যেই পড়ে সোমনাথ, প্রভাস, ত্রিবেণী সঙ্গম, ভাল্‌কা, মণ্ডরোল কারওয়ার, সূত্রপাদ, বরদা পর্বতের ভীলেশ্বর, এমন কি পূর্বাঞ্চলস্থিত দুর্গাদিলওয়ারা, সমস্ত মিলিয়েই প্রভাসতীর্থ।

ভাল্‌কা হল বেলাকূলের ঈষৎ ঈশান কোণে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন বলেই এ স্থান অতি পবিত্র। এখানে একটি কুণ্ড দেখা দেয়। আশে পাশে একটু আধটু গাছপালা ছাওয়া মন্দির প্রাঙ্গণ, ভিতবে রংকরা শ্রীকৃষ্ণ ও কিরাতেব মূর্তি, যতদূর মনে পড়ছে। এ অঞ্চলটি কিছু নিরিবিলি, মনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কিছু আবেশ আনে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনাটি দৈবাৎ। কিরাত তার নিজ ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করে নি। তার লক্ষ্য ছিল সম্ভবত একটি সিংহের প্রতি। কিন্তু তার ধনুক থেকে বিষাক্ত তীর ছিটকে এসে অসতর্ক পথচাবী শ্রীকৃষ্ণেব দেহে বিদ্ধ হয়ে যায়, সেই বিষক্রিয়ার ফলে বাসুদেবের মৃত্যু ঘটে। সিংহেব পরিবর্তে পুরুষসিংহ।

মহাপুরুষের তিরোভাব তিথি আমাদের দেশে কখনও প্রাধান্য পায় নি। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগেব বিশেষ তিথিটি আমরা জানি নে, কিন্তু জন্মাষ্টমীতে সমগ্র ভাবত নাড়া খায়। মানবজাতিব শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামীকে দেবতাজ্ঞানে লোকে পূজা করে, তাঁকে অবতার বলে। সর্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের যে অবদান, সেটি তৎকালীন বিশ্ববাসীর দ্বারা স্বীকৃত ছিল, সেই কারণে তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়েছিল। দু-হাজার বছর আগেকার সমাজ ও নৈতিক জীবনকে গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন যীশুখৃষ্ট, সেই কারণে তাঁকে খৃষ্টানরা অবতার বলে। চৈতন্যে তাই, রামকৃষ্ণে তাই, একালে গান্ধীজীর জন্মতিথিটি আমাদের কাছে সত্য, যেমন সত্য রবীন্দ্রনাথেব পঁচিশে বৈশাখ। মহাপুরুষের পরিচয় তাঁর জীবনে, নশ্বর দেহাবসানে নয়। সেই কারণে তাঁদের আবির্ভাব তিথিটি আমরা গ্রহণ করি।

ভাল্‌কা-কুণ্ডের পাশেই হলো অর্জুনেশ্বর মহাদেবের একটি মন্দির। কিরাত ঠিক যে স্থলটি থেকে শর নিক্ষেপ করেছিলেন, সেটি কিছু দূরবর্তী স্থলে, চারিদিকে তার সুবিশাল প্রান্তর। কিন্তু সেখানকার ভীরভঞ্জন মহাদেবের মন্দিরটি সেই প্রাচীন ঘটনাটির সাক্ষ্য দেয়।

আমরা কতকটা যেন ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

অপরাহ্নের রৌদ্র তখনও প্রখর। আমরা সোমনাথের দিকে অগ্রসর হলুম। অলিগলি পথ ক্রমশ কিছু বিস্তৃত হচ্ছে। পাড়া পল্লী বাড়ি ঘর দোর নিয়ে বেশ একটি বড়সড় গ্রাম, অর্থাৎ ছোট্ট একটি শহর। কয়েক বছর আগে সর্দার প্যাটেল এবং কে এম মুন্সী মহাশয় সোমনাথকে সর্বভারতীয় প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য তাঁদের মনে একটা চাপা বিক্ষোভ ছিল। সেই বিক্ষোভটি গজনীর মামুদ, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ, জুনাগড়ের নবাব এবং হায়দরাবাদের নিজাম গভর্নমেণ্ট, এদেরকে মনে রেখে নূতন সোমনাথ সৃষ্টির কথাটা উঠেছিল। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ হুজুগে পণ্ডিত নেহরুর মনের সায় কেন যে ছিল না, সোমনাথের মন্দির চত্বরে এসে দাঁড়ালে সেই কথাটি অনুভব করা সহজ হয়। যে প্রচারকার্যেব মূলে অনুরাগ অপেক্ষা বিক্ষোভকে শুধু পাই, তার সার্থক পরিণতি লাভে কিছু বিলম্ব ঘটে বইকি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সহসা সোমনাথের মন্দির সংস্কারের সর্বভারতীয় হুজুগ দেখে সোমপুরার অধিবাসীরাও অনেকখানি বিস্ময় বোধ করেছিল।

ঐতিহাসিক যুগে সোমনাথের আদি নাম ছিল সোমপুরা। এককালে সোমপুরা ছিল সমগ্র গুজরাটের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কাশীর পরে যেমন কাঞ্চি, গুজরাটে সোমপুরা ছিল তেমনি শৈব-সম্প্রদায়ের মিলন কেন্দ্র। কিন্তু আজ আর সে কথা ওঠে না। মূল সোমনাথের মন্দির দেড় হাজার বছরেরও আগে নির্মিত হয়েছিল, অনেকের বিশ্বাস। হাজার বছরেরও আগে ছিল এখানে একটি

ভারত প্রসিদ্ধ বন্দর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। এককালে যেমন ছিল সুরাট, পরবর্তীকালে যেমন হয়ে উঠেছে বোম্বাই অথবা কোচিন—তেমনি এই সোমনাথ এবং বিরাবল ওরফে বেলাকূল সেই প্রকার বাণিজ্যের ঘাটি ছিল। ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে এসে জানা যায়, সোমনাথের মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের যে ভারতজোড়া আকর্ষণ ছিল, তারই জন্য নানা দেশের ধনপতিরা কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্নসম্ভার এখানে এসে দর্শনী দিতেন। সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ এখানে শত শত বৎসর ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, জহরৎ, হীরা-মুক্তাদি এবং বহু কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কারাদি মিলে কি পরিমাণ হয়—তার হিসাব আজকে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং সকল দিক থেকেই যে প্রবল আকর্ষণটা ছিল, সেটি লোভের। আজ নয় শো ত্রিশ বছর আগে গজনীর মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করেন। যতদূর জানা যায়, প্রথমবার তিনি অকৃতকার্য হন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁর এই আক্রমণের মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের অপৌরুষ এবং বিশেষ একটি শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ছিল, একথা ভুলে গেলে চলবে কেন? লুঠ করেছে আলাউদ্দিন, মহম্মদ ঘোরী, নাদি শা, আমেদ শা, আবদুল কাদির, কে নয়? পরবর্তীকালে লুঠ করেছে ক্লাইভ, ওলন্দাজ, পোর্টুগীজ, কাদের কথা বাদ দেব?

চুপ করে এসে দাঁড়ালুম। কম-বেশি বিঘা আষ্টেক জায়গা নিয়ে মন্দির এবং তার পরিবেশ। এর বাইরে—অর্থাৎ কেবলমাত্র পশ্চিম দিকটি বাদ দিলে চারিদিকে বেশ ঘিঞ্জি লোক-বসতি। সোমনাথের যে পারিপার্শ্বিক মহিমা পাওয়া যায়, ইতিহাসে এবং শ্রুতি স্মৃতিতে—সেই মহিমা এখানে সুরক্ষিত থাকবে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ-আশে-পাশে কোথাও কিছু নেই, সমস্তটাই

শূন্য এবং একেবারেই দরিদ্র। দু-চারখানা পাথর এবং ভাঙা পাঁচিলের টুকরা-টাকরা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তাদের কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করা যায় না। গজনীর মামুদ যখন মূল মন্দিরকে ধ্বংস করে চলে যান, তখন রাজা ভীমদেও পুনরায় মন্দিরটিকে নির্মাণ করেন এবং তার পঁচিশ বছর পরে রাজা কুমারপাল পুনরায় মন্দির পরিবর্ধনে লেগে যান। কিন্তু তৎকালে মুসলমানদের আক্রমণ না থাকলেও উৎপাত তাদের কম ছিল না। ফলে, পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে সোমনাথের অন্তর্বর্তী জ্যোতির্লিঙ্গকে যথাবিহিতভাবে পূজা নিবেদন করার পক্ষে বাধা-বিঘ্ন ছিল অবিশ্রান্ত। বুঝতে পারা যায়, যে কারণেই হোক, পাঠান-মোগলদের বিষদৃষ্টি ছিল এই মন্দিরের প্রতি। এর অন্তর্নিহিত কারণ কোথায় এবং কেন ছিল, তা আজকে আর আলোচনা করে লাভ নেই। অতঃপর সেই কুমার পালের নবনির্মিত ও পরিবর্ধিত মন্দির অবশেষে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর স্থাপত্যের আকর্ষণ ছিল অনন্যসাধারণ। এর পর দেড়শো বছরেরও কিছু পূর্বে হোলকারের ভারতপ্রসিদ্ধা মহারাণী পুণ্যবতী অহল্যাবাঈ সেই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে অল্পদূরে শহরের মধ্যে পুনরায় ছোটখাটো একটি সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেন এবং দেড় শো বছর ধরে সেখানে পূজা-পাঠ চলে এসেছে। কিছুদিন আগে কুমার পালের সেই ভগ্ন মন্দিরটিকে নষ্ট করা হয়, কিন্তু মাটির তলা খুড়ে বুঝতে পারা যায়, পুরাকালের মূল সোমনাথের ভিতের উপরেই ছিল কুমার পালের মন্দির। এই খননের ফলে পাওয়া যায় নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তি এবং বহু প্রকারের স্থাপত্য শিল্পের সামগ্রী। বর্তমানে সেগুলি যাদুঘরে রক্ষিত।

বন্ধুবর নাগিয়া পূজারীর সঙ্গে আলাপ করলেন। মূল মন্দিরের ভিতটি নাকি নির্মিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে মন্দিরটি অস্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে উঠেছে সেটির উচ্চতা কয়েক

ফুট মাত্র, আমার বিশ্বাস, সেটি বেদীর উপব থেকে কুড়ি ফুটের বেশী নয়। কিন্তু পূজারী মহাশয় মন্দিরের মধ্যে ভবিষ্যৎ সোমনাথের মন্দিরের একটি মডেল রেখেছেন দর্শকদের জন্য এবং একটি চিহ্নিত কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ রয়েছে তারই পাশে। বলা বাহুল্য, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সকলকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। সমগ্রভাবে সোমনাথ এবং তাব পরিবেশ আমাদের মনে একটুও রেখাপাত করল না, এটি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার বিশ্বাস সমস্ত প্রকার আয়োজন এবং অধ্যবসায়ের মধ্যে একটি হঠকারিতা থেকে গেছে। সেটি হলো এই, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে উৎখাত করা সঙ্গত হয় নি। কারণ তার সঙ্গে জড়ানো ছিল প্রাচীনের একটি স্বাভাবিক মহিমা এবং ইতিহাসের কালানু-ক্রমিক স্মৃতি।

নূতন সোমনাথের মন্দির নির্মিত হতে হয়তো দশ পনেরো বছর লাগতে পারে। হয়তো দেখব তার অনেক সাজসজ্জা, অনেক মার্বেল পাথরের কাজ। কিন্তু সে মন্দিব তো হবে দিল্লীর বিড়লা মন্দিরের সমগোত্রীয়। সম্পদ থাকবে প্রচুর, কিন্তু ঐশ্বর্য আসবে কোত্থেকে? বিস্ময় আনবে, কিন্তু শ্রদ্ধা আনবে কি? নূতন সোমনাথ উঠে দাঁড়াবেন বটে, কিন্তু তাতে প্রাচীন সোমনাথের সাংস্কৃতিক মহিমা থাকবে না!

তবু ওই নবনির্মিত প্রাকারের উপরে দাঁড়িয়ে একবার স্তব্ধ চক্ষে তাকালুম পশ্চিমে। এই প্রাকার অবিশ্রান্ত ধৌত হচ্ছে আরব সাগরের তরঙ্গে। আমাদের পায়ের নীচে অন্তহীন সমুদ্র। সূর্যাস্ত হচ্ছে সমুদ্রে—তারই সোনার রশ্মি এসে পড়েছে সোমনাথের ছোট্ট মন্দিরের সর্বাঙ্গে। সমুদ্রপাখির দল উড়ে চলেছে দূর-দিগন্তের দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে নারিকেল কুঞ্জ চলেছে দৃষ্টিসীমানা ছাড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে নীল সাগরে। মহাজলরাশির এই প্রান্ত থেকে

এই পূণ্যভূমি ভারত ডাক দিয়েছে পশ্চিমের দিকে আবহমানকাল থেকে, যারা বন্ধু, যারা বৈরী, যারা বিদেশী, কেউ অনাদর পায় নি। মঙ্গলশঙ্খে দিয়েছে ফুৎকার, দীপমালা জ্বালিয়ে রেখেছে অনন্ত নীলাম্বুরাশির দিকে, মন্ত্রমালা জপ করেছে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায়, ডাক দিয়েছে তার বিস্তীর্ণ হৃদয়ের ক্ষেত্রে। দ্বারকা থেকে ডেকেছে, মহালক্ষ্মী থেকে ডেকেছে, কন্যা-কুমারিকা রামেশ্বরম থেকে ডেকেছে, জগন্নাথ ও কোনারক থেকে ডেকেছে। অপমানে তার মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধূলোয়, আঘাতে জর্জরিত হয়েছে—কিন্তু তবু এই মহাবীর্যবান সুপ্রাচীন সন্ন্যাসী ভারত ভস্মমাখা দেহে উঠে দাঁড়িয়ে পিতামহের মত স্নেহসিক্ত চক্ষে ক্ষমা করে এসেছে চিরদিন!

॥ চিত্রগিরি চিতোর ॥

গাম্ভীর নদীর এপারে প্রান্তর, সেই প্রান্তরের ভিতর দিয়ে টাঙ্গা চলেছে। ঘোড়াটা গাড়ি টানতে পারছে না, ওর দানা জোটে নি কাল থেকে। চাবুক পড়ছে তার পিঠে, ঝাঁকি দিয়ে ছুটছে কয়েক পা, তারপর আবার সেই মন্থর গতি।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এখানে ওখানে ভুট্টা আর জোয়ারের ক্ষেত—কিন্তু তাদের পেরিয়ে চোখ ছুটে যায় দুরান্তরের আরাবল্লী গিরি-শ্রেণীর দিকে। হোক না হেমন্তের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে দাউদাউ করে জ্বলছে পাহাড় আর প্রান্তর আর বিবর্ণ কাশফুলের ক্ষেত। চিতোরের পথ ধূলি ধূসর।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম টাঙ্গাগাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে। মন্থর গতিতে চলেছে ঘোড়া, রাশ আলগা দিয়ে টাঙ্গাওয়ালা গান ধরেছে। তার সেই মাঠিয়ালী বৈরাগ্যের সুর চলতি কাল আর দিগন্ত জোড়া প্রান্তরের বন্ধন পেরিয়ে আকাশের কোন্ দিকে যে উধাও হয়ে যাচ্ছিল—মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করছিলুম। গায়ে জ্বর ছিল বেশ, গত চারদিন ট্রেনের কামরাতেই কেটে গেছে। রাজস্থানের মধ্যে ভ্রমণ করছিলুম।

শ্রান্ত ঘোড়া চলেছে ক্লান্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে। রাঙ্গা চোখ মাঝে মাঝে খুলে দেখছিলুম, রাজপুতানীর ঘাগরা ঘুরিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যাহ্ন রৌদ্রের ভিতর দিয়ে জোয়ারের প্রান্তর পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেক দিন আমি সঙ্গিহীন।

গাম্ভীর নদী পেরিয়ে ডান দিকে টাঙ্গা ঘুরল। নদীটি সরু বটে,

কিন্তু এখনও স্রোত আছে। বুঝতে পারা যায় এই নদীই একদিন দুর্গের পরিখার কাজ করত। আশে পাশে বস্তি ও গ্রাম। সামনে প্রায় মাইল খানেকের মধ্যেই চিতোর গড়। তারিখটা মনে নেই, বোধ হয় দু-হাজার বছর আগে আরাবল্লীর এই অংশটার নাম ছিল চিত্রগিরি। কেউ একে বলে এসেছে চিত্ররঙ্গ, কেউ বা বলেছে চিত্রকোট। ইতিহাসের সঙ্গে নামও বদলেছে বার বার। বহু প্রাচীনকালে মোরি নামক একটি রাজপুত বংশের রাজা চিত্ররঙ্গ এখানে বিরাট এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর সেই কীর্তির অবশেষ আজও এই পাহাড়ের মালভূমিতে বিদ্যমান।

বস্তি ও গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছে টাঙ্গা। এখানেও প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র ছিল এককালে। সম্ভবত ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে নতুন করে এখানে জনপদের পত্তন ঘটে। মার খেয়েছে এরা অনেকবার, অপমানিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, ধূল্যবলুণ্ঠিত মানবাত্মার উৎপীড়নের শেষ ছিল না যুগে যুগে। এদেরই ভিতর দিয়ে টাঙ্গা এসে একবারটি থামল একটি বৃহদাকার শ্বেত পাথরের মসজিদের সামনে। এই সম্পদশালী মসজিদটির ইতিহাস অতি বিচিত্র, কিন্তু আমার টাঙ্গা ধীরে ধীরে যে পথটি আরোহণ করে পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে লাগল তার কাহিনী বিচিত্রতর।

মনে পড়ছে অনেকদিন আগে এমনিভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম গোয়ালীয়রে মানসিংহের দুর্গ প্রাকারের নীচে, তার নাম দেওয়া হয়েছে মানমন্দির। এখানেও অনেকটা তাই। টাঙ্গা উঠছে ধীরে ধীরে উপর দিকে কিন্তু উপর থেকে একদা যাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত গড়িয়ে এসেছিল নীচের দিকে, সেই রত্নসিংহ আর জয়মল্লের স্মৃতিসৌধ দেখে যাচ্ছি। ভিন্ন নাম হতে পারে, কিন্তু শুধু রক্তেরই ইতিহাস। অত রক্তের বন্যা নেমে আসবে বলেই এত উঁচু পাহাড়ের দরকার হয়েছিল। আজ এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে জ্বর ও জরা নিয়ে ক্লান্ত দেহে যাদের অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি, সেই রাণা সংগ্রাম, ভীম সিংহ,

মীরাবাঈ, রাণা কুম্ভ, রত্নসিংহ, রাণা প্রতাপ, ধাত্রীপান্না, তারা কেউ নেই। সমস্ত ভারতবর্ষে একদা যাদের চেয়ে সত্য আর কেউ ছিল না, সমগ্র পৃথিবীতে তাদের চেয়ে বড় স্বপ্ন আজকে আর কিছু নেই। সেই মহাপ্রাচীনের ইতিহাস আজ পথের ধারে কাঁদতে বসেছে, ওই যেখানে মসজিদের তোরণের সামনে দেখে এলুম একটি ছোট ছেলে তার ভাঙ্গা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সুর তোলবার চেষ্টা করছে, তারই সেই বাঁশির কান্নায়।

কুরু-পাণ্ডবের আমলে নরশ্রেষ্ঠ এক নরপতি ছিলেন, তাঁর নাম ছিল শিবিরাজা। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, দানশীল এবং ধর্মপরায়ণ। এই চিত্রগিরি অর্থাৎ চিতোর ছিল তাঁব রাজ্যের অন্তর্গত। সেই কারণে চিতোরের প্রাচীন নাম ছিল শিবিজনপদ। তিনি এখানে আমন্ত্রণ করে আনেন মহামতি দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনকে। বৃকোদর এখানে এসে এক বিশাল প্রাসাদে দীর্ঘকাল বসবাস করেন এবং চিত্রগিরির নানাবিধ উন্নতি সাধনের দিকে মনোযোগ দেন। অনেকের ধারণা, চিতোরের বিশাল ভগ্নাবশেষের আশেপাশে আজও ভীমসেনের পুরাকীর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে উঠে এসে ঘোরা-ফেরা করলে সেকালের কিংবদন্তীগুলিকে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। শিবিজনপদ সম্বন্ধে আরেকটি প্রবাদ হল এই, রাজা শ্রীরামচন্দ্র নাকি এর প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে এখানে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন।

চোখে দেখতে পাচ্ছি জরাজীর্ণতা। প্রথম একটি তোরণদ্বার পাওয়া যায়—যার বিশালতা দুই চক্ষুকে বিস্ময়াহত করে। অত্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে, সেকালে দুর্গদ্বার পাহারা দেবার ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে সহসা এটি কোথাও দেখা যায় না যে, হিন্দু-পাঠান-মোগল ইত্যাদি কোনও রাজবংশ সমতল ভূ-ভাগের উপরে বসবাস করেছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, উচ্চ মালভূমিতে

দুর্গনির্মাণের হেতু। দিল্লী-এলাহাবাদ-আগ্রা-জয়পুর-যোধপুর-বিকানের জয়শলমের—সর্বত্র একই কথা। জনসাধারণের ভয় নয়, রাজায় রাজায় ভয়। পুণায়, দৌলতাবাদে, আমেদনগরে, ঝাঁসী-গোয়ালীয়রে—যেখানে যাও, দুর্গ ছাড়া কথা নেই। মধ্যভারতে বিন্ধ্যপ্রদেশে, হায়দরাবাদে, প্রথম দ্রষ্টব্যই হল দুর্গ। ইংরেজ প্রথম এদেশে যখন এল, তখন তারা একটা দাঁড়াবার আশ্রয় হিসাবেই ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ করল। কিন্তু সমগ্র ভারতময় আধিপত্য বিস্তার করে ওরা আর যাই করুক, দুর্গ নির্মাণ করে নি। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে অন্য কথা ছিল। ইংরেজ দাঁড়িয়েছিল জনতার মুখোমুখি।

অবশেষে পাহাড়ের উপরে মালভূমিতে এসে টাঙ্গা গাড়ি পৌঁছল। গাড়ি থেকে নামলুম। কেন নামলুম বুঝতে পারলুম না। কোথাও জীবনের ইশারা নেই। চারিদিকে ভয়াবহ ভগ্নস্তূপের আগাগোড়া জটলা। এটম বোমা ফেলবার পর হিরোসিমার অবস্থা কি এইরূপ ঘটেছিল? চারদিকে চেয়ে দেখি কোথাও কোনটা দাঁড়িয়ে নেই! এমন একটি আশ্রয় কোথাও নেই, যেখানে গিয়ে প্রখর রৌদ্র থেকে মাথা বাঁচাব। এক ঘটি পানীয় জল কোনমতে পাব, এ আশা দুরাশা। মনে পড়ছে কাল রাত্রে একটি লোক আমার চিতোর দুর্গ দেখার ইচ্ছা শুনে মুখ টিপে হেসেছিল। সেই হাসির অর্থ এতক্ষণে বুঝলুম। এখানে এলুম কেন—এই প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল।

কিচ্ছু নেই! ধাত্রীপান্নার ঘর ছিল ওখানে, উদয়সিংহ- ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই কক্ষে, ওটা রাণা প্রতাপের মহল, এটা রাণা সংগ্রাম সিংহের, এসব গল্প রয়ে গেল শুধু পাঠ্যপুস্তকে, রয়ে গেল বিধ্বস্ত পাথরের টুকরোয়, রয়ে গেল হেমন্ত রৌদ্রের উদাসী হাওয়ায়। ইতিহাস যারা ওল্টায় নি, তাদের কাছে এই দীর্ঘ তিন মাইল ব্যাপী পাহাড়ের বিস্তৃত মালভূমি কোন অর্থ বহন করে না। পরিকীর্ণ পাথরের জটলা ছাড়া চিতোর পাহাড়ের আর কি কোনও পরিচয় আছে?

চুপ করেছিলুম। সম্ভবত আমার শারীরিক ও মানসিক—ছুটো অবস্থাই টাঙ্গাওয়ালা লক্ষ করে থাকবে। আসবার আগে নীচের থেকে দেখে এসেছি শুধু বিশাল প্রস্তর-প্রাকার, যেটা বেঁধে রেখেছে এই সুবিস্তীর্ণ মালভূমিকে। কিন্তু ভিতরে শুধু শূন্য, মহাশূন্য। সম্ভবত এই জনহীন শূন্যতাই এর মহিমা, এর প্রকৃত পরিচয়। দু-তিনটি ভগ্ন অট্টালিকা আর একটি মন্দিরের একাংশ এই শুধু দূরের সমতল প্রান্তর থেকে চোখে পড়ে মাত্র।

মোরি রাজপুত বংশ এখানে নাকি ছিল, কেউ বলে, গৌতম বুদ্ধেরও কয়েক শতাব্দী আগে। তারা নাকি বহু শতাব্দী অবধি এখানে রাজ্যপাট চালায়। ভারতবর্ষে তখন গ্রীকদের আমল। মোরি বংশেব শেষ নরপতি রাজা পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যখন ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন, সেই সময় কোনও এক গ্রীক নরপতি সেই ঘোড়াকে বন্দী করে। কিন্তু রাজা পুষ্যমিত্রের প্রবল পরাক্রমের কাছে গ্রীকরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এব পব আব কিছু জানা যায় না। জানা যায় শুধু অষ্টম শতাব্দীর কাহিনী, যখন মোরি বংশেব হাত থেকে চিতোর খসে গিয়ে মেবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বড় রকমেব জমিদারকেই তো আমরা এতকাল রাজা-মহারাজা বলে এসেছি। এককালে বাঙ্গালায় এক জমিদার পত্নী ছিলেন, তাঁকে বলা হত অর্ধবঙ্গেশ্বরী, তিনি হলেন রাণীভবানী। চিতোর, উদয়পুব, যোধপুর, জয়পুর অপেক্ষা বহুগুণ বড় ছিলেন রাণীভবানী। চিতোরের কোন রাণারই সাম্রাজ্য ছিল না, ছিল জমিদারি। পাঠানেরা প্রথম এসে এই স্বাধীন জমিদারগোষ্ঠীকে দেখে ভয় পায়। এরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে, তবেই আশঙ্কার কারণ ঘটে। কিন্তু সেই একতা ঘটে নি কোনদিন। পাঠান এসে রাজ্যপাট বসিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মোগল এসে পৌছেছে, কিন্তু বাইরের শত্রুবা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ পায় নি কোনদিন। পৃথকভাবে লড়াই কবেছে ; কখনও জয়ী হয়েছে, অধিকাংশ পরাজয় স্বীকার করেছে।

সন্দেহ নেই, কিছু যেন খোঁজাখুঁজি করছিলুম। একটি নিবাশ্রয় দেওয়াল, কোন একটি কক্ষের কোণ, কোন ইমারতের ভাঙ্গা ছাদ, হয়তো বা অন্তঃপুবের একটি ছোট অঙ্গন—ওদের আশে পাশে পরম কৌতূহলে সন্ধান কবছিলুয ইতিহাসের, যেটি বাতুলতা মাত্র। রাণা প্রতাপ, ধাত্রীপ'ন্না ইত্যাদি মহলের কোন কিছু অস্তিত্ব নেই। শুধু ভগ্নস্তূপের ভিড়, শুধু পাথর আর প্রাকারের জটলা। মৃত্যুর মত সমস্তটাই অসাড়।

উত্তরভাগে এসে কতকটা নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই তিন চার মাইল পার্বত্য মালভূমির উপর দিয়ে শত শত বছরেব ইতিহাস তার নির্মম পদক্ষেপে সমস্তটা দলিত মথিত করে চলে গেছে। তুর্কী আলাউদ্দিন এসেছে, পাঠানরা এসেছে, মোগলবা এসেছে। আলাউদ্দিন যখন এসেছে চিতোরে তার সর্বনাশা চেহাবা নিযে—তারও আড়াই শো বছর পরে দেখা যাচ্ছে রাণা কুম্ভ এই মালভূমিব উপরে নির্মাণ করেছেন তাঁর বিজয়স্তম্ভ। এই বিজযস্তম্ভ দেখে বাজস্থান-কাহিনীব লেখক টড সাহেব এক সময় বলেছিলেন—দিল্লীর কুতুবমিনার অপেক্ষা চিতোরেব বিজয়স্তম্ভ অনেক বেশী সুন্দর এবং এর কারুকার্যের বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। বিজয়স্তম্ভ ছাড়াও আর একটি আছে তার নাম কীর্তি-সৌধ। এর নাম হল আদিনাথ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সৌধটি নির্মিত হয়, এবং জৈন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান গুরু তীর্থঙ্কব আদিনাথের নামে এটি উৎসর্গ করা হয়। ওধাবে একান্তে আধুনিক যুগে যে অট্টালিকাটি নির্মিত হয়েছিল, সেটি ফতেসিং প্রাসাদ—আপাতত সেটি বাজস্থানী পুলিস বিভাগ দখল করে রয়েছে।

পাহাড়ের নীচে বহুদূব থেকে যে মন্দিরটি চোখে পড়ে সেটি হল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিতোবেশ্বরীর মন্দিব। কথিত আছে রাণা সংগ্রাম সিংহের প্রার্থনার সময় কোন এক রাত্রে সহসা চিতোরেশ্বরী কালী-

মূর্তি জাগ্রতা হন এবং রাণার দিকে চেয়ে বলেন, ম্যায় ভুখা হুঁ। আমি ক্ষুধার্ত। অতঃপর মুসলমান আক্রমণের ফলে অগণিত বীরের বক্ষোরক্ত পান করে তিনি পরিতুষ্টা হন। কয়েকটি সিঁড়ি উঠে গিয়ে চিতোরেশ্বরীর মূল মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলুম। চিতোরেশ্বরীর স্থানীয় নাম হল কাল্‌কা মাতা। কিন্তু সেই অন্ধকার মূল মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনকালের সেই চিতোরেশ্বরী বর্তমানে উপেক্ষিতা হয়ে রয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে তাঁরই জায়গায় বসে এখন সমাদর পাচ্ছেন অম্বাদেবী। চিতোরেশ্বরীর কষ্টিপাথরের মূর্তিটি স্বভাবতই কৃষ্ণবর্ণ, অম্বাদেবী হলেন শুভ্রকায়া। দেখলেই চেনা যায়, অম্বা দেবীর মূর্তিটি প্রসিদ্ধ জয়পুরী কারিগরের তৈরি। কাল্‌কা মাতার এই অনাদর লক্ষ করে বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কৃষ্ণাঙ্গী প্রাচীনা সুন্দরী নবীনার অবির্ভাবে যেন উপেক্ষিত, তাঁর এখন আদর যত্ন কম। আমার প্রশ্নের উত্তরে জনৈক পূজারী বললে, সাহেব-সুবোরা আসে এখানে ছবি তুলতে। তাঁরা চিতোরেশ্বরীর কৃষ্ণবিগ্রহ পছন্দ করে না। ছবি তোলার সুবিধার জন্যই মধ্যস্থলে বসান হয়েছে অম্বাদেবীর শুভ্র প্রতিমা।

চুপ করে রইলুম। বুঝতে পারা গেল, নবীন এসে জায়গা নিয়েছে প্রাচীনের ক্ষেত্রে। চিতোর নেই, চিতোরের সঙ্গে চিতোরেশ্বরীও অবলুপ্ত হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে আশেপাশে কয়েকজন গৈরিকবাসা ত্রিশূল-হস্ত সন্ন্যাসী আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরা শিবের উপাসক, কালীর সাধনা করে। তাঁরা ঐতিহ্য বহন করেছে সেই সেকালের চিতোরের। ওদের মধ্যে একটি সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ালুম। পরনে তার রক্তাম্বর, জটা ও শ্মশ্রুসমন্বিত মস্ত একখানা মুখ কিন্তু বড় বড় দুটো চোখের উগ্র কুটিলতা এবং আক্রোশ লক্ষ করলে দুর্ভাবনা হয়।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার দিকে একবার সেই সন্ন্যাসী করাল দৃষ্টিতে অহেতুক তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

পাগল নাকি? কিন্তু মুখ চোখ ওর বেশ সচেতন। সেই মুখের ও চাহনির চেহারা এত ক্রুদ্ধ যে, আমাকে আমল দিতে চায় না। হয়তো ওই ভয়াল উদাসীন রক্তচক্ষুই এই ভগ্নাবশেষ চিতোরেরই সত্য পরিচয়। হয়তো এমনি কঠিন রুদ্র দৃষ্টিতে সমগ্র চিতোর তাকিয়েছিল সাড়ে ছয় শো বছর আগে আলাউদ্দিনের দিকে, তারপর অমনি করে তাকিয়েছে মহম্মদ তোগলকের দিকে, ষোড়শ শতাব্দীর বাহাদুর শাহর দিকে, কিংবা সম্রাট আকবরের দিকে। ওকে বোধ হয় আর বোঝান যাবে না, আমি তাদের কেউ নই, আমি সেই জরাকগ্ন মহাপ্রাচীনেরই সর্বশেষ আধুনিক, আমি সেই চিরকালের দর্শক, মূক জনতারই প্রতীক।

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে কালো পাথরের কারখানা। এখানকার প্রধান শিল্প হল এই। চারদিকে ধ্বংস আর শূন্যতা, এর মাঝখানে চলছে জীবিকার আযোজন। কৃষ্ণাভ পাথরের থালা, গেলাস, বাটি ইত্যাদি পাথর কেটে তৈরি হচ্ছে। এগুলো অবশেষে চালান হয়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। অদূরে পাওয়া যায় একটি শ্যাওলা-পড়া ডোবা, সেটির নাম 'হাতি তালাও'। পোষা হাতিরা এখানে এক-কালে জল খেত। একটি বিষয় অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি; এই দল ছাড়া মালভূমির উপরে পানীয় জলের সরবরাহ হত কেমন করে। কেননা দিগ-দিগন্তে যে দিকেই চোখ যায়, সমতলভূমি হল অনেক নীচে। তখনকার দিনে পাইপের সাহায্যে পাম্প করে জল আনা হত এ বিশ্বাস করি নে। আমার বিশ্বাস হাতির পিঠে জল আসত গাম্ভীর নদী থেকে।

এখানে ওখানে আরও যে মন্দির নেই, তা নয়। বিস্ময়ের কথা এই স্বল্প পরিসর অঞ্চলটুকুতে শৈব ও জৈন সম্প্রদায়ের মিলন ঘটেছে। চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান হত, একথা না বললেও চলে। কিন্তু এরই সঙ্গে এসে মিলেছে গোঁড়া অহিংসবাদ। শুধু

তাই নয়, জৈন আর বৌদ্ধের প্রায় একই পথ। ছোটখাট দু-চারটি বৌদ্ধস্তূপও আবার এখানে সহজে জায়গা পেয়ে গেছে। জৈনদের প্রধান মন্দিরটির নাম হল 'সুগরচৌরী'। এখান থেকে এগিয়ে এলে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ নন্দলালের মন্দির। চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে ঢুকে যেমন পেয়েছিলুম প্রাচীন পিতামহের একটি স্নেহচ্ছায়া, যেমন তার প্রতি শীতল পাথরের গায়ে মর্মান্তিক ইতিহাসের বেদনাকে স্পর্শ করেছিলুম, তেমনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে যেন শিউরে উঠল দুই পায়ের নীচে। এটি মীরাবাঈয়ের সাধনা মন্দির।

মীরাবাঈ!

শরীরের সমস্ত অণুপরমাণুর মধ্যে ক্ষণকালের জন্য রোমাঞ্চ লাগে বইকি। এই মন্দিরের প্রস্তর প্রাকারের ভিতর থেকে একদা যে রমণীর করুণ মধুর ভক্তিরসের বন্যা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করেছিল, যুগযুগান্তের রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকা ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও কোটি কোটি নর-নারীর কর্ণে সেটি আজও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। হারিয়ে গেছে আলাউদ্দীন আর আকবর, হারিয়ে গেছে তুর্কি-তাতার, শক-হুন-মোগল-পাঠান আর গ্রীক-ইংরেজ-ফরাসী-ওলন্দাজ-পর্তুগীজ, কোকিল কণ্ঠ মীরার ভক্তি বেদনার প্লাবনে ওরা ইতিহাস থেকে ভেসে চলে গেছে অন্ধকার অবলুপ্তির পথে।

মনে হল জোর পেয়েছি এবার। জ্বর ছেড়েছে, পিপাসা মরে গেছে। হেমন্ত রৌদ্রে আর ধূলিধূসরতার মধ্যে মহাশূন্য যে আকাশ এতক্ষণ ছিল অর্থহীন নৈরাশ্যে ভরা, এবার যেন দিগন্তরে কোনায় কোনায় পরমার্থের একটি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও ভয় নেই, পরাজয় নেই, শোক-তাপ নেই, জরামৃত্যু ব্যাধি-বিকার কোথাও নেই, অনাদি অনন্তকালের বিরহ বেদনার মধ্যে মানুষের ইতিহাস যেন বারংবার পরম আশ্বাস পেয়ে প্রাণলাভ করছে—এবারে জোর পেয়েছি, একটুও পরিশ্রান্ত বোধ করছি নে।

মূল মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে

ঘৃতদীপ জ্বলছে, পূজার আয়োজন চলেছে। বেদীর উপরে তিনটি মূর্তি সাজান। যে কৃষ্ণনন্দলালের পদতলে মীরাবাঈ অশ্রু বিসর্জন করতেন, সেই মুরলীধরের বিগ্রহটি মাঝখানে; বাঁ দিকে রাণা কুম্ভের মূর্তি, ডানদিকে মীরা!

এমন শান্ত, জনবিরল, সভ্যতা থেকে বহুদূরে এমন বিচ্ছিন্ন একক মন্দির সহসা চোখে পড়ে না। কাছেই এবার একটু বিশ্রামের জায়গা পাওয়া গেল। উঁচু পেটির উপর এসে বসলুম। পুরাতন পাথরের কেমন যেন একটি নিবিড় গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই স্নিগ্ধ শীতল পাথরের থামগুলিতে কতকালের বিচিত্র কাহিনী জড়ান, তার ঘন নিগূঢ় গন্ধে সে কাহিনীকে যেন অনুভব করা যায়।

পানীয় এনে দিল জনৈক সেবায়েত। সেই স্নিগ্ধ জলে চিতোরের রহস্যময় আস্বাদটি যেন মেলান। জলপান করে খুশি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম। পেয়ে গেলুম এবার অনেক সঞ্চয়।

পদ্মিনী মহলের দিকে এসে বুঝতে পারা যায়, এদিকে ঐতিহাসিক স্থাপত্য কিছু আছে। একই লাইনে কিছু কিছু টানা ঘর দোর, কতকটা বা অন্তঃপুর। এ অংশটার নাম 'হাওয়া-মহল' হাওয়া মহলের পিছন দিকে একটি সরোবর। এই সরোবরের ধারে কোন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পদ্মিনীকে আয়নায় প্রতফিলিত করে সম্রাট আলাউদ্দিনকে পদ্মিনীর রূপলাবণ্য নাকি দেখান হয়েছিল। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কি না বলা কঠিন। কেউ বলেন, পদ্মিনী রাণা ভীম সিংহের স্ত্রী; কেউ বলেন, তুর্কী সম্রাটের চিতোর আক্রমণকালে রাণা ছিলেন রত্নসিংহ; আবার কেউ বলেন, পদ্মিনী নামক কোন নারীর অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু একটি সরকারী নোটিস-বোর্ড এই হাওয়া মহলের এক প্রান্তে টাঙ্গানো আছে, তাতে পদ্মিনীর সম্বন্ধে লেখা রয়েছে, তিঁনি বিষ লেহন করে আত্মহত্যা করেছিলেন—যেটির নাম 'জহর ব্রত'। এ নিয়ে আজও নানা বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, পদ্মিনী চিতারোহণ করেন, কেউ বলেন তিনি বিষ খেয়েছিলেন,

আবার কেউ বা বলেন,* নিকটবর্তী সরোবরে তিনি ঝাঁপ দেন। কিন্তু সন্ধি-স্থাপন উপলক্ষে সম্ভবত পদ্মিনীর স্বামী রাণা ভীমসিংহকে আমন্ত্রণ করে আপন শিবিরে নিয়ে গিয়ে আলাউদ্দিন তাঁকে হত্যা করেন, এই বিশ্বাসটি আজও প্রচলিত। এ সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে কতখানি বিকৃত অথবা অতিরঞ্জিত হয়েছে, আজকে তাও নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন।

আজকে ইতিহাস বদলেছে বলেই মানুষের মন বদলেছে। চিতোর থেকে আজ ডাক্ পড়েছে সবাইকে—যারা একদা চিতোর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারা হল সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপের সঙ্গিদল। যারা ঘুরেছিল অরণ্যে পর্বতে নির্জনে রাণাপ্রতাপের সঙ্গে, যাদের বংশ পরম্পরা চিতোরের প্রেমে সমুজ্জ্বল। প্রতাপ আজ নেই, সঙ্গিদলও নেই, আছে তাদের বংশ। সেই বংশ আজ 'গা-দোলিয়া লোহার' নামে পরিচিত। চিতোর হল তাদের। শত্রুর হাত থেকে জাতীয়তাবাদীরা যতদিন না চিতোরকে ছিনিয়ে নিতে পারবে, ততদিন অবধি 'গাদোলিয়া লোহাররা' চিতোরের ভূমি স্পর্শ করবে না—এই ছিল প্রতিজ্ঞা। বিগত চার শো বছরেও এ প্রতিজ্ঞা তারা ভোলে নি, সেই জন্য ইহুদীদের মত তারা নিরাশ্রয় হয়ে রাজস্থান আর মধ্যভারতের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে এককাল থেকে অন্যকালে, এ-যুগ থেকে ওযুগে। পরদেশী শাসন-কর্তাকে কোন মতেই তারা স্বীকার করবে না।

সেই প্রতিজ্ঞা আজ চিতোরেই শুধু সাফল্যলাভ করেছে তাই নয়, তার সাফল্য আজ সমগ্র ভারতে। সুতরাং সেদিনকার সেই নিরক্ষর, নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব অগ্নিহোত্রী গাদোলিয়া লোহাররা—যারা একদল দধীচির অস্থির মত দেশের সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াত, তারা—আজ চার শো বছর পরে এই প্রথম প্রবেশ করেছে চিতোরে। ওই ভগ্নস্তূপ আর প্রস্তরখণ্ড জটলার ভিতর থেকে আবার তাদেরকে ডাক দিয়েছে জরাজীর্ণ প্রাচীন চিতোর

করুণ কণ্ঠে। তাঁরা গিয়ে এবার সেখানে নবজীবন সৃষ্টির কাজ তুলে নিচ্ছে।

ফিরবার পথে টাঙ্গায় কাত হয়ে শুয়ে আবার ঘুম এল আমার চোখে।

॥ ইলাকা জয়শলমের ॥

পশ্চিম রাজস্থানের ধূসর আকাশে শরৎকাল সবেমাত্র শেষ হচ্ছিল। আশ্বিনের দিন আর নেই, কিন্তু ভিন্‌দেশী পর্যটকদের আনাগোনা এখনও শুরু হয় নি। দূরের থেকে নতুন মানুষ দেখে রাজপুতানীরা এখনও বাঁ হাতে ওড়না টেনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতে আরম্ভ করে নি। সুর্মাটানা বাঁকা চোখে কৌতূহল এখনও দেখা যাচ্ছে না।

দূর মরুভূমির উত্তর প্রান্তে হেমন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

যোধপুর ফেলে এসেছি অনেক দূরে, কিন্তু ভারতের বৃহৎ মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে তারও অনেক আগে। এই বিস্তীর্ণ মরুভূভাগের মধ্যে বোধ করি একমাত্র যোধপুরই যেন হরিৎবর্ণের সান্ত্বনা। এর পরে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ পথে সমাজ ও সভ্যতার চিহ্ন সামান্যই মেলে।

মধ্যরাত্রে পেরিয়েছিলুম ‘ফালোদি’ নামক ক্ষুদ্র জনপদ—যার চতুর্দিকে শত শত মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুসাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই জনপদটুকুর মধ্যেই সংসারযাত্রার সমস্ত বিধি-নিয়ম পালন করা চলছে। জন্ম-মৃত্যু-মিলনের বিচিত্র কৌতুক ওই অন্তহীন বালুরাশির মধ্যেই আঘাতে-সংঘাতে সম্পন্ন হচ্ছে।

পোকারনে এসে পৌঁছলুম প্রত্যূষে। সমস্ত রাত্রি পুলিস-প্রহরা ছিল গাড়িতে, আগে জানা যায় নি। এ অঞ্চলে নাকি গাড়ি ও আরোহী নিয়মিত লুঠ হয়। সম্প্রতি নানা কারণে তাই আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। আতঙ্কের সীমানা যোধপুর অবধি বিস্তৃত।

পোকারনে কিছু কিছু সবুজের চিহ্ন মেলে। চাষ কোথাও নেই,

কয়েকটি গাছপালা দেখতে পাওয়া যায় মাত্র। জলের সন্ধান অল্প-স্বল্প, গাড়িতেও জল আসে। তিন চারটি দোকান রয়েছে এখানে ওখানে। কিন্তু খাবার না কিনে শুধু জল চাইলে ওরা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণে জলের ব্যাগ রয়েছে আমাদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে। জলের অভাব সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক। স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা বালুপাথরে আকীর্ণ পথে নামলুম। লগেজ নিয়ে চলল রাজপুতানী কুলি-মেয়ে। জয়শলমের যাচ্ছিলুম।

প্রভাতকাল চোখ মেলছে ধীরে। কিন্তু সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের শোভা নেই পশ্চিম রাজস্থানে। দুটোই যেন অগ্নিকুণ্ড, কেবল ধূলি-ধূসরতার একটা আবরণে ঢাকা। সূর্যোদয় আনে দুর্ভাবনা, সূর্যাস্ত হল সান্ত্বনা মাত্র। গ্রীষ্ম ও শীতের বাইরে আর কোনও ঋতুর ইশারা নেই। বর্ষাকাল নামক কোনও ঋতুর স্থায়িত্ব নেই, শুধু বালুর ঝাপটার সঙ্গে কখনও কখনও আসে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির চাবুক। সমস্ত বছব মিলিয়ে হয়তো বা তিন চার ইঞ্চি। শত শত বছরের মধ্যে নিয়মিত বৃষ্টি কেউ আশা করে নি ; শস্যশ্যামল ফসলের মাঠ আছে কোথাও—কারও কল্পনা ততদূব এগোয় না। বৃষ্টির মেঘ যে পশ্চিম রাজস্থানেব দিকে আসে না তা নয়—আরব সাগর ছাড়িয়ে সৌরাষ্ট্র ও সিন্ধু পেবিয়ে, ওরা এসে মরুসমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তাপে ছটফট করে চলে যায় উত্তর পাঞ্জাব আর কাশ্মীবের দিকে ; কিন্তু পশ্চিম রাজস্থানের আকাশে ওরা দু দণ্ড দাঁড়াবার ঠাঁই পায় না। এখানকার মরুলোকের বুক যখন চিতার আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তখন আকাশ পথে বজ্রদণ্ডের অভিশাপ নেমে আসে বারংবার, কিন্তু স্নিগ্ধ বারিবিন্দুর স্পর্শ তার মধ্যে থাকে বড়ই কম।

মোটর-বাস জয়শলমেরের দিকে চলেছে। পিছন দিকে ফেলে এসেছি পোকারনের পুবনো দুর্গ। এগিয়ে চলেছি আমরা যেন এক মহৎ বিনষ্টির দিকে, যেদিকের তরঙ্গায়িত মরুপান্তরের ধূসর অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছু নেই। পথের আশেপাশে শুষ্ক তৃণগুল্ম আর

পাথরের ডেলা, মাঝে মাঝে খোন্দল। বেলা নটা বেজে গেছে। বালু এখনও যথেষ্ট গরম হয় নি। আশ্রয় লাভের আশা কোথাও নেই, ছায়াপথের চিহ্ন দুরাশা মাত্র। বিস্ময়ের কথা এই, পথের প্রায়ই দুধারে দেখা যাচ্ছে বালুপাথরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লতানে ডগা—কুমড়ো শাকের মত, এবং তারই সঙ্গে ফল ধরেছে ছোট ছোট পীতহরিৎ বর্ণের বাতাবি লেবুর আকারে। মাইলের পর মাইল ধরে দেখছি, শেষ হচ্ছে না। কিন্তু সেই সুপক্ক সরস ফলের প্রতি যাত্রীদের কারও লোভ প্রকাশ পাচ্ছে না। বালুর গভীর তলে কোথাও আছে মাটি, আছে কোথাও অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি, সেখান থেকেই উঠে এসেছে জীবনের এই পরিচয়। অবশেষে লোক পরম্পরায় জানা গেল, ফলটির নাম 'তুম্বু', ওটা নাকি উট আর ভেড়ী-বকরির জরুরী অবস্থার খাদ্য। লবণাক্ত জলীয় বিস্বাদ একটা বস্তু, ওটা নাকি মাঝে মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর কোন কোন শ্রমিকেরও কাজে লাগে। মনুষ্যজিহ্বার পক্ষে 'তুম্বু' সাধারণত অখাদ্য।

দশ মাইল পরে পথের পাশে একটি গ্রামের নাম পাওয়া গেল —'চাচা'। গ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে, যেখানে জলের সন্ধান আছে। দু-চারটি গাছপালা, বালুব নীচে জলের শীর্ণ ভাণ্ডার, আর নয়তো উটওয়ালার কাছে জল কেনাবেচা। কোথাও কুয়া আছে বা। কতকাল আগে প্রাক্-পৌরাণিক যুগে, অথবা বৈদিক যুগেরও বহু কাল আগে—পশ্চিম রাজস্থানে ছিল নাকি সরস্বতী আর দৃষদ্বতী দুই নদী, ওদের সেই অবলুপ্ত জলপ্রবাহের দাগ নাকি আজও বহু পর্যটক আবিষ্কার করতে থাকে, কিন্তু এখন দেখা যায় শুধু চিক্কণ পাথরের নুড়ি আর শামুকের কড়ি, এবং এ দুটোই নদীপথের চিহ্ন। দূর থেকে 'চাচা' গ্রামের কয়েকটি বালু-পাথরের ঘরদোর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে. দু-চারটি খেজুর গাছ, একটু আধটু ছায়া ঢাকা, কিন্তু সূর্যের কর্কশ চক্ষু সেই ছায়ার মধ্যেও শান্ত হয় নি। তার দৃষ্টির

আড়ালে মানুষ আত্মগোপন করার চেষ্টা পাচ্ছে মাত্র। ওদের সামাজিক আনন্দোৎসব সেই সময় সার্থক, যখন সূর্যকে এসে ঢাকা দেয় শাওনের কালো 'বাদল', সেই বাদলের থেকে বৃষ্টি হোক আর নাই হোক।

মাইল ছয়েক পরে আরেকটি গ্রামের সঙ্কেত পাওয়া গেল। এর নাম 'খেতোলাই'। গ্রাম অনেক দূরে, কিন্তু গাড়ি থামবে এখানে। কাঁটাগুল্মের ঝোপড়া দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বিরস বিবর্ণ কয়েকটি নিষ্ফলা নিষ্পত্র ঝাউ, বালুডাঙ্গার আশেপাশে সেই অবশ্যম্ভাবী ফণীমনসা, আর হয়তো মানুষের অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে একটি ইন্দারা, সেইখানে বসেছে গাঁও। পথিকের পক্ষে আতিথেয়তা নেই, অভ্যর্থনা নেই—শুধু দেখে যাও সহনশীল মানুষের আশ্চর্য আত্মরক্ষণী শক্তি। অথচ ওই সর্বব্যাপী অভাবের ভিতর থেকে যারা এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দুর্ভাবনার কারণ ঘটছে না। মারোয়াড়ী পুরুষের মাথায় লাল মখমলের মস্ত পাগড়ি, তাতে চুমকি জরির কাজ। পরনে বেলদার পাঞ্জাবি, তাতে রূপোর চেন-বাঁধা বোতাম ; তার ওপর কারও বা বেগুনী মখমলের জ্যাকেট। পা দুখানা ধুলোয় সাদা, কিন্তু সেই পায়ে জরিবাঁধান নাগরা, শিশোদিয়া এবং রাঠোর বংশের রাণারা চিরকাল ধরে যে ধরনের পাদুকা ব্যবহার করে এসেছে। মেয়েদের পোশাক বর্ণবৈচিত্র্যে ভরা। মুখখানি প্রায়ই ফুরফুরে ওড়নায় ঢাকা। ওরই ভিতর থেকে হয়তো একটি বৃহৎ চক্ষুতারকার বিদ্যুৎঝলক হঠাৎ কখনও বেরিয়ে আসে। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যের উপরিভাগ ঢাকা থাকে রেশমী কাঁচুলিতে, নিম্নভাগের প্রায় নাভিকুণ্ডলী অবধি অনাবৃত। কিন্তু ওরা জানে, সেই অনাবৃত অংশটায় মোহমদিরতা কম। সমগ্র দুই বাহুর সজীব স্বাস্থ্য দেখলে চমক লাগে। আঙ্গুলের নখ কেবল নয়, আঙ্গুলগুলিও প্রায় রং করা। চোখে কাজল, পায়ে রং। রং কোথাও নেই রাজস্থানে, কিন্তু রং নিয়ে মাতামাতি করেছে রাজস্থানীরা।

মোট আটাশ মাইল পেরিয়ে এসে পৌঁছলুম একটি দুর্গপ্রাকারের পাশে। এটি এককালে ছিল বৃহৎ জনপদ। এটির নাম 'লাঠি'। দুর্গের নামও এই। রক্তবর্ণ দুর্গ। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে যত দুর্গ দেখেছি প্রত্যেকের বর্ণই লাল। যোধপুর, অম্বর, চিতোর লাহোর, খাইবার গিরিবর্ত্মের সেই শাগাই, গোয়ালীয়রের মানমন্দির, এলাহাবাদের দুর্গ, আগ্রা-দিল্লী—এর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। 'লাঠি' দুর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ধারে। একদিন তার অহঙ্কার হয়তো ছিল, কিন্তু আজ কেবল 'অর্ধলুপ্ত অবশেষ'। পারাবতের দল ঘোরাঘুরি করছে প্রাকারে ও চূড়ায়, জীর্ণ করে এনেছে মহাকাল, জলুস চলে গেছে মরু হাওয়ার নিত্য ফুৎকারে—এখন শুধু পারাবতের কণ্ঠে চারিদিকের অন্তহীন শূন্যতাটা বালু-প্রান্তরের মাঝখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

শোনা গেল পোকারন ও জয়শলমেরের মধ্যপথে 'লাঠি' হল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনপদ। এর অধীনেই রয়েছে না কি প্রায় সবগুলি গাঁও, এবং এরই দুর্গের মধ্যে রয়েছে প্রহরীবেষ্টিত একটি অস্ত্রশালা। সম্প্রতি 'লাঠি' থেকে বুঝি দু-একজন মানুষ চুরি হয়ে গেছে, তাদের আজও তল্লাস মেলে নি। আমাদের মোটরবাস এসে থামবার আগেই টিলা-পাহাড়ের উপরে ও নীচে অনেকগুলি স্থানীয় নরনারী জড়ো হয়েছে। একদল মেয়ে তারস্বরে একঘেয়ে গান ধরেছে। অন্যদল অধিকতর উচ্চকণ্ঠে কান্না জুড়েছে। মধ্যভারতে প্রথা আছে, কোথাও থেকে সুসংবাদ এলে ওরা দল বেঁধে মেঠোসুরে কাঁদতে বসে। চিঠি হাতে করে খোলবার আগে কেঁদে নেয়। বিবাহের আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলে পাড়ায় পাড়ায় কাঁদতে বেরোয়। বৃষ্টি নামলে গ্রাম-কে-গ্রাম কেঁদে আকুল।

আজকের গান ও বারোয়ারী কান্নার কারণটাও ওরই কাছাকাছি। গ্রামের একটি মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। বহু দূরদেশে তার শ্বশুরবাড়ি—কম-সে-কম এখান থেকে মাইল পঁচিশেক। বিয়ে হয়েছে

বছর তিনেক আগে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তার শ্বশুরালয়ে যাত্রা। প্রভাতকাল থেকে তিনটি গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে 'লাঠি'তে। কারও ঘরে আজ হাঁড়ি চড়ে নি, বাসিমুখে কেউ জল দেয় নি। তরুণী বউটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আগে গান ধরা হয়েছে, গানের সঙ্গে বুক-ফাটা কান্না। মেয়ের মাকে ধরে রয়েছে কয়েকটি স্ত্রীলোক—পাগলিনী মা কাঁদতে কাঁদতে চারপাঁচজনের কোলে নেতিয়ে পড়েছে। বাপকে সেই রোদ্দুরে শুইয়ে কেউ পাগড়ি খুলে বাতাস করছে।

মোটর-বাস দাঁড়িয়ে রইল। ড্রাইভার এবং কন্‌ডাক্টর চোখ মুছছে। একটি যুবক একখানা হলুদ রংয়ের চাদর গায়ে চড়িয়ে আমার পিঠের দিকে বসে অনেকক্ষণ থেকে চোখের জল ফেলছিল। পাশ থেকে আমার পথেব বন্ধু দেবীমল বললে, বেচারা ভি রোতেঁ হৈঁ। প্রশ্ন করলুম, এ লোকটা কেন কাঁদছে?

দেবীমল জবাব দিল কাঁদবে বইকি, ও যে মেয়েটার স্বামী! নিতে এসেছে।

কান্না না থামলে মোটব-বাস ছাড়ার বুঝি বিধি নেই। সুতরাং গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। রৌদ্র প্রবল হয়েছে। সকালেব স্নিগ্ধতাটুকু সম্পূর্ণ লেহন করে নিয়েছে সূর্যরশ্মি। এখনও অনেক পথ বাকি, পঁয়ত্রিশ মাইলেরও বেশি। মরুপ্রান্তর থেকে এরই মধ্যে বাষ্প উঠছে কেঁপে-কেঁপে। যত দূর দৃষ্টি চলছে এদিক ওদিক, মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে বালুব উঁচু ডাঙ্গা, সেটার পিছনে ঝুঁকে পড়েছে দিগন্তেব আকাশ। হঠাৎ সন্দেহ হয় সমুদ্র বুঝি—নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী কোন বৃহৎ জলাশয়—কিন্তু মরুভূখণ্ডের প্রকৃতিই এই। পিছনের অসমান ঢালু দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে।

অতঃপর চারিদিকের ক্রন্দন কলরোলের ভিতর থেকে পিতামাতার টানাটানি থেকে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে অপর একটি যুবক অশ্রুসিক্ত চোখে সেই মেয়েটিকে কোনমতে গাড়িতে তুলল। মেয়েটা ডুকরে-ডুকরে কী কান্নাটাই কাঁদছে। ওটি বড় ভাই—যেটি ওকে এখন [illegible]

রয়েছে। বড় ভাই রেখে আসতে যাচ্ছে বোনকে তার শ্বশুরবাড়িতে। স্বামীটি বসে রয়েছে একটি অমায়িক জন্তুর মত। গাড়িতে এবার স্টার্ট দেওয়া হল। বিস্ময়ের কথা এই, এতক্ষণ কেবল এই কারণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য একজন ব্যক্তির মুখেও প্রতিবাদ ফুটল না, বরং প্রত্যেক সহযাত্রীর সমবেদনাত্মক সম্মতি ছিল। ওদের মধ্যে বসে আমিও যদি রুমাল দিয়ে চোখ ঘষতুম—বেমানান লাগত না কারও চক্ষে।

গাড়িটি ছেড়ে যখন অনেকদূর চলল, তখন আমি সাহস করে বড়ভাইটিকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, এত বেশি কান্না কেন, ভাই? নিতান্ত কনে-বউ তো আর নয়!

বড় ভাইটি জবাব দিল. সে ঠিক কথা। তবে কান্নার কারণ আছে অনেক। একটি কারণ সকলের বড়।

লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। দেবীমল হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ, এবার বুঝেছি। অনেক বউ কাঁদে ওই একই কারণে!

বড় ভাইটি বললে, আপনি পরদেশী, এখানকার রেওয়াজ বুঝবেন না। আমার বোনটিকে তিন মাইল দূব থেকে জল এনে ঘরকন্না করতে হবে। বাড়ির বউ ছাড়া আর কেউ জল আনে না। দিনে ক-বার জল আনতে হবে, জানেন? 'জেঠ্-মাহিনেমে' আপনি এদিকে এসেছেন কখনও?

দেবীমল বললে, বউদের জন্যে এদেশে সবাই কাঁদে, বাবুসাব।

দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছে বাইরের দিকে চেয়ে। বাতাসে বালু উড়ছে কোথাও কোথাও। দশ মিনিটে নিজের থেকেই বালুর ঢিবি পাহাড়ে পরিণত হয়ে ওঠে। সেখানে মানুষ যদি দৈবাৎ পড়ে যায়—নিশ্চিত সমাধি। উত্তপ্ত বালু তুষের আগুনের মত দগ্ধ করবে শ্বাসরুদ্ধ জীবন্ত মানুষকে। কিন্তু এখন আশ্বিনের শেষ, বায়ু ও বালুর ঝাপটা কম।

'লাঠি'র পরে গ্রামের চিহ্ন বড় কম। মরুভূমির ভীতিজনক

অভিজ্ঞতা যেন এখান থেকে বৃদ্ধি পায়। আকাশের বিবর্ণতা মনে *যেন শঙ্কা আনে। মহাশূন্যে মেঘ ভাসে, একথা ভুলে যেতে হয়। পৃথিবীতে মাটি আছে মনে থাকে না।* সমগ্র বাতাবরণ ভরে থাকে কেমন একটা ধূম্রজালে, যার নীচে দিয়ে অন্তহীন মরুলোক দূর দিগন্তে গিয়ে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পথের পাশে এক একটি উট, এবং তার নাকের দড়িটি ধরে রয়েছে যে রক্ষীটি—সে-ব্যক্তির চেহারা আমার অচেনা। মাঝে মাঝে ভেড়া এবং বৃহদাকার ছাগলের পাল নিয়ে যারা চলেছে, তাদেরকেও আমি চিনি নে। এরা জৈন মারোয়াড়ী নয়, এরা মরুভূমির মানুষ। ভারত-বিভক্তির আগে এটি ছিল বাণিজ্য পথ। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, খয়েরপুর, বাহ্বালপুর থেকে যারা পূর্ব রাজস্থান পর্যন্ত এসে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত, তাদের সেই বাণিজ্য আজ বন্ধ। এরা তাদেরই গোষ্ঠিভুক্ত, তাদেরই সম্প্রদায়ের লোক। স্বাধীন হয়েছে দুই দেশ, কিন্তু এরা তার অভিশাপ বহন করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে বারমের পর্য্যন্ত বোধ করি আজও ট্রেন চলে, কিন্তু তারপরে সিন্ধু এবং রাজস্থানের মধ্যকার প্রাণসূত্র গেছে শুকিয়ে। আমাদের জানা এবং শোনার বাইরে রাজস্থান মরুভূমির যে বিশাল বাণিজ্যিক জীবনটা ছিল লোকলোচনের বাইরে সেটি আজ আকণ্ঠ দারিদ্র্যে ধুকধুক করছে। সেই পথ আছে, সেই মানুষ এবং সুযোগ সুবিধাও আছে, কিন্তু সেই অব্যাহত জীবনের আদান প্রদানের ব্যাপারটা রুদ্ধ হয়ে গেছে। বালুপাথরের পাহাড়ের জটলায়, রিক্ততায় এবং তৃষ্ণায়, চক্ষু বুজে পড়ে রয়েছে পশ্চিম রাজস্থান। ঐশ্বর্য সম্পদের সমস্ত পথ বালুর মধ্যে গেছে হারিয়ে।

সামনের দিকে দশ মাইল দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জয়শলমেরের বিশাল দুর্গ। দূর থেকে তার মহিমা অনেকটা যেন উদ্ধত শাসনের মত। চারিদিকে তার দিগন্ত জোড়া সীমাহীন মরুভূমি, এরই মাঝখানে একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দুর্গ কালজয়ী স্বাতন্ত্র্য নিয়ে।

আশে পাশে বালুপাথরের পাহাড় চলে গেছে ডাইনে-বাঁয়ে দূর দূরান্তরে। মাঝে মাঝে সচেতন করে দিচ্ছে বালুপাথরের সঙ্গে চিক্কণ নুড়ির জটলা।' হঠাৎ যদি কেউ এসে বলে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখান দিয়ে নদী বয়ে যেত সুশীতল জলপ্রবাহ নিয়ে, অবিশ্বাস করার কারণ ঘটবে না। কেননা নদীপ্রবাহের বহু লক্ষণ এখানে প্রত্যক্ষ। জল শুধু নেই, আর আছে সব। কোথাও মূল উৎস শুকিয়ে গেছে, অথবা গতিপথ অন্যত্র চলে গেছে—সুতরাং এই মরুলোকে তার প্রাণধারা গেছে হারিয়ে। যেমন পূর্ব-কলকাতায় হারাচ্ছে বিদ্যাধরী, যেমন দক্ষিণ-কলকাতায় হারাচ্ছে আদিগঙ্গা। ত্রিবেণীর একটি বেণী যেমন হারিয়ে গেছে হুগলীতে। প্রয়াগ-সঙ্গমে একটি ধারা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুকালেব মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীকেও যেমন ভুলে যেতে হবে।

আশ্বিনের শেষ প্রান্ত, কিন্তু প্রায় মধ্যাহ্নকালে যখন এসে জয়শলমের পৌঁছলুম তখন মনে হল বৈশাখেব খররৌদ্র। আমার অভিজ্ঞতার কিছু বাকি ছিল। আমার বিশ্বাস, সমগ্র রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেকটি শহর ও জনপদ আমার জানা। কিন্তু জয়শলমেরের সঙ্গে তাদের কোথাও মিল নেই। এ শহরেব ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়তো আজকেঁ শেষ হয়েছে। বাণিজ্যের কেন্দ্র এখন আর নেই, সামন্ত রাজার দখল গিয়েছে চলে, রাজস্বের মোটা অঙ্কটা স্বভাবতই আর থাকার কথা নয়। সুতরাং শীঘ্র যদি জয়শলমেরের অবলুপ্তির সংবাদ শোনা যায়, বিস্মিত হবার কিছু নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে অমন শত সহস্র নগরের বিলুপ্তির কাহিনী জমা আছে। আমাদের দেশেও এমন কাহিনী অগণিত।

ভাঙ্গাচোরা অগোছালো ছোট শহরে পৌঁছে গাড়ি যেখানে থামল, তার আশেপাশে বালুপাথরের জটলার ফাঁকে ফাঁকে পাথরের ঘর। এটা হাটের কেন্দ্র। অল্পস্বল্প কাপড়-চোপড়ের দোকান-পাট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সব মিলিয়ে এত সামান্য, যা দৃষ্টিকটু। অলিগলি

দেখছি আশেপাশে, কিন্তু সেগুলি পথ নয়। কয়েকটি পাথরের ঘরের আশেপাশে হেঁটে যাবার অবকাশ মাত্র। সমস্ত শহরটি ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ এমন কথা বলব না, কিন্তু আগাগোড়া এলোমেলো এবং অগোছালো স্তূপাকার পাথরের জটলাকে শহর বলতে বাধে। যদি কেউ বলত, একটু আগে সমগ্র জয়শলমের আণবিক বোমা পতনের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তা হলে বিশ্বাস করা চলত। এমন দরিদ্র হতভাগ্য এবং সর্বহারা শহর রাজস্থানে একটিও নেই।

দিল্লীর সামরিক দপ্তরের চিঠি ছিল সঙ্গে, সুতরাং আমার পথ ছিল অবারিত। কিন্তু তবু আমাকে পুলিস লাইনে জায়গা নিতে হল—যেটার নাম পুলিস ক্লাব। এর কারণ, পর্যটকের পক্ষে তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু এখানে নেই। আশ্রয়, আহার্য ও আরাম। হোটেল ধর্মশালা নেই। অতিথিশালা আছে কিনা খবর পাই নি। খাদ্য কোথাও নেই—একটি দোকান পর্যন্ত নেই। যারা কিছু খায়, হাতে বানিয়ে খায়। শাকসবজির চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ছে না। গরুমহিষের নাম গন্ধ কেউ জানে না। জল অথবা জলাশয় কোথাও দেখি নি, জল আনতে হয় দূরের থেকে। জলখাবার কিছু চেয়ো না, লজ্জা ছাড়া আর কিছু পাবে না। একথা যদি কেউ বলে, পুলিস লাইনে সব মেলে, তাহলে বলব—সেও ভুল। ভেজাল-মেশানো গমের রুটি আধপোড়া—কারণ জ্বালানির অভাব। নুন এখন পাওয়া যাচ্ছে না জয়শলমেরে, পেঁয়াজের রাঙ্গা-রাঙ্গা কুঁড়ি মিলছে, ডাল সিদ্ধ করবার মত আগুন নেই। ছাগলের মাংস কেউ আনে না। যদি বা জোটে তবে আধসিদ্ধ। পাওয়া যায় কেবল লাল লঙ্কার গুঁড়ো। অতএব কাঁচা পেঁয়াজের কুঁড়ি, লঙ্কার গুঁড়োগোলা অর্ধপক্ক 'রহর-দাল'—আগাগোড়া আলুনি—তার সঙ্গে ঘাসের জঞ্জাল মেলানো আধপোড়া রুটি! এবম্প্রকার উপাদেয় খাদ্য যদি সেই প্রখর রৌদ্রে অস্নাত ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে গলাধঃকরণ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, হায় রে, অন্তত একটু নুন যদি পেতুম!

পুলিস ক্লাবের ছাদে পাওয়া গিয়েছিল আশ্রয়। নীচের তলাটা পাথরের গুহাগহ্বর, সেটা বাসযোগ্য নয়। ছাদের একটি অংশ ঢাকা, বাকিটা খোলা। বৃদ্ধ এক খিদমতগার এক বালতি জল এনে দিয়ে গেল আমার ব্যবহারের জন্য।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিস লাইনের ভিতরে। সেটা এক বিশাল পাথরের ব্যারাক বাড়ি। ওটা সশস্ত্র কোতোয়ালী পুলিসের কেন্দ্র। ফৌজী পুলিস বললে বোধ হয় ভুল হয় না। পোশাক টুপি একই রকম। সৈন্যদল বল ক্ষতি নেই। আমার চিঠিখানা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পুলিস সাহেব পাঠ করে খুশী হলেন। কিন্তু পুলিস লাইনে সেদিন একটি বিশেষ ক্ষিপ্রগতি তোড়জোড় এবং নাটকীয় উৎকণ্ঠা দেখছিলুম। একটির পর একটি ট্রাক সশস্ত্র সেপাইদলকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মরুপ্রান্তরে নেমে যাচ্ছিল, এবং বড়-সাহেবের সহকারী সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন।

আমাকে নিয়ে বড়-সাহেব ঘরে ঢুকলেন। পাথরের একটি নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘর। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, আজকের ব্যাপারখানা কি?

তিনি বললেন, আজ আমাদের অপারেশন চলছে। গতকাল অপরাহ্ণে তিনজন 'বানিয়া' চুরি গেছে 'নাচনা' গ্রাম থেকে। তাদের উদ্ধারের জন্যই এত তোড়জোড়।

কারা চুরি করেছে?

সাহেব বললেন, কুখ্যাত ডাকাত ভূপৎ সিংয়ের দল। মানুষকে ধরে নিয়ে যায় খয়েরপুর, কি বাহ্বালপুরের দিকে। এদিক থেকে 'মুক্তিমূল্য' পাঠালে তবে ছাড়া পায়। ওরা এখনও আমাদের সীমানার বাইরে যেতে পারে নি।

বললুম, কেমন করে বুঝলেন?

হাসলেন বড়-সাহেব। বললেন, আপনি যেতে চান অপারেশনের সঙ্গে?

আমিও হেসে বললুম, এই মুহূর্তে! পা বাড়িয়েই আছি।

কেন যেতে চাইছেন বলুন তো?

বললুম, নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ!

বড়-সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, তাহলে দুটি জিনিসের প্রতিশ্রুতি আপনার কাছ থেকে পাওয়া দরকার। একটি এই, আপনার জীবনের জন্য দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না, কারণ এটা মরুভূমি। অন্যটি হল, আমাদের কোনও কর্মতৎপরতার সংবাদ আপনি কোথাও প্রকাশ করবেন না।

দুটি প্রতিশ্রুতি অকুণ্ঠভাবেই দিলুম।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ। অক্টোবরের মাঝামাঝি। 'নাচনা' গ্রামে তিনজন ধনবান বানিয়া এসেছিলেন পারিবারিক প্রয়োজনে। বহু-লোকের ধারণা জয়শলমেরে ভূপৎ সিংয়ের গুপ্তচরদলের একটি আড্ডা আছে, এবং সেই আড্ডা থেকেই সম্ভবত ভূপৎ সিংয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় পূর্বোক্ত বানিয়া তিনজনেব আগমন সংবাদ। নানাবিধ ইশারা এবং সঙ্কেত আছে এই আড্ডায়, আছে যথাকালের নিশানা। মরুভূমির ভিতর দিয়ে বিশেষ পথের চিহ্ন ধবে অপহরণকারীরা যখন আসে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে—তখন সহজে তাদেরকে দেখা যায় না। ওরা আসে বালুময় টিলা পাহাড় আর ঢিবির তলায় তলায়। বনে জঙ্গলে বাঘ যেমন নালীপথের ভিতর দিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করে, ঠিক তেমনি তিন চারটি উট নিয়ে জন আষ্টেক-দশ ডাকাত লুকিয়ে-লুকিয়ে এসে অতর্কিতে হানা দেয়, এবং মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে দৌড় দেয়। সম্ভবত এই কারণেই জয়শলমের বসবাসকালে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরত একজন সরকারী গোয়েন্দা এবং জনৈক সশস্ত্র পার্শ্বচর। পুলিস সাহেব জানিয়েছিলেন, এখান থেকে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে অপহৃত হতে পারে। বিশেষ করে যিনি অন্যমনস্ক নবাগত ব্যক্তি, তাঁর পক্ষে সমূহ বিপদের ভয়। তা ছাড়া, সবিশেষ লজ্জার কথা, আমার চেহারাটাও নাকি বানিয়াদের

মত! পুলিস সাহেব আমাকে একটু নেকনজরে দেখেছেন দিল্লীর চিঠিখানার জন্যই। সামরিক দপ্তরকে ধন্যবাদ।

যে-মরুভূমিকে স্পষ্টত আমরা দেখি সেটি তার আসল চেহারা নয়। ওর মধ্যে বালু পাহাড়ের খদ আছে, ঢালুপথের সুবৃহৎ নাবাল ভূমি অদৃশ্য হয়ে আছে, এবং যুদ্ধসজ্জাসহ যদি কোন সৈন্যদল একপাল উট নিয়ে ঠিক পথ ধরে দূর থেকে এগিয়ে আসে, তাহলে অনেক সময় উটের নাকের ডগাটিও দেখতে পাওয়া যায় না। জয়শলমের জেলায় যে অধিবাসীরা থাকে তারা রাজস্থানী বটে, কিন্তু সবাই মারোয়াড়ী নয়। ওখানে নানা যুগের নানা গোষ্ঠীব বসবাস। এককালে শ্বেত হুনরা যেমন তাদের বংশ পরম্পরা রেখে গেছে আধুনিক শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে—তেমনি আরব, হুন, এক-শ্রেণীর পাঠান, বালুচ, তাতার প্রভৃতির বংশধররা ছড়িয়ে রয়েছে রাজস্থানে এবং খয়েরপুর, সিন্ধু, বাহ্বালপুর ইত্যাদি অন্যান্য অঞ্চলে। এরা অনেকেই আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রে আজও এসে পৌছায় নি। ওদের নিজস্ব যে জীবন-যাত্রাটা এতকাল ধরে অনাহতভাবে চলে আসছিল, আধুনিক রাজ-নীতির ধাক্কায় সেটা মার খেয়েছে। ফলে তাদের একটা অংশ আছে এপারে, অন্যটা ওপারে। ওদের প্রধান কারবার হল চামড়ার ব্যবসায় এবং ভেড়া ছাগল উট প্রভৃতি জন্তুপালনের কাজে ওরা লিপ্ত থাকে। এদেরই মধ্যে অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে গিয়েছে জয়শলমেরে, যাদের গতিবিধি কিছু ছায়াচ্ছন্ন। অনেকের ধারণা, এদেরই সঙ্গে ভূপৎ সিংহের দলের যোগসাজস রয়েছে।

ঘটনাটা ঘটে অপরাহ্ন কালে, এবং দিনমানের মধ্যে এই সময়টাই নাকি অপহরণের পক্ষে প্রশস্ত। তিন মাইল দূরে 'নাচনা' গ্রাম, সেটি বালু প্রান্তরেরই কোলে। উটের দল এবং তাদের রক্ষীদের গতিবিধির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ কিছু ছিল না। ভিন্‌দেশীরা এসে মিলে গিয়েছিল স্বজনের মধ্যে। ওরা বানিয়া তিন জনকে ধরে একে একে উটের পিঠে চড়িয়ে চম্পট দেয়, বাধা পায় না কোথাও।

অপরাহ্ণকাল উত্তীর্ণ হয়, মরুভূমির উপরে সন্ধ্যার ধূসরতা নামতে থাকে। ঢালুপথ দিয়ে ডাকাতের দল অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিয়ে আটটি ঘটনা ঘটল এক মাসের মধ্যে।

অতঃপর যে-বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে শোনা গেল, তার সত্য মিথ্যার দায়িত্ব আমার নয়। ডাকাতরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে নাকি তাদের উটগুলিকে শিক্ষা দেয়। যে সকল অপহৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মুক্তিমূল্য পাওয়া যায় না, তাদেরকে হত্যা করে তৈলযোগে তাদের মাংস সিদ্ধ করে উটগুলিকে বলপূর্বক খাওয়ান হয়। এতে নাকি উটের কায়িক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং একটি রাত্রির মধ্যে তারা পঞ্চাশ থেকে এক-শ মাইল অবধি দৌড়ে মরুভূমি অতিক্রম করে। এই প্রকার দৌড়বাজির শিক্ষাও তাদেরকে বলপূর্বক দেওয়া হয়ে থাকে।

সমস্ত বর্ণনাটার বাস্তব চিত্রটি এমন খুঁটিনাটি সহযোগে আমার চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল যে, আমার পক্ষে বিশ্বাস করতে বাধে নি।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাওল জয়শল একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর এই প্রস্তর-শহরটি নির্মাণ করেন। রাজস্থানের রাজারা ছিলেন সূর্যবংশীয়, কিন্তু রাজা জয়শল ছিলেন চন্দ্রবংশী, এবং কথিত আছে তিনি নাকি যাদবরাজ শ্রীকৃষ্ণের মূল বংশোদ্ভূত সন্তান। এই শহরটিকে তিনি সুউচ্চ প্রকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। শহর এবং দুর্গ অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। দুর্গপ্রবেশের পথ এবং শহরের এলাকা এখনও অতি দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। কিন্তু অন্যত্র যেমন, এখানেও প্রায় তেমনি। ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র তথা কামান এসে পৌঁছবার আগে ওপরে দুই বিভিন্ন প্রকার দুর্গ নির্মিত হয়। এ দুর্গটি প্রাচীন ধরনের।

একদিন সকালের দিকে প্রবেশ করলুম দুর্গমধ্যে। এইটির আকর্ষণই ছিল আমার পক্ষে সর্বপ্রধান। সঙ্গে ছিল আমার নিত্য

সঙ্গী সেই যুবকটি—যার নাম বাবুলাল কেলা। দুর্গের বাহির অংশের যেমন মহিমা, ভিতরে তেমনি নয়। অতি প্রাচীন অলিগলি, যার শ্রী নেই কোথাও। ভিতর অঞ্চলটি একটি গ্রাম এবং দুচারটি দোকানপাট সমেত স্থানীয় নরনারীর বসবাস। চেহারাটা আগাগোড়া ভগ্নাবশেষ—চিতোরের দুর্গটিকে স্মরণ করায়। ওরই মধ্যে ধোপার বাড়ি আর ছাগলের খোঁয়াড়। যে কয়টি অট্টালিকা ছিল তার অনেকগুলি জরাজীর্ণ, এবং বাকিগুলো নোংরা ফেলার জায়গা। লর্ড কার্জনের আমলের সেই নীল রঙের অবশ্যম্ভাবী সাইনবোর্ড এখনও রয়েছে, কিন্তু সে-অনুশাসন কে কতটুকু মানছে? এটি অম্বর-উদয়পুর যোধপুর বা আজমের নয়—এখানে অনাদর আগাগোড়া। পাথরে পাথরে কারুকীর্তি কালক্রমে ক্ষয় হয়ে এসেছে, নকশাটা এখন আর বিশেষ বোঝা যায় না। কিন্তু ওরই মধ্যে টুকরো ভাস্কর্যের অবশেষ-টুকু মনে-মনে রোমাঞ্চ আনে। খিলানগুলির জোড় আলগা হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশালতার মহিমা সম্ভ্রমবোধের উদ্রেক করে। আট-শ বছরের মধ্যে এক একটি চলতি কাল নিজের প্রয়োজনে অনেক চিহ্ন রেখে গেছে নানা ক্ষেত্রে, কিন্তু কোথাও সেই মহিমার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আধুনিক যুগে এসে দেখছি, এইসব পুরাকীর্তি এবং স্থাপত্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে মানুষের জীবনে। বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধিতে মানুষের মন এখন অনুপ্রাণিত।

মহাকালের আঘাতে দুর্গের অধিকাংশই বিধ্বস্ত হয়েছে, সুতরাং এই ভগ্নাবশেষের জটলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে চারিদিকের মরুপৃথিবীর দিকেই দৃষ্টি ফিরে ফিরে যায়।

অবশেষে এক সময়ে এসে পেঁছিলুম পাশাপাশি দুটি জৈনমন্দিরের মাঝপথে। এ মন্দির দুটি সমগ্র জয়শলমেরের মধ্যে একমাত্র দ্রষ্টব্য শুধু নয়, বোধ হয় এ শহরের এই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ এসে যেন ঢুকলুম কোন একটা অমর্ত্যলোকে। মহাকবির ভাষায়, 'সাম্প্রতের আবরণ সরে গেল।' জৈন এবং বৌদ্ধ—এ দুটি ধর্ম-

সম্প্রদায় ভারতে পাশাপাশি এসে একদা হাজির হয়েছিল। স্বয়ং মহাবীর ছিলেন গৌতম অপেক্ষা ছাব্বিশ বছর বয়সে বড়। মহাবীরের দ্বারা গৌতম সেকালে এতটুকুও অনুপ্রেরণা লাভ করেন নি—এও নিশ্চিত বলা চলে না। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ অভিমত মহামহীরুহে পরিণত হয় এবং জৈন অভিমত অপেক্ষা অধিক প্রধান্য লাভ করে। সর্বত্র দেখেছি মহাবীরের প্রস্তর-মূর্তির সঙ্গে বুদ্ধের মিল আছে অনেক। শুধু মহাবীরের মুখ চোখ একটু গোল ধরনের এবং কান দুটি একটু বড়। দুর্গের মন্দিরে ঢুকে এটা ভাবতে হল, এটি জৈন অথবা বৌদ্ধ। মন্দির অথবা দেবস্থান একটি নয়। ওরই মধ্যে রয়েছে শিব ও শক্তির উপাসনার ঠাঁই, ওরই মধ্যে বুদ্ধের স্থাপনা। কিন্তু মূলত এটি জৈনমন্দির, বাকিগুলি এসেছে কালক্রমে। যেমন সেদিন দেখে এলুম ভাগলপুর ছাড়িয়ে মন্দার পাহাড়ে। চূড়ায় একটি আদিনাথের মন্দির, কিন্তু নীচের দিকটায় শঙ্করনারায়ণ—এবং গুহার পাশে রয়েছেন নরসিংহ।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলুম। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে এ মন্দির দুটি এই দুর্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। দুর্গের সঙ্গে এর কোনও আত্মিক যোগ নেই। কিন্তু জৈনরা এই মন্দির নির্মাণ কালে এই দুর্গটিকেই নিরাপদ ঠাঁই মনে করেছিল। তবু এর আয়ু অল্পদিনের নয়। এর ভিতরকার দুর্লভ সামগ্রীগুলি মিলিয়ে দেখলে অনুমান করা যায়, কোন কোন বস্তু হাজার বছরেরও আগেকার সময়ে সংগৃহীত। দুর্গ প্রাচীন, মন্দির প্রাচীন নয়। মন্দিরের সজীব ভাবটি এখনও বর্তমান। মন্দির গাত্রে খোদিত যে-ভাস্কর্য শিল্প এখনও সতেজ রয়েছে, বোধ হয় এ প্রকার সার্থক শিল্পকলা ভারতের যে কোন অংশেই বিরল। এক একটি পাথরখণ্ড বসিয়ে এক একটি সম্পূর্ণ পৌরাণিক গল্পের দৃশ্যকে খোদাই করে চিত্রিত করা হয়েছে। বোধ হয় অন্য কোথাও স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ঠিক এমনভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। আমার মুগ্ধচক্ষু চারিদিক থেকে যেন এই মন্দিরকে লেহন করে ফিরতে লাগল।

প্রথমে মনে করেছিলুম ভিতরে যে অগণিত মূর্তি রয়েছে সেগুলি বুদ্ধের, কিন্তু সেটি সত্য নয়। মোট এক সহস্র মহাবীরের মূর্তি এখানে স্থাপিত। এক সহস্র! অবাক লাগে বই কি! এই সহস্র মূর্তির দুই সহস্র স্ফটিক চক্ষু দপদপ করে জ্বলছে ছায়ান্ধকারে। ছোট, বড়, মাঝারি—সব মিলিয়ে হাজার। লাল, কালো, সাদা, হরিৎ, রক্তনীল, পীত, পাটল—বর্ণবৈচিত্রের বন্যা বয়ে চলছে চারদিকে। প্রত্যেকটি পাথরের রং মৌলিক এবং বহু দেশ-দেশান্তর থেকে এই-সব বিশেষ বিশেষ বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। বিস্ময়ের কথা, কোনটি নিষ্প্রভ হয় নি, কোনটিতে ক্ষয় ধরে নি। মনের উপরে একটি মোহ বিস্তার করে, সেটি এখানে না এলে উপলব্ধি করা যায় না। হঠাৎ সন্দেহ হয়, দুই হাজার জীবন্ত চক্ষু সকল দিক থেকে অপলকভাবে লক্ষ্য করছে, এবং এই চেতনাটি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। প্রাণ একটি আছে, একটি নিঃশব্দ ভাষা ঘুরছে ওই অন্ধকারে, চাপা কণ্ঠের কিছু যেন কানাকানি, তোমাকে দেখে সবাই যেন একটু সতর্ক—এমনি একটি ভাব তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই মন্দিরের সংলগ্ন আরেকটি দুর্লভ সামগ্রী হল, একটি অতি প্রাচীন জৈন গ্রন্থাগার। ভারতবর্ষের আর কোথায় হাজার হাজার বছর আগেকার একটি গ্রন্থাগার আছে, আমার জানা নেই। শুনলাম মাস ছয়েক আগে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু এসেছিলেন এই গ্রন্থাগারটি দেখার জন্যে। গ্রন্থাগারটির নাম 'জিনভদ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার'। অনেকে বলে, ভারতের প্রাচীনতম পুঁথি তথা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় তিব্বতের কোন গুম্ফায়। কিন্তু একমাত্র এই জয়শলমেরের দুর্গ—যেখানে আজও ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থের তথা পুঁথির সাক্ষাৎ মেলে। কোন কোন পুঁথির বয়স হাজার বছরেরও বেশী। চার-শোর বেশী পুঁথি তালপত্রে লেখা। এক হাজারের বেশী পুঁথি কাগজে লেখা। সেই মধ্যযুগে এই তালপত্রগুলি বিশেষ চেষ্টায় আনা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া থেকে, এবং প্রতি পত্রে চার থেকে আট

ছত্র অবধি তৎকালের প্রচলিত নাগরী হরফে লেখা। সব পত্রগুলি দৈর্ঘ্যে সমান নয়, একটি প্রায় তিন ফুট লম্বা। প্রত্যেকটি অক্ষর কালিতে লেখা, কিন্তু সেই কালি অদ্যাবধি সতেজ। এমনভাবে সুচিত্রিত এবং সুরঞ্জিত কাঠের ঢাকায় এগুলি সুরক্ষিত যে দেখলেই আনন্দ হয়। তৎকালীন ভাষা আমাদের পক্ষে বোধগম্য নয়, কিন্তু একথা জানতে পারলুম যে জৈন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও এখানে দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র—প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যাযুক্ত পাণ্ডুলিপি নাকি এই গ্রন্থাগারের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বৌদ্ধদর্শনের উপর লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এইখানেই নাকি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।

প্রাচীন ভারতের কোন এক জনপদে যেন অনেকক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিলুম। ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম যেন এতক্ষণ সরস্বতী আর দৃষদ্বতীর তীরে তীরে। একটি সময়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলুম দুর্গ থেকে। আনন্দে ভারাক্রান্ত মন।

বাবুলাল যোগাযোগ করে দিল, এবং তারই সহায়তায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল মহারাওল রঘুনাথ সিংয়ের প্রাসাদে। বেলা অপরাহ্ন। চারদিকের ভগ্নপাথরের জটলা এবং পাথুরে গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে এমন যে একখানি প্রাসাদ খুঁজে পাব, এটা ভাবি নি। দুর্গ-শিখরে লাল আলো জ্বলছে। অর্থাৎ, প্রাসাদ অভ্যন্তরে মহারাওল স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আমাকে নানাদিক ঘুরিয়ে নানাপথ ছাড়িয়ে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। সামনেই একটি খোলা ছাদ। তার মেঝের উপর নানা বর্ণের মর্মর পাথরের টালি বসানো। মসৃণ ও চিক্কণ। এখানে রাজদরবার বসে। এই ছাদের বাঁ দিকে ছোট সিঁড়ি উঠে গেছে অন্দরের দিকে। এটি দোতলার বহির্বাটি। কিন্তু এখানে বহু বর্ণের পাথরের জাফরির কাজ দেখে তন্ময় হতে হয়। কাঠ ও লোহা সহসা চোখেই পড়ে না। জানলা, খিলান, গম্বুজ, বারান্দা, সিঁড়ি ও রেলিং—প্রতিটি বস্তু পাথর দিয়ে তৈরি, এবং প্রত্যেকটির

শিল্পকলা মনোমুগ্ধকর। নীচের থেকে একটি বিশেষ নিমগাছের ডাল এসে ছাদের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এবং সমগ্র শহরটির মধ্যে যে তিন চারিটি গাছ দেখতে পাওয়া যায়, এটি তারই একটি।

ভিতরে গিয়ে একটি ঘরের মধ্যে আমাকে বসিয়ে বাবুলাল গিয়ে মহারাওলের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে খবর দিল। প্রকাণ্ড পাগড়ি-পরা এক প্রবীণ রাজপুত এসে আমাকে দেখলেন। চোখে তাঁর চশমা। লোকটিকে মনে হল বানিয়া-শেঠ। আমার আসবার কথা তিনি আগেই জানতেন। আমাকে বাঙ্গালীর সাজে দেখে প্রথমে তিনি একটু কৌতূহলী হলেন, তারপর কি যেন বলতে বলতে বাবু-লালের সঙ্গে আবার ভিতরে গেলেন।

ঘরটি একালের একটি সাধারণ ভদ্র ড্রইং-রুম। বাইরেটা প্রাচীন রাজস্থানী, ভিতরটা আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। ইলেকট্রিক রয়েছে দেখছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি ফিটফাট সুশ্রী আধুনিক যুবক এসে হাজির। পরনে প্যাণ্ট, গায়ে একটি ফিকে নীল কোট। হঠাৎ বুঝতে পারা যায় না, ইনিই বর্তমান মহারাওল। নমস্কার বিনিময় করে হাসিমুখে যুবকটি বসলেন। মরুভূমির রুক্ষতার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল নেই শুনে এবং রাজস্থানের মহারাজাসুলভ বিশাল এক জোড়া গোঁফ ও ঢাল তরোয়াল ঝোলান চেহারা নয় জেনে খুব আমোদ পেলেন। যুবকটি আধুনিক কালের শিক্ষায় মানুষ। তিনি বললেন, বাঙ্গালী তিনি এই প্রথম দেখলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের নাম শুনলেই তাঁর ভয় করে এইজন্য যে, শিশুকাল থেকে সে-দেশের রক্তপাতের কাহিনীই তিনি শুনে এসেছেন। সে-দেশে নাকি কথায়-কথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি শুনে একটু অবাক হলেন যে অকারণে কেউ আসে এই মরুভূমিতে! বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে তিনি যখন শুনলেন সে দেশে আছে সবুজ পাহাড়, গভীর অরণ্য অগণিত নদী এবং হরিৎবর্ণ শ্যামল প্রান্তর—তখন আমার দিকে চেয়ে রইলেন—যেন রূপকথা শুনছেন।

বহুবিধ খাদ্য আসে বাইরের থেকে, তিনি জানালেন। মহিলারা এদেশে খুব কষ্ট পান, তাঁদের গতিবিধি এ অঞ্চলে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। বিলাসদ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না। চাল ডাল নুন তরি-তরকারি—এসব দুষ্প্রাপ্য। এখানে উৎপাদন কিছুই নেই। এ দেশের আদি বাসিন্দা যারা তারা যোধপুর বিকানের ও মারবাড় পর্যন্ত জানে, পূর্ব রাজস্থানের সঙ্গে তাদের পরিচয় কম।

ওইটুকুর মধ্যেই দেখে নেওয়া গেল মহারাওলের জীবনযাত্রা। তাঁরই রাজ্যের সীমানা হল মোহনগড়, রামগড, এবং কিষেণগড়। একটির থেকে আরেকটি চল্লিশ মাইল দূর। এগুলি মরুভূমির ভিতরকার জনপদ, যাকে মরুভূমি অঞ্চলে বলা হয়ে থাকে মরূদ্যান। অথবা ভিন্ন উপমায় বলা যায় মহাসমুদ্রের মাঝখানে এক একটি দ্বীপমাত্র। পশ্চিমে কিষেণগড়ই হল জয়শলমেরের শেষ এলাকা —তারপর মরুভূমির মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব সীমানা।

ঘণ্টা দেড়েক পরে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু মহারাওলও বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। আগে বুঝতে পারি নি সামনের ছাদে প্রজাদের নিয়ে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় দরবার করেন। এখন সাতটা বাজে। সন্ধ্যা সমাগত। ছাদে এসে জড়ো হয়েছে জন পঞ্চাশেক লোক। মহারাওলকে দেখামাত্রই তারা প্রথমত অভিবাদন জানাল। মহারাওল নেমে এসে বসলেন একটি সুন্দর শ্বেতমর্মরের আসনে। আমার দিকে তাকিয়ে এবং বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ-সজ্জা দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠল। এতক্ষণ অবধি প্রজা-পতিকে বসিয়ে রাখা আমার পক্ষে হয়তো একটু অন্যায়ই হয়ে থাকবে। দোতলা থেকে নামবার আগে একবার পিছন ফিরে দরবারের দিকে তাকালুম। না, আমার চোখের ভ্রম! ওরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সকলেই বসে রয়েছে! ওদের শরীরের উচ্চতা দেখে সেদিন বিস্ময়বোধ করেছিলুম।

একথাটা স্পষ্ট, তুই শ্রেণীর লোক বাস করে জয়শলমেরে। কিন্তু একটি শ্রেণীকে আগে কখনও দেখি নি। এরা অতি বিশাল-কায়, এদের পাশে দাঁড়াতে ভয় করে। সাড়ে ছয় থেকে সাত ফুট উঁচু। এরা কবেকার কোথাকার—সঠিক আমি জানি নে। চেহারা ঠিক হিংস্র নয়, একটু যেন ভয়াল। সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে এদেব মিল নেই কোথাও। মরুভূমির কর্কশ কাঠিন্য এবং রুক্ষতা দিয়ে এরা তৈরি। একদিন পথে যখন এদেরই একটি দলের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলুম, তখন বাবুলাল আমার হাতের ওপর অলক্ষ্যে একটা টিপ দিল। কেন দিল প্রশ্ন করি নি। কথায় কথায় মহারাওল আমাকে বলেছিলেন, জয়শলমের এখন আর সামন্তরাজ্য নয়, ভারতের সঙ্গে মিলে গেছে। আমাকে এখন প্রিভিপার্স দেওয়া হয়। জনসাধারণ এখন আর আমার প্রজা নয়। কিন্তু ওরা আমার খুবই প্রিয়। ওরাও আমাকে একদিন না দেখে থাকতে পারে না।

জয়শলমের থেকে তিন মাইল দূরে গেলে পাওয়া যায় 'অমরসায়র'। এটি প্রকৃতই মরূদ্যান। কেবল তাই নয়, কর্কশ ও নিষ্ঠুর বালুপ্রান্তরের মাঝখানে এই বিশাল জলাশয়টি যেন আশীর্বাদের মত। আশেপাশে গাছপালা, ছায়াপথে বাগান-বাগিচা, গাছের ডালে ডালে টিয়া ও চন্দনা, বাগানে ফোটে গোলাপ, স্নানের সুন্দর ব্যবস্থা, তরণীবিহারের বন্দোবস্ত, সৌন্দর্য-পিপাসুগণের মর্মরাসন, স্নিগ্ধ, বায়ুসেবনের জন্য হ্রদের মধ্যে এক একটি পাথরছত্রী এবং বারান্দা। শাওনের দিনে এখানে ময়ুর-ময়ূরী ডেকে যায়। মাঝে মাঝে জল পান করে যায় তুচারটি হরিণ। এটি হল মহারাওলের গ্রীষ্মাবাস। এখান থেকে জল যায় জয়শলমেরে। শোনা গেল, এ অঞ্চলে বহু কায়ক্লেশে মাটি বার করে তুচারটি শাকসবজি মেয়েরা বানায়। মনে পড়ছে শুক্লপক্ষের শেষ দিকের জ্যোৎস্নায় জয়শলমেরের এলাকায় ভ্রমণ করেছিলাম,

এবং সেই ফিনফোটা চাঁদের আলোয় দেখে বেড়িয়েছিলুম, জয়শলমেরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধা ও মহাপুরুষগণের শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অগণিত স্মৃতিস্তম্ভ।

অপরাহ্ণের দিকে বিদায় নিচ্ছিলুম। মোটর বাসে ওঠবার আগে কিন্তু একটি সুসংবাদে সেদিন সমগ্র জয়শলমের স্বস্তিলাভ করেছিল। রাজস্থান সীমানার পাঁচ মাইলে মধ্যে অর্থাৎ কিষেণগড় থেকে কিছুদূর ভূপৎ সিংয়ের লোকরা ধরা পড়েছে এবং তিনজন বানিয়াকে জীবন্ত অবস্থাতেই উদ্ধার করা গয়েছে। অপহরণকারীদের একটু ভুল হয়েছিল। মহাভারতের জয়দ্রথের মত ওরা নাকি মাথা তুলে দেখতে চেয়েছিল সন্ধ্যার আর কতখানি দেরি!

এর বেশি আর বলা চলে না!

॥ লক্ষ্মীবাঈয়ের দেশে ॥

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে তখন মাস দেড়েক আগে। এদেশের অবস্থা তখন স্বাভাবিক নয়। মাঝে মাঝে কলকাতায় নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে। ইংরেজ মার খেতে আরম্ভ করেছে হিটলারের হাতে। জাপান তখন প্রচার কার্য চালাচ্ছে, এশিয়া হলো এশিয়াবাসীদের জন্য। সংগ্রাম তখন ইউরোপে সীমাবদ্ধ।

ভারতের অবস্থা তখনও অনিশ্চিত। ঝড়ের আগে যেমন বায়ু-শূন্যতার একটা গুমোট দেখা যায়, দেশের মনেও তেমনি একটা অস্বস্তিকর বায়ুরুদ্ধতা ছিল। এর ওপর আসছিল দিল্লী-প্রাসাদের থেকে একটির পর একটি ভারতপ্রতিরক্ষা অর্ডিনান্স। নাটকীয় উদ্বেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল প্রতিদিনের সংবাদপত্রে।

বেশ মনে পড়ে সেদিনকার সেই শ্বাসরোধকরা মন নিয়ে হেমন্ত-কালের এক সন্ধ্যায় ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক বন্ধু শশাঙ্ক চৌধুরী—সুভাষচন্দ্র পরিচালিত অধুনালুপ্ত 'বাংলার কথা'র সহযোগী সম্পাদক। আমাদের গন্তব্যস্থল হলো মধ্য ভারতের কাছাকাছি কোথাও। নিজেদের মনের কথাটা নিজের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। নগরের এবং রাজনীতির কোলাহল থেকে দূরে কোথাও গিয়ে আমাদের থাকার ইচ্ছে। এমন একখানে যাওয়া চাই, যেখানে সংবাদপত্র পৌঁছয় না, এবং এদেশের ভাইসরয়-চালিত গভর্নমেন্টের প্রাত্যহিক ইতরামির ছোঁয়াচ যেখানে অনেকটা কম। আমি নিজে তখন দৈনিক 'যুগান্তরের' সঙ্গে যুক্ত। সেখানে দৈনন্দিন সংবাদ ঘাঁটাঘাঁটির ফলে আমারও দরকার ছিল একটি নিভৃত নির্বাসন।

রেলগাড়িগুলি তখনও রাত্রের দিকে নিষ্প্রদীপ হয় নি, এবং যাত্রীদলের জনতার চাপে তখনও গাড়িগুলি রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে নি। মুদ্রাস্ফীতির দিন তখনও আসে নি। লোক বোধ হয় এতদিনে ভুলতে বসেছে যে, যুদ্ধের সময়ে ট্রেনের কামরার বিজলী বাতির বাল্‌ব্‌গুলি আত্মসাৎ করে নিয়ে যেত তৎকালীন সামরিক বিভাগের লোকেরা, এবং সেই অপরাধের দায়িত্ব চাপানো হত সাধারণ নিরীহ যাত্রীদের ওপর। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানানো ছিল অপরাধ! গভর্নমেণ্টের নোংরা মনোবৃত্তি দেখে আমরা অবাক হতুম। সে যাই হোক, সেবার আমরা দিল্লীর গাড়িতে চড়ে বসেছিলুম।

আধুনিককালের কলকোলাহলের মধ্যে যে জীবনযাত্রাটা আমরা নির্বাহ করি, সেটা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক। তার বাইরে বড় সমাজটার দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না। বাইরে এলে দিগ্বলয়টা বড়, দেশটা বিস্তৃততর, এবং আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে ওঠে। দুঃখ বেদনা আছে প্রতি মানুষের প্রতি পদে, কিন্তু বাইরে এসে দাঁড়ালে আকাশ আপন বিশালতার দ্বারা সেই বেদনাবোধকে দিকদিগন্তে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। এ যদি না হত তবে সন্তান বিচ্ছেদাতুরা জননী সান্ত্বনা পেত না, প্রিয়বিরহবিধুরা নারীর চোখে অশ্রু শুকতো না কোনকালে। বাইরেটা হলো মুক্তি, যতদূব কল্পনা ছোটে ততদূর অবধি মুক্তি—সমস্ত সংস্কার, আচ্ছন্নতা, বিভ্রম, অস্বস্তি এবং জটিল চিন্তাচক্রান্ত থেকে অবারিত মুক্তি। আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, ভ্রমণে কোন পিছু টান থাকলে চলবে না, সর্ত আরোপ করা থাকবে না, এবং অভ্যাসের দাসত্ব মানা চলবে না। আমরা কোথায় গিয়ে নামব, কিংবা কোথায় থাকব—এটা হিসেবে ধরলেই আমাদের পরাজয়। পারিবারিক কুশলবার্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেই আমাদের প্রতিজ্ঞা টলবে। সুতরাং আমরা এ যাত্রায় স্থির করলুম, কোনও কিছুর জন্য আমাদের উদ্বেগ নেই, কোন বস্তুর জন্য কৌতূহল প্রকাশ

করব না, এবং এই ভ্রমণ কালে আমরা সর্বপ্রকার অভ্যাসবর্জিত থাকব। শশাঙ্ক বললে, শেষ ফলাফল কি প্রকার দাঁড়াবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! চল দেখা যাক।

দিল্লীর গাড়িতে চড়ে বসেছিলুম বটে, কিন্তু পুঁজি আমাদের কম। তবু এ যাত্রায় যতদিন বাইরে থাকব, পিছনে কোন পায়ের দাগ রেখে যাব না দুজনে—এই ছিল আমাদের মনোভাব। সমস্ত সংসার-যাত্রাটার প্রতি অরুচি, সেই জন্য এই স্বল্পকালীন স্বেচ্ছানির্বাসন, যাকে বলে আত্মবিলোপের চেষ্টা। সকালের দিকে গাড়ি যখন এসে পৌঁছল মোগলসরাইতে, আমরা আলোচনা করলুম এখানে গাড়ি বদল করব কি না, অথবা আমাদের প্রকৃত কোনও গন্তব্যস্থল আছে কি না। সত্য বলতে কি, কোথায় আমরা যাচ্ছি ঠিক জানি নে। আমাদের কাছে নাগপুর নৈনীতাল একই কথা, কাশী আর কাঞ্চীতে কোন প্রভেদ নেই। শশাঙ্ক বললে, আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক, মন্দ কি!

প্রশ্ন করলুম, কাশী যাবে?

না, চল যাই কানপুরে। কানপুর দেখি নি।

অতএব ট্রেনের গার্ডকে ডেকে খবরটা দিয়ে রাখতে হল যে, আমরা ডেহরি-অন-শোন্-এ নামব ভেবেছিলুম, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রার ফলে এসেছি মোগলসরাইতে—এখন আমাদের যাবার ইচ্ছে হচ্ছে কানপুরে।

সহাস্য ভ্রূকুঞ্চন করে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড আমাদের দিকে তাকাল। আমরা বললুম, হ্যাঁ মশায়, এর নাম ভ্রমণ। মানে, আমাদের কোন তাড়া নেই।

অক্টোবরের আকাশ নতুন করে আবার নীল হয়েছে। বাঙ্গলার শরৎকাল যেমন সুন্দর, পশ্চিমের নূতন হেমন্ত অতি আনন্দদায়ক। ছোট ছোট পার্বত্য প্রান্তরে কেমন যেন নীলাভ ছায়া পড়ে—তার সঙ্গে স্নিগ্ধ তন্দ্রাতুর হাওয়ায় আর রৌদ্রে যেন মধুর কাব্যময়তা।

ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি, কিংবা চোখ বুজে কোথাও ভেসে চলে যাচ্ছি—ঠিক হুঁশ থাকে না। রেল গাড়ির কামরায় অস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারলে আমি খুব আনন্দ পাই। অসংখ্য নরনারী, ছোট ছোট কাহিনী আমার মনে লিপিবদ্ধ করে চলে যায়—ওটাই যেন আমার মানসিক বিলাস। নাম-পরিচয় কিছু নেই, শুধু মানুষ—মানুষের ছোট ছোট গল্প। আমার মনে কোন তাড়া নেই, তাড়া থাকাটাই আত্মকেন্দ্রিকতা, অহমিকার অভিব্যক্তি। রেল গাড়িতে উঠে কেউ ঘুময় বেশী, কেউ বেশী খায়, কেউ গান ধরে গলা ফাটিয়ে, কেউ বই নিয়ে বসে, কেউ বা নিজের জায়গাটুকুর সম্পর্কে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে ওঠে। বাইরে যারা অতি বিশিষ্ট ভদ্রচেতা নরনারী—রেল গাড়িতে উঠে সামান্য একটু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে তারা অন্য সহযাত্রীর প্রতি এত ইতরতা প্রকাশ করে যে, দেখে লজ্জা হয়। পাখির জগতে পারাবতের গুণগান করে কবিরা—কিন্তু পায়রাদের মত এত স্বার্থপর ও ঈর্ষাকাতর পাখি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই।

অপরাহ্নের কাছাকাছি এসে আমরা কানপুরে নামলুম। কেন নামলুম জানিনে, জানবার জন্য ব্যাকুলতাও নেই। আমরা শহরের লোক বলেই শহর আমরা পছন্দ করি নে। ওর প্রায় একই ছাঁচ, একই ধরন এবং প্রায় একই প্রকৃতি। যুদ্ধের কালে কোন শহরই সুস্থ নয়, একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক শহরকেই চলতে হচ্ছে। কানপুরে তখন যুদ্ধ-প্রচেষ্টার হিড়িক পড়ে গেছে। কলকারখানার তোড়জোড় চলছে। ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধ সরবরাহ যাবে এই তখনকার গভর্নমেণ্টের মনোভাব।

ঘুরে বেড়ানোটাই বোধ হয় ভ্রমণ—যেটার লক্ষ্য কিছু নেই। কানপুরে নাকি নানা দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। আছে তো থাক্, আমাদের কোন কৌতূহল নেই। আমরা কী দেখতে এসেছিলুম জানিনে, কিন্তু যা চোখে পড়েছে তা অবশ্যই দেখতে চাই নে। কোন

শহরেই হৃদয়ের কোন শোভা নেই। দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা—কোথাও না। কৌতূহল জাগায়, আনন্দ আনে না। উদ্বেগ আছে, ঔৎসুক্য নেই। হাজার হাজার লোকের ভাগ্য নিয়ে নিরন্তর জুয়াখেলা, শহর মানে তো এই। অনেকে বলে সংস্কৃতির কেন্দ্র হলো শহর—ওটা ভুল। সংস্কৃতির আসন হলো হৃদয়। অন্য কোথাও তার ঠাঁই নেই। অতএব অপরাহ্ণকাল থেকে রাত্রি অবধি আমরা এক পথ থেকে অন্য পথে টাঙ্গা সহযোগে ঘুরে বেড়ালুম কিন্তু শহরকে ভালো লাগাতে পারলুম না। বৈষয়িকের পক্ষে কানপুর ভালো, চাকুরের পক্ষে ভালো, ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে আরও ভালো।

আমরা বাঙ্গালী পোশাকটাকে একটু বদ্‌লে নিয়েছিলুম চলাফেরার সুবিধার জন্য। সেই কারণে কানপুরে বহু সংখ্যক বাঙ্গালীকে দেখা সত্ত্বেও আমরা তাদের চক্ষে কৌতূহলেব পাত্র হই নি। এটাই আমাদের পক্ষে সুবিধে। ধরা দেবো না, কেবল দেখে নেবো। প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁদের মাঝখানে নতুন বাঙ্গালীকে দেখলে সৌজন্যবশত আলাপ করেন, আমরা সেই আলাপ এড়াতে চেয়েছিলুম। বেশ মনে পড়ে, অনেককাল আগে দেওঘরে এক ছোটখাটো বাঙ্গলা সাহিত্যসভায় আধুনিক লেখকদের নিয়ে এক আলোচনা হয়েছিল। দৈবাৎ আমিও সেই সভায় আলোচনার অন্যতম পাত্র ছিলুম। আমার মাথায় ছিল গান্ধীটুপি। সেই সভায় নবাগত এক বক্তা হিসাবে বসে আমি নিজেকেই কঠোর সমালোচনা করে এসেছিলুম। এর মাসখানেক পরে এক ভয়ানক অভিযোগপূর্ণ চিঠি আমার নামে এসে পৌঁছয়। সভাস্থ লোকেরা নাকি আমার হাতে প্রতারিত।

বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সামান্য আত্মপরিচয়টুকু চেপে রাখা আমার অভ্যাস। ওতে দেখার সুবিধা হয়, এবং স্বচ্ছন্দ যুক্তি থাকে। কানপুরেও তাই। আমরা ঘুরে বেড়ালুম অনেক। অপরিষ্কার

পরিচ্ছদ—ওতে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। পথে পথে চা খাওয়া, যেখানে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো, রাস্তার ধারে বসে থাকা, দোকানের পাশে উবু হয়ে বসে ক্ষুধা মেটানো—অর্থাৎ জনসাধারণের দলে নিজেদেরকে হারিয়ে দেওয়া, এবং গঙ্গার ধারে গিয়ে দূরদূরান্তরের বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া। অমনি করে কানপুর দেখাটাই সত্য হয়ে আছে।

রাত গভীর। বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে। কানপুর থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। একটু আগে যমুনার পুল পেরিয়ে গেছে। পুলের উপর দিয়ে পার হবার সময় ট্রেনের চাকার নীচে ভিন্ন প্রকার আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজটি আচমকা নতুন বলেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। এটা শুক্লপক্ষের প্রথমাংশ—সুতরাং চন্দ্র অস্ত গেছে পশ্চিমে অনেক আগে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এ অন্ধকাব ঝোপ জঙ্গলে ভরা নয়। অনুর্বর প্রান্তরেব ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি—মাঝে মাঝে দেখছি ছোট ছোট টিলা পাহাড়। এটি হলো ভারতের হৃৎকেন্দ্র, গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত হয়। আমরা চলেছি ঝাঁসীব দিকে।

বেত্রবতী নদীর ধারার পাশে পাশে চলেছে অমাদের ট্রেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, উত্তরভারত যখন সমুদ্র ছিল, এবং হিমালয় অথবা গঙ্গার যখন জন্ম হয় নি, অর্থাৎ মাত্র ছয় কোটি বছর আগে—তখন চারিদিক সমুদ্র ঘেরা ভারতের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। বৈদিক মন্ত্রে আজও তাই জম্বুদ্বীপের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সেই জম্বুদ্বীপের কালে আরাবল্লী পাহাড় ও বেত্রবতী নদী প্রবহমান ছিল। অতএব আমরা আধুনিক ভারতবর্ষ ছেড়ে আপাতত প্রাচীন জম্বুদ্বীপের মধ্যে এসে পড়েছি ধরে নিতে হবে।

প্রত্যূষের আলো যখন ফুটলো, তখন বুঝলুম এই প্রকার ভূভাগ দেখার জন্যই আমাদের মনে ক্ষুধা ছিল। কোন্ দৃশ্য দেখে সহসা আনন্দিত হয়ে উঠলুম, সে বলা শক্ত। কেননা পৃথিবী

এখানে শস্যশ্যামলা নয়, বাতাসে সেই ভিজা চুলের মত সজলতা নেই, নেই কোথাও বনময় গ্রাম, কিংবা দীঘি-সরোবরের মাঝখানে শতদলের শোভা। চারিদিক যে অনুর্বর তা বলব না, কিন্তু এমন রুক্ষতার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় নেই। ভোরের দিকে বেশ স্নিগ্ধতা, গায়ে চাদর টেনে দিতে ভালো লাগে। কোথাও জলের ধারা দেখি নে। খাল বিল কোনটাই চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে ধুধু প্রান্তরের মধ্যে চোখে পড়ে প্রাচীন কালের কোন কোন ভিটার ভগ্নাবশেষ। দেশীয় কোন রাজ রাজড়ার দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। কোথাও পরিত্যক্ত মন্দির, তার গা বেয়ে উঠেছে বট অশ্বত্থের শিকড়ের জটলা। কোথাও বা রঙীন ঘাগরাপরা গৃহস্থবধূ কিংবা শ্রমিক মেয়ে চলেছে এই প্রভাতে এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে।

আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছল ঝাঁসী স্টেশনে!

ঝাঁসী নামটির সঙ্গে একটি মোহমদিরতা আছে। ঝাঁসীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি মেয়ের অসম-সাহসের ইতিহাস। যত পুরাকীর্তিই এখানে থাক না কেন, এই ক্ষুদ্র শহরটির একমাত্র প্রাধান্য হলো, এখানে একটি বীর্যবতী রমণীর জীবনমৃত্যুর ঐতিহাসিক খেলা। দুশো বছর আগে পলাশী, একশো বছর আগে ঝাঁসী—এই দুটি সংগ্রামের কাহিনী ইংরেজের ইতিহাসও ভুলবে না কোনদিন। সেই কারণে প্রথম পদার্পণ করে একশো বছর আগের কাহিনী আমাদের পায়ের তলায় যেন আবেগের কাঁপন সঞ্চার করে দিল। কত কাব্য নাটক উপকথা কাহিনী সঙ্গীত ও গাঁথা—এই শহরটিকে ঘিরে এই একশো বছরে গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। সকলের চেয়ে আনন্দদায়ক এই যে বাঙ্গলার সাহিত্যে ঝাঁসীর রাণী ও অন্যান্য বীর রমণীগণের গৌরবগাথা সকলের আগে প্রথম কীর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, সমগ্র ভারতের সকল প্রদেশ যখন ঘুমিয়ে, সেই কালে ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে যেখানে যা

কিছু বীরত্বের কাহিনী সংঘটিত হয়েছে, বাংলার সাহিত্যে তাদের জয়গান প্রথম ঘোষিত হয়। শাক্ত বাঙ্গালী চিরকালই শক্তির মূল্য দিয়ে এসেছে। সেদিনকার সুভাষচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিই হলো ঝাঁসীর রাণী বিগ্রেড্ সৃষ্টি করা। নব-ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে রাণী লক্ষীবাঈকে এত বড় গৌরবদান আর কোন নেতাই করেন নি।

শশাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় একটা জুটিয়ে নেওয়া গেল কোনমতে, কিন্তু স্থানীয় আবহাওয়াটা বড়ই আনন্দদায়ক মনে হলো। জলের অভাব এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে, সেজন্য সরকারী জলদানের ব্যবস্থা আছে। চল্লিশ বছর আগে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী এখানে স্বামীর কার্যোপলক্ষ্যে বাস করতেন। ছোট বেলায় তাঁর মুখে গল্প শুনতুম, এখানে ভিস্তির কাছে জল না কিনলে রান্না হত না, এবং গ্রীষ্মকালে দোকানে দোকানে জল বিক্রি হত। বাঙ্গালী শ্রোতার কাছে এ সব গল্প অদ্ভুত শোনাতো বই কি।

একশো বছর ধরে একটি নগরের প্রতি-ধূলিকণা পবিত্র হয়ে রয়েছে কেবলমাত্র একটি বীরাঙ্গনার আত্মোৎসর্গের স্মৃতি নিয়ে—এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভারতের আর কোথাও নেই। চট্টগ্রামের প্রীতিলতা, আসামের গুইডেলো, মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা, এরা সর্বজন-শ্রদ্ধেয়; কিন্তু লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে এত রং, এত রস, এত আনন্দবেদনা চলিত রয়েছে যে, রাণী দুর্গাবতী অথবা সুলতানা রিজিয়া পর্যন্ত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। বেশ মনে পড়ে, ছোটবেলায় স্কুলপাঠ্য বইয়ের বাইরে প্রথম যে বইখানি পড়েছিলুম তার নাম 'ঝাঁসীর রাণী'; সে-বইখানি আমাদের বাড়িতেই ছিল, কিন্তু বইখানি তখন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। এই নগরের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে আমার সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের হৃদয়াবেগকে একবার স্মরণ করলুম।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বাড়িটির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম।

সাধারণ জমীদারবাড়ির মত চেহারা। প্রাসাদও নয়, অথবা অট্টালিকাও নয়—বড় রকমের একটি গৃহস্থ বাড়ি। কলকাতার রাণী রাসমণির বিশাল ইমারতের একাংশের মত। বাইরে নানা লোক-জন বসে রয়েছে। আশে পাশে জনবসতির ভিড়। বাড়ির দরজা জানলা পুরনো—যেমন হয়। বাড়িটি ছেড়ে আমরা রাণীর উদ্যান-দীঘির দিকে অগ্রসর হলুম। এক সময় সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে আমরা একটি জায়গায় এসে দাঁড়ালুম যেখানে লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্র মহিমার কিছু আভাস পাওয়া যায়। মরুভূমির মাঝখানে যেমন মরূদ্যান, তেমনি ঝাঁসীর হৃৎকেন্দ্রে বিশাল নয়নবিমোহন সরোবর। কাকচক্ষুর মত কালো জল টলটল করছে সরোবরে। চারিদিকে যেন করুণ বনময়তা। দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষশ্রেণী, লতাবিতানে নানাবর্ণের পুষ্পসম্ভার, কোমল দুর্বাদলে আকীর্ণ চারিপাশ। দীঘিকে বেষ্টন করে কয়েকটি আলোক স্তম্ভ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এপারে একটু উঁচুতে উঠলে সেদিনকার সেই শিব মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ আছে। প্রকাশ, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাথীদল সহ উদ্যানভ্রমণ শেষ করে লক্ষ্মীবাঈ সন্ধ্যারতির লগ্নে মন্দিরে এসে বসতেন। আজ কিছু নেই, অথচ আমাদের সামনে রয়েছে সমস্তই। পাখি ডেকে উঠছে এগাছে ওগাছে, কিন্তু তার ডাকে শুধু যেন কান্না শোনা যায়। নূতন হেমন্তের শুষ্ক স্নিগ্ধ বাতাস আমাদের মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, কিন্তু ওই হাওয়ায় আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন শুনলুম বিগত কালের আর্ত হাহাকার। বিমূঢ় নিশ্চল হয়ে কতক্ষণ আমরা শিবমন্দিরের চত্বরে ধুলোবালির উপরেই বসে রইলুম। সমগ্র উদ্যানের পারিপার্শ্বিক শোভায় লক্ষ্মীবাঈয়ের হৃদয়টি যেন উদ্‌ঘাটিত। আমাদের সমস্ত বিষাদের মধ্যেও নিবিড় আনন্দের উপলব্ধি ছিল সন্দেহ নেই।

বাঙ্গলায় তখন দুর্গাপূজা এবং পশ্চিমে 'দুসেরা' বা দশহরার মরসুম। ঝাঁসীর নরনারী সেদিন ওই পর্ব নিয়ে মেতে উঠেছে। আজ এখানে মস্ত মেলা। মন্দিরে ও দেবস্থানে চলছে পূজার্চনা। ধূপ দীপ ও

চুয়া চন্দনের গন্ধে কোন কোন পল্লী ভরভর। অনেক মেয়ে বেরিয়েছে 'জলসইতে'। কাপড়ে রং ছুপিয়ে এবং রঙীন উত্তরীয় জড়িয়ে গৃহস্থ-বধূরা মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বের করেছে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীতে পথঘাট মুখরিত। নানা অলঙ্কার ও আভরণে ভূষিত ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বালক বালিকারা সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে বেরিয়েছে। উপরি পাওনা হিসেবে আমরা এই সব মনোহর দৃশ্যও দেখে নিতে পারলুম।

সকালে যেমন স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়ায় শীত ধরেছিল, এ বেলায় তার বিপরীত। মধ্যাহ্নের দিকে ধুধু করছিল ঝাঁসী শহর। সিভিল লাইনস্-এর দিকে আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। সেখানে গোরা পল্টনের ছাউনি, কোর্ট কাছারি তথাকথিত ভদ্রসমাজের পাড়া এবং সরকারী কর্মচারীদের উন্নাসিক আবহাওয়া। জানি সেখানে আমার দু-একজন বন্ধুবান্ধব আছেন, অত্যন্ত আবামদায়ক আতিথেয়তা সেখানে মিলবে। কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দচাবণা সেখানে ব্যাহত হবার ভয় ছিল।

বিশ্রাম নেবার দরকাব আমাদের ছিল না। ধূলিমলিন কাপড় চোপড় পরেই আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। নিশ্বাস নিচ্ছি নতুন হাওয়ায়, সেইটিই আমাদের আনন্দ। ভ্রমণকালে আমরা কেবল নতুন দেশ দেখে বেড়াই তা নয়, আমরা নতুন মন নিয়েও ঘুরে বেড়াই। ঝাঁসীতে যা দেখছি—এই মেলা, এই জনতা, এই পুতুলের সমারোহ, এই নূতন ধরনের লোকসঙ্গীত অথবা এক একটি শোভাযাত্রার সমারোহ—এ এমন বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু এই সামান্যতেই আমাদের আনন্দ। ওদের মধ্যেও আমরা। ওদের কৌতুকে, পার্বণে, উৎসবে মেলায়—আমাদেরও মন জড়িত। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য, অব্যাহত সংহতি। সেই কারণে ওদের শোভাযাত্রায় আমরাও যোগদান করলুম। অনেকে কৌতূহলী হয়ে তাকাল, অনেকে কানাকানি করল, অনেকের কাছে বা

কৌতুকের পাত্র হলুম। কিন্তু সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক যোগসূত্রটা এখানে লক্ষ্য করে আমরা রস পাচ্ছিলুম।

আমরা স্থির করেছিলুম অপরাহ্নের গাড়ি ধরে আমরা ঢোলপুরে এবং সেখান থেকে গোয়ালীয়রে যাব। সেজন্য আমরা মধ্যাহ্নের কিছু পরে আবার অন্যপথ ধরে চললুম। রোদ টা টা করছে পথে। পুরনো শহরের প্রান্তেই হলো ঝাঁসীর ভারত বখ্যাত দুর্গ। কিন্তু যত বিখ্যাতই হোক, এটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট। আগ্রা দিল্লী এলাহাবাদ লাহোর কিংবা গোয়ালীয়র—এ সব অঞ্চলের দুর্গ যারা দেখেছেন, তাঁদের চোখে ঝাঁসীর দুর্গ সুবৃহৎ নয়। আমরা ধীরে ধীরে দুর্গদ্বার প্রবেশের সামনে সুদীর্ঘ ঢালুপথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। এই ঢালুপথে একদা বন্যাস্রোতের মত নেমে আসতো ঘোড়-সওয়ারের দল তরবারি হাতে নিয়ে। সকল দুর্গপ্রাকারের প্রবেশ পথের সামনেই এই ঢালুপথ দেখতে পাওয়া যায়! আমরা এ-প্রান্ত থেকে লক্ষ্য করলুম, জনৈক ইংরেজ টমী ও-প্রান্তের প্রবেশ পথটি পাহারা দিচ্ছে। এখন যুদ্ধের কাল। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি দুর্গই এখন নিষিদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়ে আছে। দর্শনার্থীদের যতটুকু দেখানো হবে ততটুকুর বেশী দেখতে চাইলেই বে-আইনী। প্রবেশের অধিকার আমাদের আছে কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে আমরা ওই চড়াইপথে ধীরে ধীরে দুর্গদ্বারের দিকে অগ্রসর হলুম। ক্রমে দেখতে পাওয়া গেল, একটি নয়—চার পাঁচটি ইংরেজ সৈন্য দ্বার রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আমাদের দেখে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাদের কায়দাকানুন দেখে শশাঙ্ক একটু থতিয়ে গেল। সে অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, কোন ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না।

কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, ভিতরে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা।

টমীরা প্রশ্ন করল, কেন যেতে চাও?

ভিতরটা দেখে নেবার ইচ্ছে। আমরা অভ্যাগত।

আমার কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো ছিল। সেইদিকে একবার তাকিয়ে টমী পুনরায় বললে, এ দুর্গ না দেখলে তোমাদের ক্ষতি কি ?

ওরা কি যেন বলাবলি করল, তারপব বল্‌লে, আচ্ছা যাও, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এস। আমরা বাইরের লোককে আজকাল ঢুকতে দিই নে।

বুঝতে পারলুম অসীম ঘৃণা মনে মনে নিয়ে শশাঙ্ক ভিতরে ঢুকল, এবং ওই ঘৃণায় আচ্ছন্ন রইল সে সমস্তক্ষণ।

দুর্গটি বেশ প্রাচীন। ভিতর থেকে নানাস্থানে গাছপালা গজিয়েছে। ফাটল ধরেছে বহুস্থলে। অল্প পরিসরের মধ্যে একটির পর একটি কক্ষ। লতাগুল্মে ঝোপ জঙ্গলে এদিক ওদিক আকীর্ণ। ভিতর দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি রয়েছে। দুর্গের তিন দিকে বিশাল প্রান্তর, এক দিকে ঝাঁসী। সমস্ত দুর্গের ভিতরটা যেন বিষাদে আচ্ছন্ন। গাছগাছড়া ও ঝোপ ঝাড়ের ছায়ায় যেন কোন এক করুণ কাব্যেব সঙ্কেত। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু হলো, হামাম— অর্থাৎ রাণীর স্নানাগার। আগ্রা দুর্গের মত এখানেও সেই স্ফটিকের আলো অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠিকরে আসছে। আশে পাশে সেই পাথরের আর কাঁচের মুকুর। এখানে জল সরবরাহ হত কেমন করে সেকথাটা এখন আর জানা যায় না। হামামের দিকটা বেশ ছায়াছন্ন এবং বাতাসটি স্নিগ্ধ। আমি নিজে এখানে ওখানে ঘুরে কয়েকটি ছবি তুলে নিলুম।

ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ এখানে দুজনে কাটাব এবং ইতিহাস নিয়ে দুজনে আলোচনা করব। একবার স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আমরা কয়েকজন আগ্রা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছিলুম, এবং চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস তিনি যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—স্কুল কলেজের দীর্ঘ কালের পঠন-পাঠনের ফলেও

তেমন শিক্ষা হয় না। এই লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গের মধ্যে বসে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই টমী সামনে এসে দাঁড়াল এবং স্পষ্ট প্রশ্ন করল—ক্যামেরায় ছবি তুলেছ?

স্পষ্ট জবাব দিতে হলো, হ্যাঁ।

কেন তুলেছ?

ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করলুম, Hobby।

আমার বিনা অনুমতিতে টমী আমার কাঁধে-ঝোলান ক্যামেরাটা টেনে নিল এবং পলকের মধ্যে ক্যামেরাটি মুচড়ে খুলে ভিতর থেকে ফিলমটি টেনে নিয়ে কুচি কুচি করে সেইখানে ছিঁড়ে ফেলল। তাড়াতাড়িতে তার হাতের মোচড়ে ক্যামেরার ভিতরের একটি কবজা গেল ভেঙ্গে। প্রশ্ন করলুম, ভাঙ্গলে কেন?

টমী জবাব দিল, সারিয়ে নিয়ো।

কিন্তু খরচটা?

দ্বিতীয়জন চোখ পাকিয়ে এসে বললে, গেট আউট!

চলে এসেছিলুম বটে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণামের কথাটা ভেবে রেখেছিলুম।

ক্যামেরাটা ওই ঝাঁসীতেই মেরামত করে নিয়ে আমরা অলক্ষ্যে দূরের থেকে লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্গের আরেকটা ছবি নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু রৌদ্রের তেজে সে-ছবিটি ভাল হয় নি।

ছোট্ট ঘটনাটিতে আমাদের মনে অসীম বিরক্তি জমেছিল। যখন আমরা গোয়ালীয়র যাবার গাড়িতে উঠে বসলুম তখন শশাঙ্কর মুখে একটিও কথা ছিল না। রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি প্রকার মনের অবস্থা নিয়ে একদা শত্রু সৈন্যদলের মধ্যে উন্মাদিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় শশাঙ্কর মুখের চেহারায় তারই আভাস লক্ষ্য করেছিলুম।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

॥ কোয়েটার ট্রেনে ॥

লাহোর থেকে যাচ্ছিলুম রাওয়ালপিণ্ডি। আমার কপাল মন্দ, যতবার গেছি লাহোরের পথে, ততবারই প্রখর গ্রীষ্মকাল। এটাও সেই জ্যৈষ্ঠমাস। এবং জ্যৈষ্ঠমাসের কথা উঠলেই আমার মনে পড়ে যায়, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোয়েটার সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প। অনেকেরই মনে আছে পরলোকগত সুলেখক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু তখন ইউনাইটেড প্রেসের একজন প্রধান কর্মী। তিনি থাকেন শিমলা পাহাড়ে, এবং আমি তাঁর বাড়ির ঠিক অতিথি নয়, বরং সাময়িক বাসিন্দা। ৩১শে মে মধ্যরাত্রে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে যুক্তপ্রদেশের গভর্নর হ্যালেট সাহেব সত্যেনকে টেলিফোন করলেন শিমলার ওয়েস্টরীজ থেকে কোয়েটার ভূমিকম্পের জরুরী সংবাদ। কোয়েটা নাকি ধূলিসাৎ! পশ্চিম কমাণ্ডের জনৈক পদাতিক সৈন্য কোয়েটা থেকে ষোল মাইল পথ ছুটতে ছুটতে গিয়ে গভর্নর জেনারেলের এজেন্টকে খবর পাঠায়। এজেন্ট সেই সংবাদ পাঠান শিমলায়। সত্যেন্দ্র ছিলেন হ্যালেটের খুব প্রিয়। সুতরাং কোয়েটার সংবাদ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার আগে জানলো সত্যেন, এবং সেই দিন থেকে ইউনাইটেড প্রেস আমাদের এদেশে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত সত্যেনের এই কর্মতৎপরতা সেদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন, সত্যেনের গৌরবে সেদিন শিমলাপাহাড়ের বাঙ্গালীরা গর্ববোধ করেছিল, এবং সত্যেনের সাংবাদিক দক্ষতার জন্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ 'কালীবাড়ি'র বহু বাঙ্গালী তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি ছিলুম সাক্ষী।

পরদিন প্রভাতে নানাবিধ কর্মতৎপরতার মাঝখানে সত্যেন বললে, কোয়েটা যাবি? যদি যাস এখনই তৈরী হয়ে নে।

চুপ করে রইলুম। আগের বছরের জানুয়ারীতে অর্থাৎ প্রায় বছর দেড়েক আগে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের চেহারাটা দেখেছি। সুতরাং খুব উৎসাহ পেলুম না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সেই তো একই পুনরাবৃত্তি!

সত্যেন সেদিনই কোঁয়েটার পথে রওনা হয়ে গেল। সেদিন সমস্ত দিনরাত চিত্তপীড়া এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে লাগল আমার মনে। পরদিন প্রভাতে গেলুম দীনবন্ধু এণ্ডরুজের কাছে, তিনি তখন থাকেন ওয়াই-এম-সি-এতে। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, আপনার ছাত্রটি চলে গেল বুক ফুলিয়ে, কিন্তু আমিও হার মানতে রাজি নই। একখানা চিঠি দিন, আমিও আজ দুপুর বেলায় রওনা হচ্ছি। আপনার হাতের পরিচয়পত্র সঙ্গে থাক।

খাস ইংরেজ হলেন এণ্ডরুজ। কিন্তু তাঁর চিঠিই হল আমার পথের বাধা। সরল মনে কাল্‌কা স্টেশনের কর্তার হাতে দিয়েছিলুম সেই চিঠি, তিনি দিলেন পুলিসের হাতে—পুলিসের ইশারাক্রমে আমাকে কোয়েটার টিকিট বিক্রি করা হল না! কিন্তু সাধু-ফকির দুনিয়ায় তো অনেক আছে, যারা বিনাটিকিটে ভ্রমণ করে বেড়ায়! অতএব সন্ধ্যার গাড়িতে লাহোর রওনা হলাম। আম্বালায় গাড়ি বদ্‌লে অমৃতসর হয়ে যাব। আর লাহোরে একবার পৌঁছতে পারলে ভাবনা কি—জনারণ্যে হারিয়ে যাবার নানা সুবিধা আছে। তখন মধ্য জ্যৈষ্ঠর আগুন জ্বলছে সমগ্র পাঞ্জাবে। তা ছাড়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নেমে এসেছি সাত হাজার ফুট পাহাড়ের উপর থেকে। শ্বাস প্রশ্বাসের কিছু একটা ব্যতিক্রম ছিল বই কি। যাই হোক, পরদিন সকালে দেখি, লাহোর স্টেশনে উৎসুক ও উদ্বিগ্ন জনতার মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। কোয়েটাতে কেউ নাকি আর বেঁচে

নেই। কোয়েটা মেল-এ চলেছে নানা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। একটি দলের মধ্যে আমার জায়গা মিলে গেল। পরনে পায়জামা, মাথায় ক্যাপ—চোখে সানগ্লাস, এতএব কতকটা আত্মগোপনের অসুবিধা ছিল না। হাজার হাজার লোকের জনতার মধ্যে টিকিট চেক করার প্রশ্নটাও অবান্তর। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে জায়গা পেলেও উর্দু ভাষণের অপটুতা ছিল আমার বাক্যালাপে। সুতরাং 'সহস্রের মাঝে আমি একাকী। কোয়েটা মেল চলেছে মণ্টগোমেরীর দিকে। কোয়েটা পৌঁছতে লাগবে প্রায় দুদিন। ১১৬° থেকে ১১৮° ডিগ্রি গরমে আমার মত কষ্ট কেউ পাচ্ছেনা। ওরা জলের বদলে খায় চিচিঙ্গার মত এক প্রকার সবজি; মাঝে মাঝে ক্ষীরাও পাওয়া যায়। প্রায় সকলেরই সর্বাঙ্গ মুড়ি দেওয়া, পাছে গায়ে ফোস্কা ফোটে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক গরম নয়, অনেকটা অগ্নিজ্বালা।—ঘাম নেই, কেননা বাতাস শুষ্ক। ফলে, গাড়ির জানলা দরজা সকল সময়েই বন্ধ, আমরা চলন্ত বাক্সে বন্দী। সেই কালে মণ্টগোমেরীতে ছিল একদল বাঙ্গালী রাজবন্দী—লর্ড উইলিংডনের স্বেচ্ছাতন্ত্রকালে। তাদের জন্য চোখে মুখে আমার কিছু চাঞ্চল্য থাকলেও প্রকাশ করা চলবে না এখানে। সবাই এদিকে জানে, বাঙ্গালী শান্ত ভাবে হত্যা করে, হাসিমুখে মরে। বাঙ্গালী নিরীহ, কিন্তু নির্ভীক। ফাঁসীর মঞ্চে সে গান গেয়ে ওঠে।

বাহাওলয়ালপুর পৌঁছতে গেলে শতদ্রু নদী পার হতে হয়। আমরা যাচ্ছি ভীষণকায়া থর মরুভূমির ভিতর দিয়ে। বাইরে আঁধি চলেছে, শূন্য শুষ্ক ধূমেল বালুপ্রান্তরের উপর দিয়ে বইছে ঝড়ো হাওয়া। রাত্রে ঝড় নেই, কিন্তু প্রবল গুমোট, এবং সূর্যোদয়ের আগে কোমল হেমন্তকালের মত আভাস। আমরা কিন্তু বাক্সে বন্দী। বাহাওয়ালপুর রাজ্যের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। ছোট ছোট পার্বত্য অঞ্চলভরা বিস্তীর্ণ মরুলোক। জল নেই কোথাও, যদি বা পাওয়া যায় তবে সে গরম। বরফ, সোডা, লিমনেড, ঠাণ্ডা

বীয়ার, ঠাণ্ডা মদ এবং নানাবিধ নাম-না-জানা জলীয় ফল সংগ্রহ করা সহজ, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেটা ব্যয়বহুল। ১২০° ডিগ্রি গরমের মধ্যে যেতে হচ্ছে। গাড়ির বেঞ্চে বসা যায় না— আগুন। রুমালে বাতাস খাওয়া যায় না—আগুনের হলকা! এর ওপর ভিতরে প্রচণ্ড ভিড় থার্ড ক্লাসে। চোখে কাপড় চাপা দিয়ে থাকা, নচেৎ চোখ দুটো জ্বলে যায়। বাহাওয়াল রাজ্যের পর উত্তর সিন্ধুর মরুলোক। পথে পথে কিন্তু আর্তকণ্ঠ জনতার শোরগোল চলছে অবিশ্রান্ত। আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি রোহড়ীর দিকে, ততই উত্তেজিত উদ্বিগ্ন জনতার হুড়োহুড়ি লেগে যাচ্ছে। কোয়েটা শহর ও জেলার নাকি কোন অস্তিত্ব নেই। পর্বত বিদীর্ণ হয়ে সমগ্র কোয়েটা নাকি ভূগর্ভে চলে গেছে। পথ এখনও অনেক দূর। মীরপুর থেকে সোজা দক্ষিণে রোহড়ীর পথ। সিন্ধুর বালুপ্রান্তর কুপ্রসিদ্ধ সকলেই জানে। সেই যে গতকাল থেকে মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে এখনও তার বিরাম নেই। মীরপুর থেকে রোহড়ী পর্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। রোহড়ী থেকে সিন্ধুনদ পেরোলে আমরা পাব সুক্কুর। রোহড়ীর ঠিক দক্ষিণে খয়েরপুর রাজ্যের সীমানা। দক্ষিণ রেলপথগুলি গিয়েছে সিন্ধু হায়দ্রাবাদ ও করাচীর দিকে। আমাদের পথ উত্তর-পশ্চিমে। সুক্কুর থেকে জেকবাবাদ গেলে বেলুচিস্তানের সীমানা। জেকবাবাদ থেকে বোলন্ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে সোজা কোয়েটা। কোয়েটা থেকে গুলেস্তান হয়ে অবশেষে চমন—যেমন সীমান্তের লাণ্ডিখানা। রুক্ষ অনুর্বর শস্যলতা-হীন পাহাড়ের শ্রেণী কথায় কথায়। কোয়েটা থেকে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রেলপথ চলে গেছে বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়ে লোরা নদীর ধার দিয়ে চাগাই পর্বতমালার পাশ দিয়ে এবং স্যাণ্ডি মরুপর্বত অতিক্রম করে ইরানস্থিত ছোট্ট শহর জাহিদানে। এই পথ দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য সরবরাহ করা হয়। সুতরাং পশ্চিম কমাণ্ডে কোয়েটা হলো সামরিক ব্যাপারের নাভিকেন্দ্র।

শোনা গেল আজকের গরম আরও বাড়বে, এমনি একটা আবহাওয়া-সংবাদ আছে। রোহড়ী পৌঁছবার আগে জানতে পারলুম রোহড়ী থেকে জেকবাবাদ কমবেশী পঞ্চাশ মাইল ব্যবধান। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পৌঁছব। এখন মনে হচ্ছে যত অগ্নিজ্বালাই হোক, গাড়ি থেকে একবার না নামলে আর চলছে না।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। পরম্পরায় জানা গেল, কোয়েটা অঞ্চলে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে, এবং উপযুক্ত ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে যাওয়া চলবে না। সমগ্র ভারতের উদ্দেশে এইরূপ ঘোষণা করে জানানো হয়েছে। সেদিন সত্যেনের কাছে গিয়ে পৌঁছবার জন্য আমার ব্যাকুলতাটা সহজেই অনুমেয়। যদিও মার্শাল ল চলছে কোয়েটায়—তবুও এই উন্মত্ত ব্যাকুল এবং উদ্বিগ্ন জনতার তরঙ্গ রোধ করা যাবে কেমন করে? সুতরাং লাহোর এবং দিল্লীতে এই হুকুমনামা চলে গেল যে, বিশেষ ছাড়পত্র ছাড়া কোয়েটার পথ বন্ধ। সেখানে জল নেই, খাদ্য নেই এবং বসবাসের কোন সাময়িক ব্যবস্থা বর্তমানে করা সম্ভব নয়। আমাদের যাত্রাপথের মধ্যেই এই হুকুম চালু করা হয়েছিল, এবং এই হুকুমনামার ফলাফল যে কি প্রকার অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল, তার প্রকৃত চেহারাটা উপলব্ধি করলুম যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল রোহড়ীতে। শোনা গেল সাধারণ যাত্রী নিয়ে গাড়ি আর জেকবাবাদের দিকে অগ্রসর হবে না। ঘণ্টাখানেক অবধি অপেক্ষা করে গাড়ি থেকে নামতে হলো। তখনও অপরাহ্নের খরতর রৌদ্র আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ করছে। সেই প্রচণ্ড দাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকটি লোক সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। কিন্তু আমার ঝুলিটিতে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে আমি নিজেকে আবৃত করতে পারি।

সশস্ত্র পুলিস এবং পল্টনের লোক এসে প্রতি কামরা দখল করল। ভীত মনে আমি আমার দল ঘেঁষে রইলুম বটে, কিন্তু ততক্ষণে নৈরাশ্য এসেছে অনেকটা। গতকাল থেকে আহারাদির

কোন ব্যবস্থা হয় নি, এমন কি সকাল থেকে কাঁক্‌ড়ি চিবানো ছাড়া জল পর্যন্ত ছোঁয়া হয় নি। এখানে এক গ্লাস ঈষৎ ঠাণ্ডা জল আট আনা, এবং বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্ল্যাক মার্কেটে একটাকা। বরফ ছাড়া কোন তরল পদার্থ মুখে তোলবার উপায় নেই। সে যাই হোক, আমার টিকিট, ছাড়পত্র এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিচয়পত্রাদি কোনটাই সঙ্গে নেই। সশস্ত্র পুলিসকর্তা যখন এক একজনকে 'চেক আপ' করে পুনরায় গাড়িতে তুলছিলেন, তখন আমার সহযাত্রী পশ্চিম পাঞ্জাবের সেই যুবকবৃন্দ অনায়াসে আমাকে এড়িয়ে গেলেন, এবং আমি যে বাঙ্গালী সেটাও পুলিসের কর্তাকে তাঁরা জানিয়ে দিলেন। হয়তো তাঁদের মনে কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না, কিন্তু লর্ড উইলিংডনের আমলে বাঙ্গালী মাত্রই ছিল আতঙ্কের পাত্র। পুলিসের কর্তা আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করে শুধু জানলেন, আমি একজন সাংবাদিক এবং আমার পকেটে আছে সি-এফ-এণ্ডরুজের একখানি ব্যক্তিগত পত্র।

এণ্ডরুজ মানে 'এজিটেটর।' এণ্ডরুজ নাকি ইংরেজের ঘরের শত্রু বিভীষণ। আর বিভীষণ যে ধার্মিক ছিলেন তার প্রমাণ এণ্ডরুজ। আমি হাসলুম। সে হাসি সশস্ত্র পুলিসের কর্তার কাছে ভালো ঠেকল না। আমার প্রতি নির্দেশ হলো, You must take the next available train for Lahore.

তাই বলছিলুম, সেই লাহোর, আর সেই জ্যৈষ্ঠমাস। যে গাড়িতে লাহোর ফিরলুম সেই গাড়িতে ছিল অগনিত মৃতদেহ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অসংখ্য মেয়েপুরুষ। সমস্ত গাড়িতে অবিশ্রান্ত কান্নার রোল। কোন শিশুর পা নেই, কোন বৃদ্ধের সংজ্ঞা আজও ফেরে নি, কোন অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরী নারীর একখানা হাত সম্পূর্ণ কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সঙ্গে ছিল হাসপাতাল, এবং কামরায়-কামরায় ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা। সমস্ত দিনমান, সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন প্রায় মধ্যাহ্ন কালে লাহোরে পৌঁছলো সেই গাড়ি হাজার হাজার লোকের জনতার

মাঝখানে। বলা বাহুল্য, এই তুদিন ধরে মনে মনে আমার প্রবল আত্মগ্লানি জমে উঠেছিল কিন্তু কোনদিকে আর কোনও উপায় দেখতে পেলুম না। সুতরাং স্টেশন থেকে ধীরে ধীরে আমাকে এক সময় বেরিয়ে আসতে হলো। আহারাদির পর এক সময়ে ঘুরতে বেরুলুম শাহী মসজিদ আর সবজিমণ্ডির আশে-পাশে। লাহোর শহর মস্ত বড়, এবং আকর্ষণীয় বস্তুর সংখ্যা অগণ্য। ঘুরে বেড়ালুম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায় সঙ্কীর্ণ পথের এখানে ওখানে। শালিমার উদ্যান এখানে খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার নিজের কিছু ভাল লাগছিল না। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পাওয়া গেল এক শিখ ধর্মশালা। রাত কাটাবার মত ব্যবস্থা সেখানে আছে। মনে মনে বুঝি, লাহোরের ওপর খুবই অবিচার করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে আবার আমাকে লাহোরে আসতে হয়েছিল, কিন্তু সে তো পরের কথা।

যাই হোক, সে-রাত কাটিয়ে পরদিন আমি পুনরায় শিমলা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলুম। এবারের সমস্ত চেষ্টাই যে ব্যর্থ হলো এইটিই বড় কথা নয়, কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে কোয়েটায় না যাওয়ার জন্য অনুশোচনাটা চিরদিন মনে থেকে গেল।

॥ বিকানেরের পত্র ॥

পুজো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। শেষ রাত্রের দিকে এখনই গায়ে কাঁটা দেয়। পাহাড় থেকে সপ্তাহখানেক আগে ফিরেছি দিল্লীতে। কিন্তু কোন ঘাটেই দীর্ঘকাল নোঙর ফেলে রাখা আমার দু-চোখের বিষ, সুতরাং দড়িদড়া গুটিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলুম। কেবল জোয়ারের অপেক্ষা।

কিন্তু জ্যোৎস্নার দিন প্রায় শেষ হতে চলেছে, সুতরাং আর বিলম্ব নয় কোজাগরীর আগের দিন আমার পাহাড়গঞ্জের ডেরা তুলে দিয়ে পশ্চিম রাজস্থানের দিকে রওনা হলুম। বলা বাহুল্য রাতটা সত্যই রোমাঞ্চকর ছিল। দিল্লীর বিদ্যুতোদ্ভাসিত মায়ানগরীর বাইরেও একটা স্বপ্নজড়ানো জগতের হাতছানি ছিল পথে পথে। জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে থাকে যে অস্পষ্টতা, সেটা জাদু জানে —ভালো করে কিছু দেখা যায় না বলেই তার আকর্ষণ বেশী। এই জন্যই চাঁদ দেখে আমি পশ্চিমে রওনা হই।

দিল্লী থেকে যাচ্ছিলুম রেওয়াড়ী হয়ে। অনেকেই বলে, দিল্লী থেকে দশ বিশ মাইল পর্যন্ত রাজস্থানের দিকে এগিয়ে গেলেই মরুভূমির স্পর্শ পাওয়া যায়। গাছপালা দেখছি বটে, তবে রুক্ষতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি সন্দেহ কি? এ পথ আমার কাছে নতুন, আগে আসি নি। খাদ্য ও পানীয় যেখানে সহজলভ্য, উৎপাদন যেখানে অনায়াস সেখানে নিজের থেকেই জনপদ গড়ে ওঠে। সমগ্র ভারতে কেবলমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় দশ কোটির ওপর নরনারী কেবল এই কারণেই বাসা বেঁধে থাকে। বলা

বাহুল্য রাত্রের দিকে যতই এগোচ্ছি ততই অনুভব করতে পারছি একটা দিগন্তজোড়া শূন্যতা। দিল্লীর সীমানা রয়ে গেল অনেক পিছনে, আমরা ধূলিসমাকীর্ণ একটা ধূসর উষর অপরিজ্ঞাত জ্যোৎস্না বিজড়িত অস্তিত্বহীনতার দিকে অগ্রসর হয়ে চললুম। বাঙ্গালার নদীনালা, গ্রামপ্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, খালবিল ইত্যাদির উপরে যে প্রকার জ্যোৎস্নাহসিত কবিতার মত মধুযামিনী নেমে আসে, এদিকে সে চেহারা নয়। এর পথে-প্রান্তরে বালুময় রুক্ষতার উপরে যে চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত হয়, তার সঙ্গে থাকে একটা প্রেতিনী প্রভাব। সমস্ত মন যেন ছমছম করতে থাকে। অনেক দিন ধরে ভাবছিলুম এই প্রকার একটা বিশাল বিস্তৃত তৃষ্ণার রাজ্য, যেখানে পিপাসা চিরদিন অতৃপ্ত, দৃষ্টিপথের লক্ষ্য কিছু থাকবে না, যাকে বলে বস্তুহীন ব্যক্তিহীন শূন্যতা, এমন একটা নিঃসীম রুক্ষতার ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি সেদিন রাজস্থানের মরুভূমির উপর দিয়ে চলল। সেই রাত্রির ছায়াহীন জ্যোৎস্না ছিল অবিস্মরণীয়। সেটা বালুময় কিংবা গোধূলিময়—বোঝা কঠিন। আকাশ যেমনি নির্মেঘ, নীচেকার পৃথিবী তেমনি তরুলতাহীন। সৃষ্টির আদি অন্ত ছিল একাকার।

রাত্রির শেষ প্রান্ত থেকে সূর্যোদয়। মাঝখানে ভাববার কিছু নেই। কচিৎ কখনও আকাশপথে টিয়া-চন্দনার শীর্ণ কলকণ্ঠ, তারপরে সব চুপ। প্রভাতী বন্দনা নেই, নিদ্রার জড়তা নেই কোথাও —একেবারে নগ্ন তপ্ত সূর্য সামনে উঠে দাঁড়াল ধূলিধূসর অতি দরিদ্র উপবাসী ব্রাহ্মণের মত। দেখতে দেখতেই রাজস্থানের মেজাজ ঠিক আগের দিনের মতই গরম হয়ে উঠল। জ্বলে উঠল মরুভূমি দাউ দাউ করে। বিকানেরের এখনও অনেক দেরি।

কাঁটালতা আর শ্যাওড়ার ঝোপ আরম্ভ হয়েছে। বালুপ্রান্তর কোথাও কোথাও কাঁকর পাথরের জটলায় পাহাড় রচনা করেছে। বিবর্ণ বৃক্ষলতা, আদি অন্তকাল তারা উপবাসী, চেহারা ভ্রূকুটিকরাল, রসকষ কোথাও নেই। ওদের সেই ভয়াবহ তৃষ্ণা নিজের কণ্ঠে

অনুভব করে দেখছি, কতকাল ধরে প্রবল পিপাসায় আমারও যাচ্ছে বুক ফেটে, বিন্দুমাত্র সান্ত্বনার চিহ্ন দেখছি নে কোথাও। যদিও অক্টোবর মাস, তবু চোখ জ্বলছে, রৌদ্রের প্রখরতা পলকে পলকে বেড়ে চলেছে। গাড়ির ভিতরটা ভরে গেছে ধুলোয়, ধুলোয় ভরা সর্বাঙ্গ, ধূল্যবলুণ্ঠিত রাজস্থান।

রতনগড়ে এসে গাড়ি থামল। স্টেশনের নামে যদি বা কিছু বৈচিত্র্য থাকে, বিষয়ের বৈচিত্র্য কম। রাজস্থান যখন ছিল রাজোয়ারা, তখন পথে পথে রাজা মহারাজা খুঁজে পাওয়া যেত। মরুভূমির মাঝখানে হঠাৎ কোথাও উঠেছে দুর্গ, সেখানকার ভূস্বামী যিনি তিনিই নরপতি। এখন আছে শুধু নাম, কোথাও কোথাও বা রাজকীয়তার শেষ চিহ্ন, কিন্তু রাজদণ্ড হাত থেকে খসে গেছে। এই রতনগড় তাদেরই একটি অবশেষ। শহরটি ক্ষুদ্র নয়, বহু ধনাঢ্য মারোয়াড়ীর মুলুক, কিন্তু রাজস্থানের অন্যান্য অংশের মত নিত্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত। খাদ্য যা মেলে তা অনেকের কাছে ভোজ্য নয়। স্নান ও পানীয়ের জল পাওয়া অনেকটা কষ্টসাধ্য। আমার বিশ্বাস বিহারী ও রাজস্থানীরা যে পরিমাণ ধূলি রুক্ষতা সইতে পারে, এমন আর কোন প্রদেশের লোক নয়।

রতনগড় ছেড়ে আবার গাড়ি চলল বিকানেরের দিকে। বিদেশকে বিদেশ বলে মনে করি নে, কেননা আমার মন সর্ব ভারতীয়। ওদের পিপাসার সঙ্গে আমার মন অহেতুক মেলানো, ওদের দুঃখ সুখের সঙ্গে আমি জড়িত। কিন্তু সুখের চিহ্ন এদিকে কোথাও দেখি নে। মধ্যবিত্ত মানুষ বিশেষ কোথাও দেখছি নে। রাজার পরেই একেবারে রাখাল, মাঝামাঝি কিছু নেই। মারোয়াড়ীরা ধনী এইটি জেনে এসেছি, তাদের ঘরে এসে দেখি তাদের চেয়ে দরিদ্র এবং হতভাগ্য ভূ-ভারতে নেই। দেশে জল নেই, মানেই, জীবন নেই। তৃণলতাচ্ছন্ন শ্যামল ক্ষেত্র ওদের কাছে স্বপ্নবৎ, এবং সেই কারণে নিজের ঘর ওদের কাছে বিষবৎ। শান্তি ওরা পায় না এ

জীবনে। ঘরে অন্ন নেই, তাই ওরা ছড়িয়ে পড়ে দেশে-দেশান্তরে। বালু সমাচ্ছন্ন ভূভাগ নিয়ে ওরা বাঁচবার উপকরণ খুঁজে পায় না, তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের প্রধান সম্বল। ব্যবসার জন্য ওরা মান খোয়ায় বহু দেশে, কিন্তু মুখ বুজে সেখানে মার খায়। একথা বেশ জানে, ঘরে চলে গেলে তাদের অন্ন জুটবে না। ওরা ধনশালী হয়ে ওঠে প্রাণের দায়ে, কেন না কোনদিন ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠবার সুবিধা ওদের হাতে নেই। ওরা জলের দেশের মানুষ নয়, তাই 'জলসত্র' দেয় দেশে দেশে। পিঁপড়ের গর্তে চিনি দেয়, কারণ সমগ্র জীবনে ওদের মাধুর্য কোথাও নেই। মরুভূমির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ওদের বংশ পরম্পরা জ্বলে পুড়ে মরে, সেই আতঙ্কের উপলব্ধি থেকে ওরা ধর্মশালা বানায় ভারতের যেখানে সেখানে। মারোয়াড়ী যখন অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে লোটা হাতে গামছা বিক্রি করে, তখন তাদের মনোভাব হল "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!" রাজসাহী আর রংপুর, করাচী আর কলকাতা, কন্যা-কুমারিকা আর কাশ্মীর—মারোয়াড়ীর ইতিহাস সর্বত্র এই।

নিন্দে করছি নে, কিন্তু দেখছি ওদের প্রাণপণ অধ্যবসায়। সমস্ত ভারতে দেখেছি ওরা পথে শুয়ে কাটায়, আশ্রয় নেয় সভ্য সমাজের আঁস্তাকুড়ে, ছোট্ট দোকান বানায় সব চেয়ে নোংরা বস্তির আনাচে কানাচে। একটি আধলা-পয়সা ওদের কাছে মা-বাপ। ক্ষত বিক্ষত পায়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, খর রৌদ্রের কালে গাছের তলায় পড়ে কপালের ঘাম মোছে, চানা আর মকাই খেয়ে কাটায় মাসের পর মাস। তারপর একদা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। তখন প্রেয়সীর কপাল থেকে ঝোলে রুপোর ঝুমকো, চুমকির কাজ-করা ওড়না ওঠে গায়ে, হাতের তালুতে মেহেদির রং এবং পায়ে ওঠে আঙ্গট। সেদিন থেকে সে লালাজীর বউ।

নিন্দে করছি নে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কী কঠিন আত্মনিগ্রহ আর রক্তক্ষরণের পর ওরা আর্থিক উন্নতির মুখ দেখতে পায়।

বিকানেরে এসে পৌঁছলুম আন্দাজ বেলা দশটা। এমন করে মরুভূমি আমার দেখা হয় নি, যেমন বিকানেরে। সমস্ত শহর বালুর ওপর দাঁড়িয়ে। তিনশো মাইলের মধ্যে কোথাও জলাশয়ের চিহ্ন দেখে আসি নি। যদি কখনও বৃষ্টি পড়ে তবে সেই জল বালু চুঁইয়ে নিয়ে এসে ওরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা পায় একটি বাঁধানো পুকুরে। বছরের প্রায় সমস্ত সময়টাই সেই পুষ্করিণী থাকে শূন্য। সকাল থেকে পথে-পথে তেমন কয়েকটি জলাধার দেখে এসেছি।

স্টেশনের কাছাকাছি একটি কাঁচের কারখানা দেখে শহরে প্রবেশ করলুম। উটের সারি চলেছে চামড়ায় বেঁধে জল বিক্রি করতে। জল বেচে আসে ওরা গাঁয়ে গাঁয়ে, ওটা একটা চালু ব্যবসায়। তিনটে মস্ত কূপ বানানো আছে বিকানেরের এখানে ওখানে, তাদের থেকে জল নিয়ে সর্বত্র পাইপ যোগে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু রাজ্যের জনসাধারণের কণ্ঠে পিপাসা লেগে থাকে নিত্য। তারা সুবিধা মত জল কেনে, এবং অসময়ের পুঁজি স্বরূপ আপন ঘরের নীচে ভূগর্ভে সেই জল সযত্নে সঞ্চিত করে রাখে। লোহার সিন্ধুকে যেমন সোনার অলঙ্কার।

সমগ্র বিকানের শহর উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত। শুধু এই ধারণা নিয়ে থাক যে, এক রাজ্য আরেক রাজ্যকে শত্রু মনে করে এসেছে চিরকাল। বিশ্বাস করে নি একজন অপরকে। পাঠান আর মোগল যুগের কথা ভুলি নি। কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিরোধের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত কম—যেমন স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চিহ্ন ব্যাপক। শহর মানেই দুর্গ। দুর্গকে কেন্দ্র করেই শহর। জনসাধারণের কথা রাজস্থানে ওঠে নি কোনদিন। তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে শাসকদের কোনকালে সম্পর্ক ছিল না। তাদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের কথা কখনও রাজতক্তের কাছাকাছি পৌঁছয় নি। তারা এতকাল ধরে কেবল দুটি কাজ করে এসেছে। রাজকোষে অর্থ যুগিয়েছে, এবং রাজায়-রাজায় যুদ্ধের কালে উলুখড়ের মত

প্রাণ দিয়ে এসেছে। দেশবাসীর চিত্তলোক থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য আসতো না বলেই একালে তাদের ঘরের মত সমগ্র রাজোয়ারা ভেঙ্গে পড়েছে।

আশ্চর্য, এই মরুনগরীতে কোন পূর্ত সমস্যা নেই। নালা নর্দমা বলে কোন পদার্থ দেখি নি। জল যেটুকু আসে ঘরের থেকে বাইরে, সেটুকু শুকিয়ে যাবার আগে পথের কুকুরে চেটে নেয়! সমগ্র নগরী রঙে আর গন্ধে ভরা। পুরুষের পোশাকে নানা রং মেলানো, মেয়েদের রঙ্গীন জরির ঘাগরা। চুয়া-চন্দন-আতর মাখা পানওয়ালা আর হোটেলওয়ালা—পাশ দিয়ে কেউ গেলে সুগন্ধ তেলের আভাস পাই। পান আর পানীয়ের বিলাস সর্বত্র। সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ে যারা ফুরফুরে। কোট-গেট বাজারটি হলো শহরের নাভিকেন্দ্র, ওখানেই আশে-পাশে সবজিমণ্ডি। নিতান্ত আবশ্যিক আনাজ-তরকারি, পেঁয়াজটা আলুটা লঙ্কাটা—আর তার সঙ্গে কুলফা শাক। কাঁকড়ি আর কুমড়ো—এ দুটো প্রায় সর্বভারতীয়, তার সঙ্গে আলু। মাছের দাম বেশী, মাংস সহজলভ্য। অন্যান্য খাদ্য অল্প দরেই মেলে।

বাজারের দিক ছেড়ে জুনাগড় প্রাসাদের পথটা ঘুরলে তবে চেনা যায় বিকানেরকে। বৃটিশ ভারত বলে এককালে যেটা পরিচিত ছিল, সে-অংশটার সঙ্গে দেশীয় ভারতের চেহারার মিল কম। দেশীয় ভারতে ভারতীয় ছাঁচ বেশী। ইন্দোরে, গোয়ালীয়রে, ভূপালে, ভরতপুরে, আলোয়ারে—একথা সত্য। জয়পুরে গেলে আরও সত্য। উদয়পুরেও তাই। যোধপুরে গিয়ে দাঁড়ালে আনন্দে মন নেচে ওঠে। চোখে পড়ে প্রকৃত হিন্দু স্থাপত্য, যার সঙ্গে মোগলের ছোঁয়াচ কম। এঁদের ছাঁচ মন্দিরের, ওদের ছাঁচ মিনারের। শ্বেত আর রক্তিম পাথরের কাজ অজস্র। বস্তুত লালপাথরের স্থাপত্যে রাজস্থান পরিপূর্ণ! বোধ করি ভারতের আর কোথাও বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রতি এমন মমত্ববোধ দেখতে পাওয়া যায় না। মরুভূমির বিবর্ণতা দেখে সারাজীবন ওদের চোখ ঝলসাতে থাকে বলেই বর্ণ বৈচিত্র্যের এমন মোহ।

বিকানেরের দুর্গ, যেটাকে আগে বলেছি জুনাগড়—সেটা রাণামহল। স্বর্গত গঙ্গাসিংয়ের বৃদ্ধা স্ত্রী এখনও জীবিত। তাঁর পুত্র শার্দূল সিংও লোকান্তরিত। এখন আছেন মহারাজা করণ সিং। তিনি এখন পান প্রিভিপার্স। বিকানেরের কাছাকাছি লালগড় প্রাসাদে তাঁর বর্তমান বাসা। স্বর্গত গঙ্গাসিংয়ের অপর প্রাসাদটির নাম হলো 'গজনের'—সেটি কুড়ি মাইল দূরে এক সরোবরের তীরে অবস্থিত। এককালে যেটি ছিল রাজ সেরেস্তা, সেটি এখন ভারত গভর্নমেণ্টের অধিকারে। বাঙ্গালা জমিদারী দপ্তরের চেয়ে সেটি বিশেষ বড় নয়। সেখানকার কর্তা হলেন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কমিশনার, এবং শাসক হলেন প্রধানত ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস। রাজা নিজস্ব দেহরক্ষী পাবেন, তবে তারা অস্ত্র ব্যবহার করবে না—এই হলো চুক্তি। এসব ব্যাপারে পরলোকগত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মরণীয়। ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল মহাশয় বহির্বিভাগীয় এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। আমি নিজে যথেচ্ছ ভ্রমণ করব, এবং যে কোনও প্রকার সরকারী কর্মসংস্থা পর্যবেক্ষণ করব, এই মর্মে আমার কাছে কিছু সরকারী চিঠিপত্র ছিল, সুতরাং দীর্ঘকায় ডি-আই-জি মহাশয় আমাকে ভারত-পাকিস্তান সীমানা রায়সিং নগরে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের নিকট আমার বিন্দুমাত্র বাধ্যবাধকতা ছিল না বলেই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ সেদিনকার মত স্থগিত রাখলুম।

রায়সিং নগর এখান থেকে উত্তর পথে, পাকিস্থান পাঞ্জাবের দক্ষিণপূর্বে। বহু সহস্র বর্গমাইলব্যাপী মরুভূমি চারিদিকে, তারই মাঝখান দিয়ে রেলপথ চলে গেছে রাজস্থানের উত্তর সীমানায়। এগুলো মোটামুটি পুলিস ঘাঁটি। বিস্ময়ের কথা এই, এ অঞ্চলের নরনারী পাকিস্তানীদের বিশ্বাস করে না। রাজস্থানের পুলিস বিভাগ ছিল হিন্দুমুসলমান মিলিয়ে। তাদের একটা অংশ গেছে পাকিস্তানে। তারা আছে বাহ্বালপুরে আর খয়েরপুরে, এবং অন্যান্য পাঞ্জাব

স্টেটে। তারা নাকি মরুভূমির পথ ধরে এদিকে এসে নানা উৎপাত করে, এবং সংঘর্ষ বাধায়। মোটামুটি যে বিবরণটি পেলুম সেটি বড় দুঃখদায়ক। ডি-আই-জি মহাশয় নানাবিধ আলাপ করে বিদায় নিলেন।

আজকের বিকানের যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ। এমন নিরিবিলি নগর সহসা চোখে পড়ে না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ঘাঁটি রয়েছে এক পাশে, তাদের বিনয়নম্র ভাবটি বড় মিষ্ট। কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দম্ভের পরিচয় নেই আলাপ আলোচনায়। যদিও জনসাধারণের সঙ্গে নিত্য মেলামেশার সুযোগ তারা পায় না—কিন্তু তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে তারা জড়িত। সাহায্যের জন্য গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। খোঁজ খবর চাইলে সানন্দে এগিয়ে আসে। ঠিক এমনটি দেখেছিলুম কাশ্মীরে। মিলিটারী বললে যে মেজাজটা আমাদের চোখে ভাসে, সেটার ছাঁদ গেছে বদলে। দু-শো বছর ধরে আমরা মিলিটারীকে জেনে এসেছি 'অকুপেশন ফোর্স'—আজকে জানছি তারা জাতির রক্ষক। জাতির কল্যাণে তারা উৎফুল্ল, জাতির গৌরবে তারা গৌরবান্বিত।

রাজপুত যখন হিমাচলে গিয়েছে তখন তাঁরা শাক্ত। সেখানে তাঁরা শক্তি-রূপিণীর আরাধনা করে। মন্দিরে-মন্দিরে মহিষমর্দিনী চণ্ডী, কিংবা কালিকা; সিঁদুর মেখেছে কপালে, তারপর অম্বিকা-দেবীর পুজায় বসেছে। পাঞ্জাবের অনেকটা অংশ রাজপুত, যেটাকে বলে হিন্দু পাঞ্জাব। শিখরা কোন মন্দিরের প্রতি বিরূপ নয়। তারা শত্রুদলনীকে বোঝে, শক্তিকে জানে। মনে মনে তারা কালীভক্ত। এখানে এই রাজপুতানায় যেখানে জৈনমন্দির, ঠিক তার পাশেই উঠেছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। মহাবীরের পাশেই শ্রীবিষ্ণু, এবং তার পাশে গণেশ আর হনুমানজী। মহাবীর হলো হিন্দুদর্শনের একটা মতবাদ, যেমন মতবাদ গৌতমের, নানকের, কবিরের, রামানুজের। এদের মতবাদ বিশেষ কালের, বিশেষ আবহাওয়ার,

এদেরই ধারাবাহিক পরিণতি হলো গান্ধীর মধ্যে। দর্শনের একই মহীরুহ, কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ হলো তার শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে গান্ধীবাদকে কেউ হিন্দুদর্শনের ব্যতিক্রম বলে ভুল করবে না। গান্ধী-দর্শন হলো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই অঙ্গ।

রাজপুতানায় বোধ হয় দুই ভাগ হয়েছে একই বস্তুর। একটি হলো শৈব-জৈন মেলানো, অন্যটি শক্তি। কল্যাণের সঙ্গে বীর্য। মারোয়াড়ীরা জৈন, রাজপুত হলো শাক্ত। একদিকে শ্বেতাম্বরী-দিগম্বরী মতবাদ, অন্যদিকে চিতোরের মহাকালী। এরা শক্তিকে ভজনা করে হনুমানের মধ্যে, ওরা ভজনা করে চণ্ডীকে। এরা চায় শক্রনিধন।

পথে পথে ঘুরেছিলুম। ঠিক বলা কঠিন, লক্ষ্যটা কি। নগরের প্রান্ত-প্রাকার সংলগ্ন একটি সুসজ্জিত উদ্যান—তার দাম অনেক। সে অঞ্চলটি গাছপালা ছাওয়া, নরম মাটির ওপর গজিয়েছে সুন্দর তৃণদল। সে যেন মুক্তি। গাছে গাছে তার অপরাহ্নের পাখির জটলা। ওরা মুখ বুজে পার হয়ে আসে দিগন্ত জোড়া মরুভূমি—কিন্তু এই ক্ষুদ্র বনময় উদ্যানে এসে মধুর কাকলি শুরু করে। নগর প্রাকারের ঠিক নীচে থেকেই মরুসমুদ্র শুরু। বেলা শেষের সূর্য নেমে যাচ্ছে দিগন্তে, সেও ধূলিধূসর অস্পষ্ট সূর্য। তার ঠিক নীচে শান্ত পদক্ষেপে চলেছে সারিবদ্ধ উটের ক্যারাভান—তাদের গলার মৃদুমধুর ঘণ্টা-রব এতদূর উঁচুতে এসে পৌঁছয় না। সমস্তটা মিলিয়ে বিশ্বনিয়ন্তার যেন অসীম ক্লান্তির আভাস পাই। শূন্য রাজস্থান চারদিকে কেবল ধুধু করছিল।

প্রাকারের উপর উঠে দাঁড়ালে বিকানেরের সমস্ত চেহারা চোখে পড়ে। পুরনো বিকানেরের সম্প্রতি দুটি অঞ্চলের যোগ ঘটেছে। একটির নাম বিন্ধ্যসার, অন্যটির নাম গঙ্গাসার। নাম দুটি অপভ্রংশ হতে পারে। হয়তো বিন্ধ্যসায়র কিংবা বিন্ধ্যাশহর; গঙ্গাসায়র কিংবা গঙ্গাশহর—এমনি কিছু হবে। তাদের আপন আপন পল্লী

হলো নতুন। সমগ্র ভারতে গ্রামীয় জীবনকে ভেঙ্গে যে নাগরিক জীবন সৃষ্টির ঢেউ উঠেছে, তার ধাক্কা মরুভূমিতেও লাগবে বই কি। কিন্তু আমার একটি সন্দেহের কথা এখানে বলি। ভারতের কোন অঞ্চলে জলাশয়ের তীর ছাড়া কোন শহর এ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। এমন কি পাহাড়-পর্বতেও নয়। এই রাজপুতানায় একদিন সমুদ্র ছিল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণাংশের নাম জম্বু-দ্বীপ, এ তথ্য আমরা পাই ভূতত্ত্বের ইতিহাসে। পরবর্তী কালে পাঞ্জাবের অনেক নদ-নদী যেমন শুকিয়ে গেছে, তেমনি শুকিয়ে গেছে রাজস্থানের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী। সেই নদীর চিহ্ন আজও রয়েছে রাজোয়ারার পথে-পথে। রয়েছে পাথরের মোলায়েম নুড়িতে, রয়েছে শামুকে, রয়েছে আজও নানাস্থানে জলের আঘাতের নানা দাগ। এ চিহ্ন দেখে গেছি বিকানেরে, যোধপুরে, ফালোদিতে, পোকারনে এবং জয়শলমেরের বালুতে বালুতে। সমুদ্রের লোনা আজও অব্যাহত রয়েছে বিকানেরের বালুভূমের নীচেকার জলে—যেমন লোনা আছে পশ্চিম আফ্রিকার সাহারায়, উত্তর চীনের গোবি মরুভূমিতে। বিকানের অঞ্চলের দৃষদ্বতী নদীর ধারাপথটি এতই সুস্পষ্ট যে, একথা ভাবতে কষ্ট হয় না একদা এই নদীতীরেই এই সমস্ত সুন্দর শহর গড়ে উঠেছিল।

আজ সমস্ত রাজস্থান—বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল—জলের অভাবে হাহাকার করছে। আগামী হাজার বছরের মধ্যে পশ্চিম রাজস্থানে অরণ্য সৃষ্টি আর সম্ভব নয়। বিপাশা শতদ্রু চন্দ্রভাগা ইত্যাদি নদীর জল ও পলি রাজস্থানে প্রবাহিত করা সম্ভব হতো কি না বলা কঠিন, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সে আলোচনা আর ওঠে না। এখন উপায় রইল খাল খনন, অথবা ভূগর্ভস্থ জল। কিন্তু কে করছে সেই অসাধ্য সাধনের কাজ? কোথায় সেই ভগীরথ?

এখানে দুচার ছত্র বাঙ্গালীর আলোচনা করে এই চিঠি শেষ করি। ডি-আই-জীর-অফিসে আলাপকালে মালদহের একটি বাঙ্গালী

তরুণ আমার অবাঙ্গালী পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসে আলাপ করে। পরে বিকানের মহারাজার কলেজের বাঙ্গালী অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে আমন্ত্রণ করে পাঠান। কিন্তু আমার সময় ছিল কম, সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি নি। জানতে পেরেছিলুম, শ-দেড়েক সংখ্যক বাঙ্গালী আছেন বিকানেরে, তাঁরা অনেকেই শিক্ষা ও সরকারী বিভাগে কাজ করেন। অনেকগুলি ছেলে বিড়লা-প্রবর্তিত পিলানীতে কারিগরি বিদ্যা শেখে এবং এতদঞ্চলেই থাকে। কেউ কেউ বা আছে রেলওয়েতে। অনেকের পাঁচপুরুষ কেটে যাচ্ছে রাজস্থানে।

অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে এল। বালু ও ধূলার হাওয়া এল কমে। বিশাল প্রাকারের প্রান্তে মহাবীরের শ্বেতমর্ম্মর মন্দিরে বেজে উঠল সন্ধ্যারতির ঘণ্টা। তারই আওয়াজে থেমে এল উদ্যানের পাখির কণ্ঠ-কাকলী।

আমারও এবার যাবার সময় হলো।—

॥ বানাস নদী পেরিয়ে ॥

রাজস্থানের উপরে হেমন্তকাল নেমে এসেছিল।—

ফুলাদ পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার এসে পড়েছিলুম আরাবল্লির ঘন শাখা-প্রশাখার মধ্যে—তার শিরা-উপশিরার জটিলতায় জড়িয়ে গেছি। আরাবল্লির রুক্ষতা এবং বালুপাথরের শুষ্কতার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে। তার হাড়পাঁজরার মধ্যে রস নেই কোথাও। বন্য গুল্ম, শ্রীহীন শষ্পদল, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপঝাড়, বড় জোর দু-চারটি বাবলা, না হয় তো মামুলী বৃক্ষ গোটাকতক—এর বাইরে কোথাও তার শ্যামলতা নেই। মাঝে মাঝে আরাবল্লিব দিকে চেয়ে তার পিঙ্গল রুক্ষ জটাজালের তলায় ভীষণ রুদ্রাক্ষর প্রতি চেয়ে থেকেছি। মনে হয়েছে বিশাল ভাবতের দেহগঠনের পক্ষে আরাবল্লি এবং বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর হয়তো প্রয়োজনও ছিল। এবা হয়তো বা ভারতের পঞ্জরাস্থির মত তার দেহাভ্যন্তরে আবহমান কাল ধরে কাজ করে এসেছে। প্রথম বাঁধন হিমালয়, দ্বিতীয় বাঁধন এই দুই গিরিশ্রেণী, তৃতীয় বাঁধন দক্ষিণ সাতপুরা—এবং দক্ষিণ ভারতের দুই পারে পূর্ব ও পশ্চিমঘাট। এই ভৌগোলিক স্থিতি-স্থাপকতা হয়তো বা যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতকে সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এসেছে।

ঘন নিবিড় আরাবল্লি চারিদিকে! কোথাও অন্তহীন গিরিখাদ, তলায় তলায় চলেছে শীর্ণ জলধারা। কোথাও নিবিড় বনভূমির ভূমিকা চোখে পড়ছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে কোথাও কোথাও পুল পার হতে হচ্ছে। পথ নিচের থেকে কখনও উঠছে উঁচুতে, বাঁক নিচ্ছে কথায় কথায়। পাহাড়ের তলার দিকে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গলোকের

অন্ধকারে চলে যাচ্ছি 'গোরামঘাট' ছাড়িয়ে—পথ যেন হারিয়ে গেছে আরাবল্লির জটিল চক্রান্তের মধ্যে। এ যেন একটা রাজনীতিক ষড়যন্ত্র। একবার ভিতরে প্রবেশ করলে একটির পর একটি গ্রন্থি, অবশেষে রুদ্ধশ্বাস! যখন সেই জটিল জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার পথ পাওয়া যায় তখন যেন স্বস্তির আশ্বাস! মুক্তিলাভের পর নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচা!

সন্ধ্যাসমাগমকালে গিরিশ্রেণীর ভিতর থেকে বেরিয়ে 'খাম্বলী' নামক জনপদ ছাড়িয়ে 'দেওগড় মদারিয়ার' দিকে এলুম। পিছন-পথে পড়ে রইল থমথমে ছায়াচ্ছন্ন আরাবল্লির গিরিদল আশ্রমবাসী একদল নাঙ্গা সন্ন্যাসীর মত। চোখ জুড়িয়ে গেল সমতল মাঠের দিকে চেয়ে। ছোট ছোট মন্দির ছড়ান রয়েছে এখানে ওখানে। একটি শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছিলুম দূর থেকে।

নাথদ্বার স্টেশনটি অন্ধকার। ঠিক অন্ধকার বললে ভুল হবে। অতি টিমটিমে তেলের আলো জ্বলছে। তাতে অন্ধকার বেড়েছে, কমে নি। সরকারপক্ষ যথাসময়ে তেল সরবরাহ করেন, কিন্তু সেই তেলের সমস্তটা যথাসময়ে এবং যথাস্থানে খরচ হয় কিনা—এ নিয়ে তর্ক আছে। এককালে পুরনো দিল্লীর গন্ধনালার দিকে, লক্ষ্ণৌয়ের মকবুলগঞ্জের আশেপাশে, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, গয়া প্রভৃতির পথেঘাটে শুক্লসপ্তমী থেকে পূর্ণিমা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী পর্যন্ত আলোই একপ্রকার জ্বালা হত না—কেননা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ চন্দ্রালোকটি তাঁদের কাজে লাগাতেন। কিন্তু সেদিন তেলটুকু কোন পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে খরচ হত সেই অপ্রিয় আলোচনা এখানে না করলেও চলবে! এককালে কাশী বা গয়ার পথ সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ধুধু করত—গান গেয়ে গলার আওয়াজ করে পথ পেরিয়ে যেতে হত। আজ দিল্লীর কেরলবাগ থেকে 'সরাই রোহিল্লার' দিকে শত শত শাখাপথ বেরিয়েছে। হাজার হাজার বাড়িঘর এবং হাজার হাজার পরিবার জনপরিকীর্ণ

এবং স্বচ্ছালোকিত সেই পথগুলিতে বসে গেছে। কিন্তু মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও ওখানকার দুটি দিকের বিশাল শ্মশান-প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে সন্ধ্যার পরে আনাগোনায় গা ছমছম করত। আজ দিল্লী মহানগরীর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। স্বাধীনতালাভের পর রাজধানী যেন ঝলমল করে উঠেছে।

নাথদ্বারের নীল আকাশে নবমীর জ্যোৎস্না দপদপ করছিল। আশেপাশে শুষ্ক বনশোভার উপরে সেই জ্যোৎস্না কাব্যময় হয়ে উঠেছিল। দিনের বেলাকার বাস্তব রাত্রির চন্দ্রালোকে যেমন অবাস্তব হয়ে ওঠে! স্টেশন থেকে শহর সাত মাইলের কিছু বেশি। পথ যথারীতি জনশূন্য। নগরপ্রবেশের একটি বহির্দ্বার রয়েছে— অনেকটা তোরণের মত।

সেদিন নাথদ্বারের গুজরাটি ধর্মশালার দোতলায় একটি ঘর দখল করেছিলুম। ক্ষুদ্র শহরটি একটি অনুচ্চ টিলাপাহাড়ের ধারে অবস্থিত। শহরের আশেপাশে পাহাড়ের বড় বড় দেওয়াল— তাদের গায়ে গায়ে বাড়িগুলি মোটামুটি শ্বেতবর্ণ। উটের পিঠে চড়িয়ে দূরদূরান্তর থেকে পণ্যবিপণির সম্ভার আনা হয়—যেমন বিকানেরে অথবা রতনগড়ে। মোটর লরীর আমলেও উষ্ট্রবাহনের মূল্য কমে নি। অনেক সময় মরুভূমি পেরিয়ে মাল আমদানি-রপ্তানি করতে হয়—গাড়ির চাকা সেই বালুতে ঘুরতে চায় না। আজও উটের পিঠে জল, ঘাস, গম, পাথরখণ্ড, সবজি এবং নানাবিধ সামগ্রী এখানে ওখানে গিয়ে পৌঁছয়। উট পাওয়া না গেলে ভারতের বহু দুর্গ—বিশেষ করে আগ্রা দিল্লী যোধপুর বিকানের উদয়পুর জয়শলমের অম্বর চিতোর গোয়ালীয়র ইত্যাদির দুর্গগুলি সগৌরবে দাঁড়িয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। সমতলে গাধা, পাহাড়ে ঘোড়া এবং মরুরুক্ষতায় উট—ভারতীয় স্থাপত্যে এদের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশী।

নাথদ্বারের বাজারটি বড়। এক একটি গদি বৃহদাকার। কিন্তু

দ্রব্যসম্ভার মামুলী। কলকাতা বা দিল্লীর চাঁদনিচকের সঙ্গে নাথদ্বারের বাজারের তফাত কম। তফাত শুধু আহার্য-বস্তুতে এবং কতকটা পোশাকে। জুতোর দোকানে দাঁড়িয়ে চামড়াগুলির কাঠিন্য দেখলে ভয় করে। কিন্তু শুনেছি মারোয়াড়ীদের পায়ে নাকি ফোস্কা পড়ে না। বাদামী হালুয়ার দোকানে খাদ্যসামগ্রীগুলি অপরিচিত—বালুসাই ছাড়া। রাজকোট, গুজরাট, আহমেদাবাদ ও প্রভাসতীর্থের পথ মনে পড়ছে। সেখানে বাঙ্গালী-রসনা চরম দুঃখ ভোগ করে। সমগ্র ভারতে কেবল একটি সামগ্রী শুধু সর্বব্যাপী—সেটি দুগ্ধ। দুগ্ধবতীরা এদেশে তাই পূজ্য। নারীকে আমরা বলি দেবী, গাভীকে বলি ভগবতী। পুরুষ হয়েছে পুরুষোত্তম, এবং ধর্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছে নন্দী। দুগ্ধজাত সকল সামগ্রী ভারতের এদেশে সকল সম্প্রদায়েরই ভোজ্য। দই প্যাঁড়া মালাই রাবড়ির অভাব নেই।

নাথদ্বার শহরটি মন্দিরকেন্দ্রিক। সেটি নাথজীর মন্দির। সুখের কথা এই, মন্দিরটি দরিদ্র নয়। ভিতরে যেটি বিগ্রহ, সেইটি নাথজী। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি, কিন্তু শ্রীরাধা পাশে নেই। থাকার কথাও নয়—কেননা শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়স। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকটা যেন নাচনের ভঙ্গীতে—বাঁ হাতখানা উঁচুতে তোলা—বর্ণ কৃষ্ণশ্যাম। বিগ্রহটির নাম 'বালগোপাল রণছোড়নাথজী।'

মন্দিরটি তার চত্বরসমেত মস্ত বড়। এমন ধনবান ব্যক্তি পরিবৃত মন্দির রাজস্থানে কম। অর্থোপার্জনের এমন একটি কেন্দ্র আমার দেখতে বাকি ছিল। চারিদিকে অর্থলোভী পাণ্ডার দল, এবং বহু বিত্তশালী দর্শনার্থীদের আত্মাভিমান—এই দুই মিলিয়ে নাথজীর মন্দির হয়ে উঠেছে যেন স্টক একস্‌চেঞ্জের হলের হট্টগোল! স্তব দেখছি নে কোথাও, দেখছি স্তাবকতা! প্রার্থনা দেখছি নে, দেখছি চাটুবাক্য! ফুল নৈবেদ্য পড়ছে না ঠাকুরের সামনে, পড়ছে অহঙ্কারের এক একটি টুকরোর মত টাকা-পয়সা! প্রণামী দিচ্ছে

না কেউ, ঠুন্ করে ছুড়ছে যেন দয়ার দান! সেই আত্মাভিমানীদের দিকে তাকিয়ে রণছোড়নাথজী সকৌতুকে নাচতে চাইছেন!

হঠাৎ মন্দিরের সামনে যবনিকাপাত ঘটে। দর্শনকালটি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিরূপিত। কয়েক মিনিটের দর্শন, তারপরেই পর্দা নেমে গেল। আবার পর্দা উঠবে হয় তো ঘণ্টা-দেড়েক পরে। দিনে রাত্রে এমন অনেকবার। এই বিরতিকালগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে আবার দর্শনার্থীর ভিড় বেড়ে যায়, এবং ইতিমধ্যে অন্য কাজও সেরে আসা চলে। মারোয়াড়ী মহিলারা তাঁদের রেশমী পোশাক দ্বিতীয়বার বদলে আসবার সময় পান। শুধু তাই নয়, আগেকার দরুন দর্শনীর টাকা-পয়সাগুলি অলক্ষ্যে কুড়িয়ে নেবারও একটি সুযোগ মেলে। এ নিয়ম শুধু নাথদ্বারেই নয়, জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরেও এই। এই ব্যবস্থাপনাটি ভাল কিংবা মন্দ, সেটি আমার বিচার্য নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি আগাগোড়াই যুক্তিবাদীদের কাছে নিতান্তই বিরক্তিকর

আমি দর্শনার্থী নই, পর্যবেক্ষক। সুন্দর একটি মন্দিরের ভিতর-বাহির আমাকে আকর্ষণ করে এই মাত্র। বিগ্রহপূজার ডাক আমার মধ্যে নেই, আমার ডাক অন্যত্র। একদা এই রাজস্থানে বানাস নদীর ওপারে দূর বনপথের মধ্যে যে সত্যনারায়ণ মন্দিরটি দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটি তার বিগ্রহের জন্য নয়! আমাকে নদী সমুদ্র অরণ্য পর্বত ডাকে, ডাকে প্রাকৃতিক ভীষণতা, ডাকে হিমালয়ের বিজনতা কিন্তু বিগ্রহ আমাকে ডাকে না! আমি ভক্তি ভাসমান নই।

বালুপাথরের পথ মাড়িয়ে যাচ্ছিলুম 'কান্‌ক্রোলির' দিকে। যেমন হয় রাজস্থানে—সন্ধ্যার পর থেকে সকাল অবধি বেশ ঠাণ্ডা, শীতের রাত্রে কাঁপিয়ে দেয় অনেক সময়—আবার দিনের বেলায় উত্তাপ প্রখর হয়ে ওঠে। এখন এগারোটা বাজে নি, রৌদ্র ধুধু করে

উঠেছে ধূলিধূসর মাঠে মাঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লুম 'বানাস' নদীর ধারে। বানাস! একবার চেয়ে দেখলুম নদীর তুই দিকে। এ নদী বন্য, স্তিমিত—এর গভীরতা নেই। বালু ও প্রস্তর খণ্ডে আকীর্ণ এর দুই পার। এই নদীর সঙ্গে রয়ে গেছে আমার তরুণ বয়সের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। এপার ওপার করেছি অনেকবার। এর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ছিল বইকি এককালে! আজ আবার দাঁড়িয়ে দেখছি এর উপরে এখনও সাঁকো নির্মিত হয় নি। এখানে মানুষের পারাপারের প্রয়োজন আজও কম। এরই নিরিবিলি অঞ্চলে আরাবল্লির বন পেরিয়ে এসে হরিণেরা জল খেয়ে যেত, টিয়া আর চন্দনারা নেমে আসত এর জলে অবগাহন করে উড়ে যেতে—মরুচারিণী রাজপুতানী মেয়েরা এর স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে ঘট ভরে নিয়ে যেত। বানাস যেন রাজস্থানের রুক্ষ দৃষ্টিতে কোমলতা এনেছে!

বানাসের জলের উপর দিয়ে মোটর বাসের চাকা চলে গেল। এর পরে আবার এল একটি শীর্ণস্রোতা নদী। নদী বলতে যেন বাধে। স্বচ্ছ সুন্দর জল—নদীর মাঝখানে বসে তু হাতের আঁজলা দিয়ে স্নান করা যায়। নদীটির নাম 'খারি।' জলের নীচের পাথরগুলি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। গাড়ির চাকা সেগুলি মাড়িয়ে এপারে উঠে এল। এখান থেকেই কান্‌ক্রোলির ছোট্ট জনপদ আরম্ভ। ঘাট থেকে উঠে গিয়ে বাজারের কাছেই পাওয়া গেল 'হরজীবন ধর্মশালা।' রাস্তার ওপারে সামনেই একটি বিদ্যালয় দেখছি। ধর্মশালার ভিতরটি প্রশস্ত। একটি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ছিল। সামনেই একটি ইন্দারা। ভিতরে কয়েকটি রাজস্থানী পরিবার রাজ্যপাট বসিয়েছে। ওদেরই পাশ দিয়ে একটি ঘর দখল করা গেল। মাছির উৎপাত এখানে প্রচণ্ড।

কান্‌ক্রোলির প্রসিদ্ধি আমার জানা ছিল। এটি তীর্থস্থান, এবং এইটিকে ঘিরেই একটি জনপদ সৃষ্টি হয়েছে। আমার সময়

ছিল কম। সুতরাং ব্যস্তসমস্ত হয়েই বেরিয়ে পড়লুম মন্দিরের দিকে। অদূরে একটি ঢালুপথ উপর দিকে উঠে গেছে। চড়াই পথ ভেঙ্গে এসে পাওয়া গেল মস্ত এক তোরণদ্বার। যেমন তোরণ জয়পুরে, যেমন আজমেরে, যেমন নাথদ্বারে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক শহরে ও মন্দির প্রবেশপথে এমন এক একটি তোরণ। শুধু রাজস্থানেই বা কেন, মথুরা অথবা বৃন্দাবনও বাদ যায় নি। অনেক শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার তোবণ আছে, ঘণ্টাঘর আছে, তার সীমানা নির্দিষ্ট আছে। এটি এদিকের ঐতিহ্য। জরুরী কোনও অবস্থায় এই সব তোরণ বন্ধ হয়ে যেত এককালে। বাহির থেকে আক্রমণের ভয় করে এসেছে এরা। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে অনেকস্থলে এই। অমৃতশহর ও লাহোর এই ঐতিহ্য থেকে বাদ পড়ে নি। নতুন আর পুরনো দিল্লীর মাঝখানে আজও এই প্রাচীব অবলুপ্ত হয় নি। এখনও সেই 'কাশ্মীরী' গেট, 'লাহোরী' গেট আর সেই 'তুর্কোমান' গেট। আজ এদের দিকে চেয়ে দেখলে কৌতুক-বোধ আসে মনে। কাল থেকে কালান্তরে চলেছে ভারত—সে দাড়িয়ে নেই।

সেই বৃহৎ তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠে এলুম প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। মন্দিরটির নাম 'দ্বারকেশ'। অনেকে বলে 'দ্বারকাধীশ'। এককালে এই মন্দিবের বিগ্রহটি নাকি এসেছিল দ্বারকা থেকে। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা। সেই সালঙ্কার শিশুবালকের মূর্তি—বিশেষ একটি নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে! মন্দিরের ভিতরটি সোনারূপো জড়োয়া জহরতে ঝলমল করছে। চারিদিকে শ্বেতমর্মর প্রস্তরের কাজ। মন্দির এবং তার পরিপার্শ্ব যেমন প্রশস্ত তেমনি বৃহৎ। এই মন্দিরেরও উপার্জন প্রচুর। মন্দিরের আর্থিক উপার্জনের চেহারাটা রাজস্থানে বড় প্রকট।

পাথর বাঁধানো একটি সঙ্কীর্ণ পথ মন্দিরের ভিতর থেকেই এদিক ওদিক ঘুরে হঠাৎ যেন এসে পৌঁছল একটা দিগন্তজোড়া

অবকাশের মাঝখানে। সামনেই দেখি বিশাল এক সরোবর। সরোবর, না সমুদ্র! এখানে যেন উঠে এল ঝাঁসির সেই 'রাণী তালাও,' কিংবা উদয়পুরের সেই 'জয়সমুদ্র,' আজমেরের 'অন্নসাগর'—নাকি সেই যে আলোয়ার রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্তী পদ্ম সরোবরের ঘাট! কোথায় এলুম? এ যেন কাশীর অহল্যাবাঈয়ের ঘাট, মথুরার বিশ্রাম ঘাট, উজ্জয়িনীর মহাকাল নাসিক গোদাবরীর রামঘাট! অথবা আবার যেন কত কাল পরে এসে দাঁড়ালুম পুষ্কর হ্রদের ঘাটে!

এতগুলি নাম করার কারণ আছে। কেননা একটির সঙ্গে অপরটি নাড়ির যোগ। এরা বিভিন্ন নামে একই প্রকৃতির অধিকারী। জলাশয় ছাড়া দেবস্থান নেই। যেখানে অবগাহন সেখানেই পুণ্য। রামেশ্বরমের অথবা দ্বারকার, অথবা জগন্নাথের—অমন তিনটি বিরাট মন্দিব, সেজন্য বিরাটতর সমুদ্রের প্রয়োজন ছিল। ওই তিন ধামের পর চতুর্থ ধাম, অর্থাৎ হিমালয়ের বদরিকানাথ ধামে অলকানন্দার স্রোত বইছে। সেখানেও রয়েছে অবগাহনের কথা। অমরনাথের গুহার নীচে অমর গঙ্গা—সেই গঙ্গায় উলঙ্গ অবগাহন স্নান বিধি। পশ্চিম পাকিস্তানে ঝিলমের তীরে বিরাট মন্দির। সেখানকার ঘাটে অবগাহন করে শিবমন্দিরের বট-অশ্বত্থর ছায়াতলে গিয়ে দাঁড়াও—মনে হবে দশাশ্বমেধে স্নান করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে এসে দাঁড়ালুম সেই বটগাছটার তলায়। মাদুরায় গিয়ে মীনাক্ষী মন্দিরে ঢোক—মনে হবে এলুম বুঝি গয়ার গদাধরের মন্দিরে। এরা এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য। ধর্ম নয়, সংস্কৃতি! অবগাহন-স্নান মানে কলুষনাশন—যেটি বিজ্ঞানসম্মত। সমস্ত ভারতবর্ষ একই সূত্রে বাঁধা—একই অনুভাবে। বিভিন্ন বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সমাজরীতি, বিভিন্ন রুচি—কিন্তু এগুলি সেই মূল সংস্কৃতির বহিরঙ্গ। একই আচমনী মন্ত্র সর্বভারতের—'গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী।' সাতটি নদীর গ্রন্থিতে ভারতবর্ষ

বাঁধা। এইটি নিত্যপূজার মন্ত্র, এ মন্ত্র সর্বভারতীয় রাজনীতির—এটি বেদের অনুশাসন।

এই বিশাল হ্রদটির নাম 'রায়সাগর'। রাজস্থানে জল কম। জলের জন্য তাই সব পাগল। জল মানে জীবন, জল মানে জন্ম। বর্গীয় জ দিয়ে জনক জননী জায়া জীবন জলজ বনজ খনিজ—সুতরাং হিন্দু সংস্কৃতির সকল কর্ম জল দিয়ে! রায়সাগরের স্বচ্ছ সুন্দর জল দেখে বাঁচলুম!

হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া জলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে ফুর-ফুরিয়ে। রায়সাগরের এপার ওপার অনেক দূর। যখন এই হ্রদ পরিপূর্ণ থাকে, তখন এটির পরিমাপ নাকি আট বর্গমাইল। হ্রদের ওপারে দূর ও দূরান্তরে রাজপুতনার রুক্ষ প্রান্তর এবং আরাবল্লির শিরা-উপশিরা চোখে পড়ছে। হ্রদে নেমেছে রাজস্থানী মেয়েপুরুষ। পূজা দিচ্ছে কেউ ঘাটে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে কোথাও। মন্ত্রপাঠ করছে পুরোহিত।

একটি নিরিবিলি পাথরের আসন বেছে নিয়ে এ বেলার মত বসে গেলুম।

দুই চোখ ঝলসিয়ে গিয়েছিল থর মরুভূমি পেরিয়ে আসতে। তবু জয়শলমের, রামগড়, কিষেণগড়, বারমের বা ফালোদির পথ নয়।

পোকারন থেকে মাত্র যোধপুরে আসছিলুম। কর্কশ বালু পাথরের পাণ্ডুর পীতাভা—এছাড়া আর কোনও বর্ণ নেই। বালুর মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বিভিন্ন মনসা আর শুকনো বনঝাউ—তাল, তমাল, পিয়াল শিশমের করুণ ছায়া কোথাও নেই! না আছে আশ্রয়, না জল, না হরিৎ ক্ষেত্র, না রস। পশ্চিম রাজস্থানের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

যোধপুরের ঠিক আগে নির্দয়া প্রকৃতির চেহারা, সেদিন বদলিয়ে

গিয়েছিল 'রায়-কা-বাগ' স্টেশনে যখন এসে পৌঁছেছিলুম। যাচ্ছিলুম উদয়পুরে।

এবার থেকে পেয়েছিলুম প্রান্তরের সবুজ শ্যামলিমা। যারা চোখের ডাক্তার তারা জানে, মানুষের চক্ষুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বস্তিদায়ক রং হল দুটি। একটি নিবিড় সবুজ, অন্যটি নীলিমা। সেইজন্য প্রকৃতির বর্ণ হল সবুজ, আকাশ নীলাভ, সমুদ্র নীল! লাল, কালো, সাদা, ঘন হরিদ্রাভা, বেগনী--এরা কেউ চক্ষুর বন্ধু নয়। তুষার রাজ্যের মধ্যে যারা ভ্রমণ করে তাদের চোখে অত্যুগ্র শ্বেতবর্ণটা আঘাত করে বলেই তারা রঙ্গীন চশমা চোখে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়া ভ্রমণকালে দেখেছি, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তুষারপাতে ঢেকে যাবার আগে শরৎকালের শেষ দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সেখানকার বহু লোক সবুজ পাতাসুদ্ধ দুচারটি চারাগাছ অথবা গাছের ডাল ঘরের মধ্যে এনে অতি যত্নে রেখে দেয়। ওইটি স্বস্তি, ওই সবুজ বর্ণের মধ্যেই আগামী বছরের বসন্তকালেব স্বপ্ন। অতঃপব আশ্বিন থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি ওই কয়েকটি সবুজ পাতাব দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকা!

মারোয়াড় ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম অপরাহ্নকালে। ধীরে ধীরে আবার আরাবল্লির মধ্যে প্রবেশ করছিলুম। চারিদিকের মানুষের কোলাহল ও কলরবের মধ্যে আমি ছিলুম নিঃসঙ্গ। দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছি ছবির মত এক একটি উপত্যকা। কোথাও জলাশয়ের ধারে নেমে এসেছে রঙ্গীন পাখি জাত-ভাইদের সঙ্গে গলাগলি করতে। ময়ূর আর ময়ূরী রয়েছে কোনও কোনও কুঞ্জবনে। ওদের যেন রাজকীয় চালচলন। আপন আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে ওরা সরে থাকে আড়ালে-আবডালে। মাঝে মাঝে গা চুলকিয়ে এক একটি দীর্ঘ বর্ণাঢ্য পালক ফেলে যায় এখানে ওখানে। আপন রূপ সম্বন্ধে এমন সচেতন পাখী আর ভূ-ভারতে নেই!

দখতে দেখতে সেই অপরাহ্ন এবং গোধূলিকাল সন্ধ্যার ছায়ার

মধ্যে মিলিয়ে গেল। আরাবল্লির পাহাড়তলিতে নেমে এল ঘনান্ধকার। তারই ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন বার বার সুড়ঙ্গ লোকে ঢুকল। যখন উদয়পুর এসে পৌঁছলুম রাত তখন প্রায় পৌনে দশটা।

একখানা টাঙ্গা নিয়ে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূর শহরের দিকে চললুম। অবশেষে যেখানে গিয়ে আস্তানা নিলুম সেটির নাম 'লেক ভিউ হোটেল।' একটু জ্বর ভাব হয়েছিল। কুচ পরোয়া নেই!

পথে পথে দেখেছিলুম আরাবল্লির ডগায়-ডগায় ছোট বড় এক একটি দুর্গপ্রাকার। সেকালের সেই জীবন আজকে আর নেই, যেটি আগাগোড়া ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু যে মোগল পাঠানের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা ছিল তাই নয়—রাজস্থানে রাণায়-রাণায় দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ ছিল চিরকাল। একদিকে শৌর্য, বীর্য, জাতীয়তাবাদ, আত্মত্যাগ—অন্যদিকে কপটতা কূটনীতি বিশ্বাসঘাতকতা স্বার্থপরতা—এরা জীর্ণ করেছিল রাজস্থানকে। আজ আরাবল্লির চূড়ায়-চূড়ায় যে সকল দুর্গ জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে—তাদের সকল তাৎপর্য কালক্রমে হারিয়ে গেছে। প্রাকারের ভিতরে অন্ধকার কোণে কোণে বাদুড় আর চামচিকার বাসা। শূন্যপুরীর মধ্যে প্রেতান্ধকার। কেউ আর দুর্গের পথ মাড়ায় না। ওরা দাঁড়িয়ে রইল এক এক টুকরো করুণ কাহিনীর মত।

আজ নতুন সজ্জা তুলে নিয়েছে রাজস্থান! সেই স্বর্ণালী বিচিত্র সুন্দর পোশাক খসে গিয়েছে। কটিবন্ধের স্বর্ণকোষে যে ঝলমলে তরবারি একদিন লকলক করে উঠত, তার চিহ্নও আজ আর নেই। আজ তারা গল্প ও রূপকথার মধ্যে জায়গা পেয়েছে। শত শত বছর পরে রাজস্থান আজ জীবনের শান্তি এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। রাজস্থানের মনে আর দুশ্চিন্তা নেই।

উদয়পুরে সর্বপ্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেটি রাজস্থানের সৌধ-নির্মাণ প্রতিভা। চারিদিকে দেশজোড়া মরুভূমি—বৃক্ষ-বনস্পতি

নেই। মৃন্ময়তা কম, তার মানে মাটিও কম! নব সভ্যতার সর্বপ্রধান সামগ্রী কয়লা, তা ও দেশে নেই। লোহা নেই, তেল নেই। গাছ না থাকা মানে কাঠ নেই; কয়লা না থাকা মানে ইঁট নেই। উদয়পুরের বিরাট সৌধশ্রেণী গড়ে উঠেছে—অথচ না আছে কাঠের কাজ, না আছে গাঁথুনিতে ইঁটের কাজ! বিকানের জয়শলমের দেখলে অবাক হতে হয়। বিশেষ করে জয়শলমের। সেখানে সব বাড়ির একটিমাত্র কাঠের দরজা—যেটি প্রধান প্রবেশ পথ। বাকি সমস্ত জানলা দরজা ছাদ—যা কিছু সব পাথর এবং পাথরের জাফরি। উদয়পুরও গড়ে উঠেছে সেই কাঠ আর ইঁটের অভাবের মধ্যে। কিন্তু এই দেখে অবাক হতে হয়, তার প্রত্যেকটি সৌধের কী অপরূপ কারুসৌন্দর্য। শহরটি পার্বত্য, কিন্তু অগণিত জলাশয়ের শোভা, এবং তার পৃষ্ঠপট আরাবল্লির পাহাড় দিয়ে ঘেরা। নগর হিসাবে পুরনো আগ্রা দিল্লীর কোনও বিশেষ শোভা নেই। কিন্তু শোভা আছে গোয়ালিয়রে, শোভা আছে রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেকটি বড় শহরে। আগ্রার তাজ, আগ্রার দুর্গ—এ দুটো বাদ দিলে অবশিষ্ট শহর যা থাকে তা বিরক্তিকর। নতুন দিল্লীর সরকারী শহর বাদ দিয়ে এবং লালকেল্লার দিকে না তাকিয়ে যা থাকে সে একঘেয়ে। কিন্তু জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানের—এরা এক একটি ছবি। বড় বড় শিল্পীর মহৎ এক একটি সৃষ্টি—যার তুলনা নেই। কোজাগরী পূর্ণিমায় কাশীর গঙ্গায় যারা নৌকাবিহার করেছে, যারা লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী পাড়ায় ঘুরেছে, ফতেপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা যারা লক্ষ্য করেছে—তারা জানে নগর নির্মাণের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ কাকে বলে।

উদয়পুরের মধ্যে সেই সৌন্দর্যবোধটি যেন একটি মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। এই নগরের পুরনো নাম ছিল মেবার। এটি নির্মিত হয় প্রায় চার-শো বছর আগে। চারদিকে এই শহর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। জনবহুল অংশটা বাদ দিলে শহরের অবশিষ্ট যা থাকে, তার

অধিকাংশই মহারানার অধিকারভুক্ত। প্রাকারের ভিতর দিয়ে নগর প্রবেশের তোরণগুলির নাম 'পোল।' যেমন হাতী দরওয়াজার নাম হাতীপোল। তেমনি সূরযপোল, দিল্লী পোল ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা সুন্দর হল এক একটি বিশাল হ্রদসমীপবর্তী প্রাসাদ। একটি হ্রদের মাঝখানে দুটি সুন্দর শ্বেতমর্মরের প্রাসাদ। একটির নাম জগনিবাস, অন্যটির নাম জগমন্দির।

এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি চারদিকে সবুজের সুষমা। বনময় ক্ষেত্র, মনোরম পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষলতাবিতানের আশেপাশে রানা-পরিবারদের বাসস্থান—বেশ লাগছিল। একখানা টাঙ্গা ভাড়া করে সেদিন সকালের মধুব রৌদ্রে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। জনৈক সজ্জন মুসলমান গাড়ি হাঁকাচ্ছিল এবং আমি তার মুখে গল্প শুনছিলুম। লোকটি প্রবীণ।

মাত্র কিছুদিন আগেও প্রত্যেক রাজ্যেরই এক একটি বৈশিষ্ট ছিল। কলকাতায় ইদানীং ঘুরে বেড়ালে মনে হবে, এ মহানগরী এখন কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের নয়। কাশীব দশাশ্বমেধ বোড হয়ে উঠেছে যেন সিন্ধু দেশ। কানপুবের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল যেন পাঞ্জাব। বিগত যুদ্ধের কাল থেকে প্রত্যেক রাজ্যই তার লোকজনকে এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে চালাচালি করেছে। উদয়পুরে যদি শিখব্যবসায়ী দেখি তাহলে আর বিস্মিত হই নে। বাঙ্গলায় এসে ভারতের সকল সম্প্রদায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে—কেবল ওড়িয়ারা ছাড়া। ভারতের সকল রাজ্যে গিয়ে বাঙ্গালীরা কিন্তু ব্যবসা করে নি। রাজস্থানে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নেই। অবশ্য পেশাদার বাঙ্গালী কিছু আছেন। যেমন ডাক্তার, মাস্টার, অধ্যাপক ইত্যাদি। বহুকাল আগে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি শহরে একটি মস্ত বাঙ্গালী হিন্দু ঔষধ ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান দেখেছিলুম। তাঁদের নাম ছিল 'সেন-কোম্পানি'। তাঁরা সেখানে আজও আছেন কি না জানিনে।

আগাগোড়া একটি শহর পাথর দিয়ে তৈরি—রাজস্থানে ঘুরে

না বেড়ালে এটি বোঝবার জো নেই। কাশীও চুনারের পাথরে তৈরি, কিন্তু তার মূল গাঁথুনি ইঁটের। উদয়পুর শহরটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ে তিন রকম বা চার রকম পাথরে তৈরি। বালুপাথর, শ্বেত ও কালো পাথর এবং যোধপুরের লাল পাথর। আমি অনেকবার কটূক্তি করেছি আরাবল্লি গিরিদলকে। কিন্তু আরাবল্লি না থাকলে রাজস্থানের একটি শহরও গড়ে উঠতে পারত না, একথাটি বলতে ভুলেছি। 'লক্ষ্মীবিলাস' প্রমুখ যে প্রাসাদগুলি পাহাড়ের উপর নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলি পেতুম কোথায়? কোথায় পেতুম ওই 'পিচোলা' সরোবরে প্রাসাদ এবং ঘাটগুলি? কোথায়ই বা পেতুম ওই 'জয়সমুদ্র' সরোবরের মনোরম সোপানশ্রেণীর দল?

টাঙ্গাওয়ালা আমাকে নানাপথে ঘোরাচ্ছিল। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, তোপখানা, হ্রদ, জলপ্রাসাদ, জগদীশ মন্দির, সজ্জননিবাস ইত্যাদি। বাজারে দেখতে পাচ্ছি তিনটি প্রধান শিল্পকর্ম। একটি সূচীশিল্প, একটি 'রংরেজী' শিল্প (dyeing), এবং আরেকটি মাটি, পিতল, রূপা ইত্যাদি সামগ্রীর পাত্রনির্মাণের কাজ। সূচীশিল্পের সূক্ষ্ম কাজগুলি দেখে অনেক সময় দোকানের সামনে থমকিয়ে যেতে হয়। ঠিক তেমনি হাতীর দাঁতের সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ। এসব কাজগুলি আগে ছিল ভারত প্রসিদ্ধ, এখন বিশ্ববিশ্রুত। পৃথিবীর সকল দেশের পর্যটক রাজস্থানের শিল্পসামগ্রী দেখে অবাক হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাঁচ তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু শিল্পী তার স্বপ্নকে রূপ দেয় আপন অঙ্গুলী চালনার দ্বারা। কৃষ্ণনগরের পুতুল তৈরির কাজে শিল্পীর সার্থক আঙ্গুল দরকার, মেশিন সেখানে অনর্থক।

বর্তমান মহারাজা ভূপাল সিংয়ের রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুরছিলুম। তিনি তখন বৃদ্ধ, বাত এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর তিনজন মহারাণী, কিন্তু কারও সন্তান হয় নি। মহারাজা 'দত্তক'-পুত্র গ্রহণ করেছেন। মহারাজার কোনও 'হারেম' ছিল কি না ঠিক খবর পাই নি। কিন্তু

টাঙ্গাওয়ালা গল্প করল, মহারাজার রাজকোষ থেকে এখনও দুই শত বিভিন্ন বয়সের নারী প্রতিপালিত হন। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন উদয়পুরের নানা অঞ্চলে। তাঁর রাজপ্রাসাদের ভিতব-মহলটাকে ইন্দ্রালয় কিম্বা স্বপ্নপুরী কি বলব, ভেবে পাই নে। এই প্রাসাদের মধ্যেই বাস করেছেন একদা উদয় সিং, এটি ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। সেদিন এর নাম ছিল মেবার। সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম এক বাঙ্গালী নাট্যকার স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই মেবারকে নিয়ে ভারতবিশ্রুত নাটক লিখেছিলেন। সেই জাতীয়তাবাদী সার্থক নাটকটি বাঙ্গলার তদানীন্তন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। সেদিন সেই প্রাসাদটি ঘুরে বেড়াবার সময় 'শীর্ষমহলটি'কে পরীরাজ্য বলে মনে হয়েছিল। তাঁব প্রাসাদ এবং উত্থানগুলির শোভা সৌন্দর্য আমাকে চমৎকৃত করেছিল।

উদয়পুরে ভ্রমণ করে ফিরবার কিছুকাল পরে শুনেছিলুম মহারাজা ভূপাল সিং পরলোকগমন করেছেন।

কোথা থেকে কোথায়!

মারোয়াড় স্টেশনের ওয়েটিং রুমে সমস্ত রাত মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। পুঁটলি পাকিয়েছিলুম ঠাণ্ডায়। শেষ রাত্রের দিকে কুলি এসে ডাকল। ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। শুক্লপক্ষের চন্দ্র তখন অস্ত গেছে। ভোরের আগে অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘন। গাড়ির বেঞ্চিতে আবার ঘুমলুম।

সকালে এসে নামলুম আবু রোড স্টেশনে। তখন বেশ রোদ উঠেছে। স্টেশনের বাইরে এসে আমি অবাক। কবে যে আবু রোড এমন শহরে পরিণত হয়েছে খোঁজ পাই নি। পিচের রাস্তা, বড় বড় বাড়ি, মস্ত কাজকারবার, দোকান বেসাতি, থানা পুলিস, সিনেমা হাউস, দোকানে দোকানে সেই নোংরা লাউড স্পীকার, বাজারে বাজারে চায়ের দোকান, মোটর মেরামতি কারখানা, কর্মব্যস্ত

ইতর-ভদ্র সমাজ। আমি একেবারে অবাক। ট্রাফিক পুলিস যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করছে! আমি বিমূঢ়!

আমার প্রথম ভারত পরিক্রমার কালটি মনে পড়ছে। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হতে চলল। তখন অনেক সময় বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের প্রস্তাবে তেমন লজ্জা পেতুম না। মাথায় থাকত চুলের রাশি। পরনের ধুতিখানা হরিদ্বারের ভোলাগিরির ধর্মশালায় বসে একপ্রকার গোলাপী রংয়ে ধুয়ে নিতুম। ওই রংয়েরই টুকরো কাপড় মাথায় বেঁধে নেওয়া যেত। কে আর দেখছে কোথায়? পায়ে নাই বা জুতো রইল! আর যদি সেই বারো আনা জোড়ার কেড্‌স পাওয়া গেল, সেটাকেও রঙ্গীন করে নিতে অসুবিধা ছিল না। সেদিন দুই চোখে লেগে থাকত এই বৃহৎ ভারতভূমির স্বপ্ন। সেদিন কেউ ছিল না আমার পাশে। কোনও সমকালীন সাহিত্যকর্মী তখনও ভাবতবর্ষ দেখেন নি! কেবল তার বছর তিন-চার আগে মাত্র "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" শুরু হয়েছিল। সেই উপলক্ষে পাঁচ সাতজন লেখক যেতেন এখান ওখান থেকে। বৃহৎ ভারতের কিছু কিছু সংবাদ সেই সূত্রে পাওয়া যেত।

আমি তখন যাচ্ছিলুম কাথিয়াবাড় ভ্রমণে। নেমেছিলুম এই আবু রোডে। কিন্তু সেই আবু রোড এ নয়। তখন এটি সামান্য স্টেশন। বালুপাথর এবং ধূলোয় পথ ডুবে থাকত। কোথায় যেন এখানে ছিল একটি দরজা-জানালাশূন্য জীর্ণ ধর্মশালা—সেখানে ভয় ছিল নেকড়ে বাঘের। তাঁরা নাকি পাহাড়তলির বন থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে আসত ছাগল আর বাছুরের লোভে। পথে কোথাও তেলের আলো ছিল না, এবং সন্ধ্যার আগে একটিমাত্র পুরির দোকান থেকে বোলতা-বসা প্যাঁড়া আর পুরি না কিনলে রাত্রি কাটত উপবাসে। সেদিন যানবাহনের মধ্যে ছিল একমাত্র বয়েল গাড়ি এবং তারই উপরে চড়ে বানাস নদী পেরিয়ে বন-পাহাড়ের তলায় তলায় গিয়েছিলুম এক সত্যনারায়ণ মন্দিরে! সেই মন্দির

আজও অবশ্য আছে, কিন্তু তাঁর সন্ধান কেউ দিতে পারল না। ওই বয়েল গাড়িতেই সেদিন আবু পাহাড়ের শহরে গিয়ে উঠতে হত। আর নয়ত পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে। সেদিন নগদ তিনটি টাকা খরচের ভয়ে ওই আঠারো মাইল মাত্র পার্বত্যপথ অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। শুনতে পেতুম সেদিন রাজস্থানী ডাকাতরা নাকি সন্ন্যাসীর ঝুলিঝালাও নাড়াচাড়া করে দেখতে চাইত। তারা নাকি আজ সরে গেছে পশ্চিম রাজস্থান পেরিয়ে খয়েরপুর ও বাহ্বাওয়াল-পুরের দিকে, শুনে এলুম জয়শলমেরে।

আরাবল্লি গিরিশ্রেণীর রাজস্থান জোড়া প্রসার বুঝতে পারা যায়, যখন দেখি তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু পাহাড় একেবারে রাজস্থানের দক্ষিণ সীমারেখার উপর অবস্থিত। মাঝখানে এই আবু পাহাড়ের উপর দখল নিয়েছিল বোম্বাই-গুজরাট, কারণ গুজরাটে পার্বত্য শহর নেই। আবু পাহাড় আবার ফিরে এসেছে রাজস্থানে। আরাবল্লিও ঠিক এইখানে শেষ হয়েছে।

প্রাইভেট মোটরকার, ট্যাক্সি এবং মোটর-বাস আজ চলছে নিত্যনিয়মিত। সেই টাট্টু ঘোড়া আর বয়েল গাড়ি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ নিঃশব্দে নতুন করে গড়ে উঠছে—অনেকেই তার খবর রাখে না। যে বিরাট দেশজোড়া কর্মযজ্ঞ চারিদিকে আজ আরম্ভ হয়েছে—নিতান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কে অস্বীকার করবে? আজ সকল ভারতবাসীর সুবিধা ও সুযোগ-লাভের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের সরকারী মহলের যে কর্মতৎপরতা—তার হিসাব রাখে কয়জন বিদ্বেষধর্মী?

মোটরবাসে উঠে আমার সেই এককালের অনতিক্রান্ত আঠারো মাইল পার হচ্ছিলুম। আট মাইল সমতল, দশ মাইল পার্বত্য। পাহাড়তলিতে সেই বানাস নদী পেরিয়ে গেলুম। কিন্তু আজ সেখানে পাকা ইমারতের সাঁকো। নীচের দিকে ঝিরঝিরিয়ে চলেছে

বানাস। সেই অরণ্য কোথাও নেই—দেখতে পেলুম না সেই তপোবনের আশ্রম-মন্দির। বোধ হয় আজ ভারত হারাতে বসেছে সেই মন্দির-সংস্কৃতি। কালের ধাক্কা এসেছে, এসেছে বিজ্ঞানের যুগ, যন্ত্রের কাল, জড় সভ্যতার সমারোহ। বোধ হয় এরই সঙ্গে এসে পৌঁছল সংশয়বাদ, ঐহিক সুখপরিকল্পনা, ধনবাদী জীবন-ব্যবস্থা। আজ আর কেউ দরিদ্র থাকতে চাইছে না, কেউ চাইছে না স্বল্পতুষ্ট জীবনযাত্রা!

সুন্দর মসৃণ রাজপথ বনময় নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে পাহাড়ে উঠে এঁকেবেঁকে চলেছে। কয়েকটি ঝরনা দেখতে পাচ্ছি কিলবিলিয়ে নামছে। দেখতে পাচ্ছি বনের নীচের শীর্ণ নদীখাত। এই পাহাড়ে এসে আরাবল্লির সমস্ত অপযশ ঘুচেছে। এখানে সে সম্পদে এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। চারিদিকের বনশ্রী এবং শ্যামলাভ বৃহৎ পর্বতশ্রেণী আবু পাহাড়ের স্তরে স্তরে সৌন্দর্যবিন্যাস করেছে। আমি মুগ্ধচক্ষে চেয়েছিলুম।

পথ আর কতটুকু? তিস্তাবাজার থেকে কালিমপঙ—কমবেশী দশমাইল পাহাড়! আবু পাহাড়ও তাই! ভাড়া নিয়েছে সাড়ে তের আনা, তার ওপর এক টাকা টেক্স। যদি দশ টাকাই নিত, কী ক্ষতি ছিল? চারদিকের দিকদিগন্ত জোড়া রাজস্থানের বিশাল মরুভূমির মাঝখানে এ যেন শান্ত স্নিগ্ধ বনচ্ছায়াময় তপোভূমি। বোধ হয় এই কারণেই আবু পাহাড় চুম্বকের মত পর্যটকের মনকে টেনে ধরে। আমার মুগ্ধ মন এই পার্বত্য শহরের প্রতি-অঙ্গে এক একটি কুঞ্জলোকের সন্ধান পেয়েছিল। আবু পাহাড়ের উচ্চতা চার হাজার ফুটের কিছু কম। এখন নবেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি। এবার ঠাণ্ডা পড়ছে আবুতে। এমন বন-বাগান উদ্যানে ভরা পার্বত্য শহর সহসা চোখে পড়ে না।

পোলো খেলার বৃহৎ ময়দানের পাশে 'ভারতীয় নিবাস' নামক একটি যেমন-তেমন হোটেলে একটি ঘর নিয়েছিলুম। দৈনিক ঘর

ভাড়া দু-টাকা। আহারাদি সস্তাগণ্ডায়—গায়ে লাগে না। বাজার-হাট ছোটখাট। মনে পড়ছে পাঞ্জাবের ডালহাউসী পাহাড়ের কথা। ওই যার তলা দিয়ে একদা গিয়েছিলুম সুদূর চম্পা উপত্যকায় ইরাবতী নদী পার হয়ে।

দূর পাহাড়ের চূড়ায় জয়পুর মহারাজার প্রাসাদটি দেখা যাচ্ছে ছবির মত। কিন্তু প্রাসাদ একটি নয়। গুজরাটী এবং রাজস্থানী ধনীরা আগে ভাগে এসে বানিয়েছে বহু 'কোঠি।' আনন্দের কথা এই, এখানে প্রায় সর্বত্র হেঁটে যাওয়া চলে। দিলওয়ারার দিকে যাবার কালে 'নাক্কিতালাও' আবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এটি যেন নৈনীতালের সেই নৈনী হ্রদ এখানে উঠে এসেছে। রঘুনাথজীর মন্দির দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়ের ধারে। সেখানে রাজা রাম-চন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণ বিগ্রহ বর্তমান। অন্যদিকে ইংরেজ আমলের রেসিডেন্সির 'কোঠি'। এটি এখন রাজস্থানের গভর্নমেণ্টের অধীনে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'নাক্কিতালাও'য়ে নৌকাবিহার করা যায় রোমাঞ্চকর জ্যোৎস্না রাত্রে—ঠিক যেমনটি নৈনীতালে—চারিদিকে পর্বতের প্রাচীর। এখানে আশেপাশে ভীলজাতির বস্তি পাওয়া যায়। জনসংখ্যার মধ্যে তাদেরও একটা অংশ আছে।

"নাক্কিতালাও"র মূল নামটি নাকি "নখ্‌খিতালাও"। প্রবাদ এই, আবুপাহাড় যেদিন জলের অভাবে হাহাকার করছিল, সেদিন এখানে একদল দেবতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সেদিন আপন আপন নখের দ্বারা আঁচড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর কেটে বার করেন। আজও বুঝি সেই দেবতাদের উত্তরাধিকারীরা আছে এই "নখ্‌খিতালাও"র আশেপাশে গুহাগহ্বরে, মন্দিরে এবং এখানে-ওখানে। আবু থেকে ছয় মাইল পাহাড় পেরিয়ে গেলে 'গোমুখ'। সেখানে রয়েছে বশিষ্ঠ ও গৌতমের আশ্রম। ওর পরে সেই বিরাট "গুরুশিখর" পর্বত। গোমুখের নিকটবর্তী 'কোদরা দাম' থেকে আবু পাহাড়ে জল সরবরাহ করা হয়। 'গুরুশিখর' পর্বতে উঠে

গেলে পাওয়া যায় 'দত্তাত্রেয় আশ্রম'—এখানে জীবন-বৈরাগী সন্ন্যাসী-গণের দেখা মেলে। ওখানে আরেকটি মন্দির আছে, তার নাম "আনচোরিয়া মাতা"।

মাইল পাঁচেক মোটরবাসে গেলে অচলগড় পর্বত। এটির উচ্চতা সাড়ে চার হাজার ফুট। গুরুশিখর এবং অচলগড় মুখোমুখি—এপার-ওপার। গুরুশিখর অবশ্য আবুপাহাড়ের মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়া—সাড়ে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। ওটার পথ 'ওরিয়া' ডাকবাংলার পাশ দিয়ে গিয়ে মাইল দুই চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পৌঁছেছে।

অচলগড় একটি পুরনো দুর্গ, একটি দুটি মন্দির, এবং একটি ক্ষুদ্র জনপদের ভগ্নাবশেষ। একটি প্রাকার ঘেরা সরোবরের মধ্যে তিনটি মহিষমূর্তি পাশাপাশি বসানো—এবং তার দিকে এক রাজ-কুমারের প্রস্তরমূর্তি ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্য করছে। এটির নাম 'ঘৃত' সরোবর। পুরাকালে জন্তুরা এসে এখানে ঘি খেয়ে যেত। সেই জন্তুরা রামরাজ্যের বানর কিনা এটি জানা গেল না। প্রবাদ এই পুরাকালে এই সরোবরটি ঘৃত পরিপূর্ণ থাকত। কিন্তু প্রতি রাত্রে গোপনে তিনটি বন্য মহিষ এসে সেই ঘি খেয়ে যেত। রাজা আদিপাল এতে ক্রুদ্ধ হন এবং ঘৃতকুণ্ড রক্ষার জন্য মহিষগুলিকে বধ করেন। অচলগড়ের মধ্যে রাণাকুম্ভ এবং তাঁর পত্নী ভজনসিদ্ধা মীরাবাঈয়ের নামে মহল ও গুহা রয়েছে। হনুমানের মূর্তি রয়েছে এই গড়ের দ্বারপাল হিসাবে। পাশ দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলে গিয়েছে আদিনাথের মন্দিরে। তাঁর মূর্তি পিতলের। সেই মূর্তিটি বিশেষ মর্মস্পর্শী। পাশে ছোট ছোট চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। গড়ের ছাদের উপরে এসে দাঁড়ালে নিকটে ও দূরে দেখা যায় চিতোর পাহাড়, মারোয়াড়, বানাস নদী, আবু পাহাড়ের পথ, গুরুশিখর প্রভৃতি। গড় থেকে নীচে নেমে এলে অচলেশ্বর এবং পার্বতীর মন্দির দর্শন করা চলে। চারিদিকের রুক্ষতার মাঝখানে এ মন্দিরের

বৃক্ষছায়াতল যেন শান্তির নীড়। বুঝতে পারা যায় এককালে এখানে হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে একটি ধর্মসংগ্রাম ও মনোবিরোধ ঘটেছিল —যার মধ্যে রাজনীতিক চেহারাটা ছিল বড়। ফিরবার পথে "কন্যাকুমারী মন্দির" দেখে এসেছিলুম। তারই উপরভাগে ছিল শ্বেতবর্ণ একটি জৈনমন্দির। এখানকার সর্বত্র পাহাড়ের গায়ে যে-বিচিত্র ধরনের গুহাগহ্বরগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি বহুকাল অবধি মনের মধ্যে একটি ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পাওয়া যায় "সান-সেট্-পয়েন্ট", সূর্যাস্ত দৃশ্যস্থল। সেখানে সূর্যাস্তটি দেখবার জন্য অপরাহ্ণ কাল থেকে একটি ছোটখাটো জনতার সমাবেশ ঘটতে থাকে। জায়গাটা ঠিক সমতল নয়, পাহাড়েব গা। অনেকে সুবিধামত জায়গা বাছে। ক্যামেরা থাকে সঙ্গে। মেয়ে পুরুষ অনেকেই এটিকে সান্ধ্যভ্রমণের অঙ্গ মনে করে। চারদিকে বনজঙ্গল আর ছোট ছোট জলাশয়। সন্ধ্যার পর নাকি এদিকে আজও হিংস্র জানোয়ার চরে বেড়ায়। নির্জন বনময় স্থান। এখানে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় পশ্চিম রাজস্থানের ধুধুকার মরুভূমির প্রান্তদিগন্তে ধীরে ধীরে লোহিতবর্ণ সূর্য অস্তাচলে নামতে থাকে। সূর্যের সেই মরুগ্রাস দৃশ্যটি সত্যই মনোরম এবং উপভোগ্য।

দিলওয়ারা মন্দিরগুলির বাইরের চেহাবাটা একেবারে সাধারণ, সাদা-মাটা—না আছে চাকচিক্য, না বৈশিষ্ট্য। উপর দিকটায় বোধ হয় এককালে চুনকাম করা ছিল, এখন বৃষ্টির স্যাৎলা পড়ে কালচে হয়ে এসেছে। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না এই মন্দিরগুলির মধ্যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য লুকিয়ে রয়েছে!

কোলের কাছ দিয়ে চলে গেছে অচলগড়ের পথ। পথের ধারে বুঝি দু-একটি ঘরদোর। আবু শহর থেকে হেঁটে এলে মাইল দেড়েক।

অত্যন্ত সাদাসিধে বাইরের দিক। এদিক ওদিক ঘুরলে সবসুদ্ধ পাঁচটি মন্দির দেখা যায় একই পাড়ায়। এগুলি শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের। একটি শুধু দিগম্বরী মন্দির পথের এপাশে। পাঁচটি দিলওয়ারা হল আদিশ্বব, নেমিনাথ, ঋিষভদেব, সুবিধিনাথ এবং পরশনাথ। আদিশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। আদিশ্বরের মধ্যে একটি বৃহৎ কৃষ্ণকায়া নারীর মূর্তি—নাম অম্বিকাদেবী। বড বড় স্ফটিকের চক্ষু —বুদ্ধের মত বেদীর উপরে সমাসীন। মূর্তির প্রকাশটি অনন্য, যেন বিজবিজ করে নিঃসঙ্গ দর্শকের কানে কানে কিছু বলতে চায়! ছোট ছোট মূর্তি আরও আছে আশেপাশে। আরেকটি কৃষ্ণকায় মূর্তি দেওয়ালের মধ্যে লটকানো। প্রধান মূর্তি হল আদিশ্বর ভগবান। ভিতরের কক্ষে সেটি বেদীর উপর বসান শ্বেতমূর্তি। এটিও স্ফটিক চক্ষু। আদিশ্বর হলেন চব্বিশ জনের মধ্যে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর। সমগ্র মন্দির মনে সম্ভ্রম জাগায়।

নিঃসঙ্কোচে এবং নির্ভয়ে প্রকাশ করব, ভারতবর্ষের কোথাও মর্মরপ্রস্তর নিয়ে এমন ললিত লাবণ্যের খেলা আর কখনও দেখি নি। ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে চিত্রকলা, আশ্চর্য কারুশিল্প! প্রতি গম্বুজের ভিতরভাগ, প্রতি দেওয়াল, প্রতি সিলিং, প্রতি স্তম্ভ, প্রতিটি ছোট ও বড় মূর্তি—স্থপতিশিল্পীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি! এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারুশিল্পকলা কেমন করে মর্মরপ্রস্তরের ভিতর থেকে বাহির করে আনা যায়, এইটি প্রধান বিস্ময়। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এবং কোনও স্থাপত্য কীর্তিতে মর্মর-প্রস্তরের এই পরমাশ্চর্য শিল্পকলা নেই!

পঞ্চাশটিরও বেশি মূর্তি রয়েছে নানা কক্ষে। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটক স্থাপত্যকলার এই বিস্ময়কর সাফল্য দেখে যদি বাড়ি ফিরে যায়, সেই তার সার্থকতা।— শুধু একটি বিষয়ে আমার মনে কিন্তু আছে। অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে এই আশ্চর্য মন্দিরগুলি নির্মিত। এই বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার

সঙ্কীর্ণতার মধ্যে পড়ে রুদ্ধশ্বাস হয়েছে। এর জন্য মস্ত পটভূমির প্রয়োজন ছিল। তারই অভাবে এটি অপরূপ হয়েও মহৎ হতে পারে নি। বিস্ময়জনক হয়েও রাজকীয় হয়ে ওঠে নি। তাজমহল অপেক্ষা অনেক বেশি 'ধনী' হয়েও তাজমহলের সেই আবকাশিক মহিমাকে আনতে পারে নি। দিলওয়ারা দেখে সেইজন্য সেদিন আমার মন হায় হায় করে উঠেছিল। তবুও বড় দরিদ্র মনে হয়েছিল সেদিন তাজমহলের শিল্পকলা! অথচ জানি, তাজমহলের পটভূমিতে কিছু আছে বেদনার আভাস, কিছু আছে বিধুর-বিচ্ছেদের ভাবনা। তার উপরে তাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে কালিন্দীর কূলে—যেখানে শতবর্ষ বিরহের অশ্রুধারা আকুল হয়ে বয়ে চলেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! তা ছাড়া তাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের লোকচলাচলের মাঝখানে, সেটি যাতায়াতের পথেই পড়ে। তাজের পিছনে ছিল সম্রাটের মন, রাজকোষ ছিল শাসন-বাঁধন হীন, স্থান নির্বাচনের সুযোগ ছিল—তাজ নিয়ে বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকার্য প্রচুর। তাজের পিছনে সকল যুগের রাজশক্তি কাজ করেছে। ভালবাসা এখানে রাজবেশ পরেছে। তাজের সুবিধা অনেক। এসব ছাড়াও অন্যদিক আছে। আকবরের ইলাহি ধর্ম এবং তাজমহলের প্রণয়ধর্ম—রাজনীতিক দিক থেকে মোগল সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মনে সহনীয় করে তুলেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের চেতনা এনেছে। কিন্তু দিলওয়ারার ধর্মীয় ব্যথাটা কোনদিক থেকে জোর পায় নি বলেই তাকে একান্তে পড়ে থাকতে হল।

এক হাজার বছর আগে দিলওয়ারার মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখে মনে হবে গতকাল মাত্র নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে! এটিও আশ্চর্য। দশম শতাব্দীতে শেঠ বিমল শাহ নাকি আবু পাহাড়ে তিনশত মন্দির একে একে নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন জৈন। তাঁর এবম্বিধ আচরণে অসুরনাশিনী অম্বিকাদেবী তাঁকে নাকি এক স্বপ্ন দিয়ে বলেন, কোন্ অধিকারে এত বড় অন্যায়

তুমি করেছ? বিমল শাহ বলেন, আমার জৈনগুরুর আদেশে! দেবী রুষ্টা হন এবং বারম্বার প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তিনি বাসুকীকে ডাক দিয়ে ভূমিকম্প আনেন। সেই ভূমিকম্পনের ফলে বিমল শাহর বহু মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে ভীত হয়ে বিমল শাহ অম্বিকাদেবীর শরণাপন্ন হন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর ইচ্ছাক্রমে দিলওয়ারার জন্ম ঘটে। এই মন্দির নির্মাণের খরচ পড়েছিল ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এটির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় মন্দির নেমিনাথের। তাঁর মূর্তিও কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ২২শ নম্বর তীর্থঙ্কর। রাজা বৃদ্ধবলের আমলে ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মন্ত্রী শেঠ বাস্তুপাল তেজপাল এই মন্দির নির্মাণ করেন ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায়। তৃতীয় মন্দিরটি রিষভদেবের নামাঙ্কিত। এটি নির্মাণ করেন ভীম শাহ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ মন্দির সুবিধিনাথের —এ মূর্তিটি শ্বেতবর্ণ। পঞ্চমটি পবশনাথ। পরশনাথ আমাদের অতি পরিচিত। মূর্তিটি সুশ্বেতবর্ণ, মুখশ্রীব অভিব্যক্তি মিষ্ট এবং করুণাময়। এই মূর্তিটিতে শিল্পীর গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতি মন্দির ও মূর্তির ইতিহাস শুনেছি মন দিয়ে, কেননা প্রতি মন্দিরেরই একটি নিজস্ব কাহিনী রয়েছে—যেটি শোনবার মত। মনে হচ্ছিল আমি যেন বহুকাল এই একটি 'অবাস্তব' এবং রূপকরাজ্যে বাস করছি! আমি এতক্ষণ যেন ছিলুম অন্তহীন কালের বাইরে! আমাকে বাদ দিয়েই মহাকাল তাঁর মালা জপ করছিলেন। সৌন্দর্যের অমরাবতীতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম!

সমগ্র রাজস্থান ভ্রমণ করলে একটি কথা মনে আসে। সনাতনী হিন্দুদের অধিকার বোধ এবং জৈনদের প্রভাব এবং প্রতিভা। রাজস্থানে বৌদ্ধপ্রভাব কম। সব জায়গায় দেখেছি জৈন স্থাপত্যের পাশে হিন্দু-স্থাপত্য এসে জায়গা দখল করেছে। এক একটি দল বানিয়েছে তাদের পছন্দ মত উপকথা, প্রবাদ, স্বপ্নাদেশ, রূপকথা

ইত্যাদি। কেউ হার মানতে চায় নি। কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে প্রত্যেকে আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়েছে। ঐক্য এবং সংহতি সৃষ্টি করেছে। একটির সঙ্গে অন্যটিকে মেলাবার চেষ্টা পেয়েছে। অভিমান জানিয়ে কেউ সরে যায় নি।

অদূরে নীলকণ্ঠ মহাদেবের রক্তবরণ মন্দিরটি চোখে পড়ছে। বিরাট পাহাড়ের দেওয়াল ঘিরে রয়েছে। দূব উচ্চে "গুরু শিখরটি" দেখা যাচ্ছে—যেটি আবু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তার নীচে চির-রহস্য ছায়ার আভাস দিচ্ছে অসংখ্য গুহাগহ্বরের দল! কোনও কোনও বৃহৎ পাথরখণ্ড যেন মনুষ্যাকার লাভ করেছে। হঠাৎ মনে হয় যেন জটাজুটধারী নির্বাক মুনি ঋষিরা সামনে দাঁড়িয়ে। এমনই বিস্ময়কর পাথরের মনুষ্যাকার দেখেছিলুম একদা হিমালয়ের কুলু ও মানালীর পথে।

নীলকণ্ঠ মন্দিরের অঙ্গনে ছায়াচ্ছন্ন বিটপীর নীচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে মৃদুমন্দ ঘণ্টার টুংটাং শব্দে তন্দ্রা জড়িয়ে এসেছিল দুই চোখে। অদূরে একটি টিলাপাহাড়ের উপর অহর্ভুজার মন্দিরটি দেখা যাচ্ছিল।

আমার দিল্লী যাবার সময় হয়ে এসেছিল। কিন্তু দিলওয়ারার দেশের কথা শেষ করার আগে আর দু-একটি সংবাদ দিয়ে যাই। এখানে গোমুখ পাহাড় ছাড়িয়ে দূরে গেলে 'হনুমান' মন্দিরটি দেখে আসতে হয়। বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে গেলে তবে শক্তির প্রতীক হনুমানের সাক্ষাৎ মেলে। বলতে ভুলেছি, আবু পাহাড়ে আসবার পথে জীবন্ত হনুমান প্রচুর। এই মন্দিরের অঞ্চলে নাকি প্রতি বছরে এক একটি সময়ে হঠাৎ একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কোথা থেকে যেন একটি মন্দিরের "নিশানা" হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। এই সময় তীর্থযাত্রীরা তাদের মনস্কামনা জানাতে থাকে। কামনা পূর্ণ হয় কিনা সে খোঁজ আমি

করি নি। তবে এটি জেনেছি প্রতি বছর ভাদ্র আশ্বিনে এখানে একটি মেলা বসে।

গোমুখের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র মন্দিরটি "অগ্নিকুণ্ড" নামে খ্যাত। অনেকে বলে এই অগ্নিকুণ্ডে সামরিক রাজপুতগণের জন্ম ঘটে, এবং এই অগ্নিকুণ্ডেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে ভস্মীভূত করেন। এই অঞ্চলের অদূরে একটি "বৈষ্ণব" মন্দিরের নিকটে যে পবিত্র বৃষভ-নন্দী আসীন, তিনিই নাকি একদা আবু পাহাড় সৃষ্টি করেন, গুরু-শিখর তাঁরই স্কন্ধপৃষ্ঠ। এই নন্দীটি একদা নাকি একটি গহ্বরে পড়ে যায়। রাজস্থানের নদী সরস্বতী তাঁর প্রবাহকে নিয়ে আসেন নন্দীকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু সেই প্রবাহে বন্যার সৃষ্টি হয়। তখন দেবতারা দেবাদিদেব হিমাচলের নিকট আবেদন জানান। হিমাচল পাঠিয়ে দেন তাঁর বিশালকায় ভুজঙ্গ অর্বুদকে। অর্বুদ বলেন, আমি এই বিরাট বৃষভকে পাহাড়ের উপর অবশ্যই তুলে আনতে পারব, কিন্তু তার বিনিময়ে এই পাহাড়ের সঙ্গে আমার নামটি চিরকালের জন্য যুক্ত রাখতে হবে! অর্বুদের অপভ্রংশ আবু!

বিদায় নেবার সময় আবুর কানে কানে বলে এলুম, তুমি থাক এই নিভৃত কোণে একান্তে আপন বিস্ময় নিয়ে। রাজস্থানের চারিদিকে বিপুল মরুসাগরের মাঝখানে দেববালার মত তুমি পারিজাত পুষ্প শোভিতা হয়ে এই বিজন বনপর্বতচ্ছায়ায় হাসিমুখে বসে থাক।

তোমাকে মনে রাখব চিরদিন!

॥ শিপ্রা থেকে বেত্রবতী ॥

সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'উৎজেনীয়' ছিল কিনা আমার সঠিক জানা নেই। যিনি জয় করে ফেরেন, বা সর্বজয়ী— তিনিই বোধ করি 'উজ্জেনীয়'। উজ্জয়িনী নামটির উৎপত্তি সম্ভবত সেইখানে। মালোয়া রাজ্য ঘুরে সম্প্রতি আমি এসে পড়েছি অবন্তীদেশে।

এরা এককালের রূপকথার রাজ্য। ছোট ছোট সংখ্যাতীত রাষ্ট্র—যারা প্রাচীন যুগে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন—তারা ছিল আপন-আপন এলাকায় স্বতন্ত্র। এদের নিয়ে ছিল রূপক, উপকথা, কথকতা, প্রবাদ এবং নানাবিধ লোকসঙ্গীত, শ্রুতি ও স্মৃতি। পৃথিবীর নানাদেশে ভারতকে বলা হয়, রূপকথার রাজ্য, "land of the fairy tales, land of the winged angels, flying horses and peacock-princes." তামিলনাড, মহীশূর, হায়দারাবাদ, এমন কি যে-রাজ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলতে এখনও উল্লেখযোগ্য বড় কিছু পাওয়া যায় না—সেই পাঞ্জাবেও আছে এই সব উপকথা-রূপকথা। পৃথিবীর চোখে ভারত হল মস্ত এক বিস্ময়। ব্রেজিল-আফ্রিকাতেও বিস্ময় আছে—কিন্তু সেই বিস্ময়কে ধরে রেখেছে সিংহের মুণ্ড বা নরখাদকের তীরের ফলক, অজগর সাপ আর নয় তো নগ্নদেহ আদিবাসী, নয় তো বা বিজন ভীষণ প্রকৃতির ভয়াল রূপ। এদের কিছু কিছু ভারতেও আছে, তবে এখানে নরখাদকদের সঙ্গে লড়াই নেই। কিন্তু এসব ছাড়াও ভারতে যা আছে পৃথিবীর কোনও দেশে তা পাওয়া যায় না। বিদেশী পর্যটক যারা আসে তারা সব শেষে দেখে যায় ভারতের দুই-চারটি শহর। শহর মাত্রই একটি অন্যটির অল্পবিস্তর

নকল। মাদ্রাজ বা বোম্বাই—দুইয়ের প্রকৃতির মধ্যে তফাত কম। কটক দেখলে বর্ধমান মনে পড়ে। পুরনো দিল্লী আর কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। অমৃতসরে গেলে লুধিয়ানা চোখে ভাসে। দার্জিলিঙের পাশে শিমলাকে বসাও, বিদেশী পর্যটকের চক্ষু ক্লান্তিতে ভরে আসবে।

কিন্তু এককালের কাশী-কাঞ্চীর মধ্যে প্রকৃতিগত তফাত ছিল। যেমন তফাত আজও দেখতে পাওয়া যাবে মহাকোশলের সঙ্গে অবন্তীদেশের। আজও গোয়ালীয়রে দেওয়াসে কোটায় ভূপালে শিবপুরীতে—ইন্দোর এবং উজ্জয়িনীতে অথবা সাউ-মাণ্ডুর দূর বনপথের আশে পাশে বিজন নির্জন নদীতীরবর্তী প্রাচীন কীর্তিকলাপের মধ্যে রূপকের কাহিনী নানা চেহারায় লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর কোনও ভূভাগে এমন লক্ষ লক্ষ রূপক গল্প মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে না, কল্পনার এমন আশ্চর্য অভিব্যক্তি আর কোথাও নেই, এমন স্বপ্নিল রোমাঞ্চ আর কোথাও বাস্তবের স্পর্শলাভ করে নি—যেমনটি ঘটেছে ভারতবর্ষে! একে সাহায্য করেছে একদিকে ইতিহাস, অন্য দিকে ভৌগোলিক প্রকৃতি। এদেশে সর্বাপেক্ষা বিষধর সর্প মানুষের হাতে পোষ মানে, নদী তীরবর্তী তপোবনের ক্ষুদ্র কুটীরে মহাজ্ঞানী মনীষীর দেখা মেলে, প্রবল হিংসার বিরুদ্ধে সর্বত্যাগী প্রেম এখানে দাঁড়িয়ে ওঠে, রাজমুকুট ফেলে দিয়ে রাজপুত্র এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, অতিথি নারায়ণের প্রার্থনা পূরণে এদেশের সূর্যপূজারী দাতাকর্ণ আপন শিশুপুত্রের মুণ্ডদান করে! বিচিত্র এই ভারত!

অবন্তীদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল বোধ করি উজ্জয়িনী। অনেকে বলে, কাশী-কাঞ্চী-কোশলের মত উজ্জয়িনীও ভারতের প্রাচীনতম নগরীর একটি। অবন্তীর সুপ্রাচীন নাম ছিল অবন্তিকা-পুরী। উজ্জয়িনীর পাশ দিয়ে যে আঁকাবাঁকা নদীটি বয়ে চলেছে, পুরাকালে তার নাম ছিল সম্ভবত ‘ক্ষিপ্রা’—এখন হয়েছে ‘শিপ্রা।’

শিপ্রার শব্দগত অর্থ বোধ হয় নেই। অবন্তিকাপুরীর এবং উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট অশোক। এখন উজ্জয়িনীর একটি বড় রাস্তায় একটি সিনেমা হাউসের নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক'। অশোক আজও প্রতি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোরে।

কথিত আছে পৌরাণিক যুগে একদা মহেশ্বর শিব ত্রিপুর নামক এক রাক্ষসকে এই উজ্জয়িনীতে বিনাশ করেছিলেন। এ অঞ্চলে অসুরশক্তি প্রবল ছিল বলেই বোধ করি দেবাসুরের সংগ্রামের কাহিনী এখানেও শোনা যায়। দানব ও দেবতাদলের সেই সংগ্রামের কালে যখন একটি অমৃত-পরিপূর্ণ স্বর্ণকলস সমুদ্রের তল থেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন সেটি নিয়ে দেবতা এবং অসুরগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে উক্ত অমৃত-কলসের থেকে কয়েক বিন্দু অমৃত এখানে ওখানে যে চারটি স্থানে ছিটকে পড়ে সেই স্থলগুলির নাম হল, উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার এবং প্রয়াগ। অবশেষে অপ্সরাকুলপতি জয়ন্তদেব এই কলসটি নিয়ে স্বর্গলোকে পালিয়ে যান এবং সেখানে দেবতারা কলসভরা সুধাপান করে অমৃতত্ব লাভ করেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট হর্ষবর্ধন পূর্বোক্ত চারটি স্থলে প্রতি তিন বছর অন্তর-অন্তর একটি করে কুম্ভমেলার প্রবর্তন করেন। এই নিয়মটি আজও অর্থাৎ বিগত বারো শত বৎসর ধরে চলে আসছে। এই কুম্ভমেলার আপাতরূপ হল ধর্মীয়, কিন্তু এটি ভারত রাজনীতির একটি অঙ্গ। সম্রাট হর্ষবর্ধন জনজীবনের সঙ্গে যে ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন, ভারত ইতিহাসে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। তিনি তদানীন্তন ভারতের সকল মতবাদ-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতিবোধ আনার জন্য এই বৃহৎ মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। এই মেলায় মিলেছিল সেদিনকার আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাত্য, মিলেছিল শক আর হুন, মিলেছিল সনাতনী ব্রাহ্মণ সভ্যতার সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি। হর্ষবর্ধনের কালেই এসেছিলেন হুয়েন সাঙ। ভারতের ইতিহাস

তিনিই প্রথম লেখেন। তাঁর স্মৃতিকথাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

সম্রাট অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল। পরে এল শুঙ্গবংশ—তারাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। অতঃপর ইতিহাসের অন্ধকার যুগের আরম্ভ। এই অন্ধকারে হাতড়িয়ে ইতিহাসের অনেক কাহিনীকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। অতঃপর খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীব্যাপী গুপ্তসাম্রাজের কাল হল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ সেই-যুগে সগৌরবে দাঁড়িয়েছিল এই উজ্জয়িনী আর অবন্তিকাপুরী। এখান থেকে ওঠে শিল্প সাহিত্য কাব্য ভাস্কর্য স্থাপত্য ঃ এখান থেকে আরম্ভ হয় আবার একটা নতুন সভ্যতা। এই সভ্যতারই উত্তরসাধক হলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন। হুয়েন সাঙ সম্রাটের দানশীলতার মহিমা বর্ণনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আপন নাম নিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য। উজ্জয়িনী ছিল তাঁর রাজধানী, বিশাল ছিল তাঁর সাম্রাজ্য শিল্প ও ললিতকলায় অসামান্য তার অনুরাগ ; সঙ্গীত ও কাব্যকলায় তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে খুঁজে বার করলেন। মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শঙ্ক, বেতাল-ভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ নয়জন নবরত্ন স্বরূপ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। সংস্কৃত নাট্যে ও কাব্যে উজ্জয়িনীর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বিক্রমাদিত্য বিক্রমশতকের প্রবর্তন করেছিলেন !

আধুনিক উজ্জয়িনীর 'গ্রাণ্ড হোটেলে' উঠেছিলুম। হোটেলটি সুবৃহৎ। নীচের দিকে ফুলবাগান। সামনেই 'টাওয়ার ক্লক,' অর্থাৎ ঘণ্টাঘর। হোটেলের খানসামারা পরিচ্ছন্ন ইংরাজীতে কথা কয়। বুঝতে পারা গেল বিদেশী ট্যুরিস্টরা এখানে ওঠে। দৈনিক তিন টাকায় সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত একটি ঘর পাওয়া গেল। অদূরে একটি রেলওয়ে পুল।

সেই পুল পার হয়ে গেলে শহরের মধ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। বলাবাহুল্য স্থানকাল অনুসারে আমি একটু ইংরেজী মেজাজে ছিলুম।

ইতিহাসে এ খবরটি আভাসে পাওয়া যায়, আড়াই হাজার বছরের আগে থেকে এই উজ্জয়িনী, তদানীন্তন অবন্তী,—একটি রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বহন করছে। বোধ করি আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। শহর ছোট নয়, এবং বাজার বেশ বৃহৎ। এসব বাজারে মহাজন যাঁরা তাঁরা প্রধানত মারোয়াড়ী। তবে এদের মধ্যে বিভক্তি আছে কিছু। কৃষ্ণভক্ত জৈনী, শাক্ত—এবং শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী কিন্তু এ নিয়ে আমি বেশী দূর এগোতে চাইনে, কেননা অতটা আমার জানা নেই। পাঞ্জাবেরও একটা অংশ আছে যেটা রাজপুতীয়। তারা মাছ-মাংস খায়, শিব এবং কালীপূজো করে। তাদের নিয়ে আমি ঘর করেছি অনেকবার। বিহার শরিফের পথে 'পাওয়া পুরি'র বিশাল জৈনমন্দিরে যাদের দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে রাজস্থানের নাথদ্বারের রণছোড়জির জৈনদের মেলে না। মারোয়াড়ী এখন শুধু একটা সাধারণ সংজ্ঞা। জলের অভাবে এরা নিজেদের দেশে থাকতে পারল না—অথচ এরা সমস্ত ভারতে জলছত্র বানিয়ে সকল মানুষকে জলপান করিয়ে বেড়াল। এমন অধ্যবসায়ী সহিষ্ণু, অজাতশত্রু ধনবাদী, আত্মীয়-বন্ধুবৎসল এবং দানশীল মানবশ্রেণী পৃথিবীর যে কোন দেশেই কম। উজ্জয়িনীর এ-বাজারে ও-বাজারে প্রতিদিন ঘুরেছি। অগণিত মারোয়াড়ীর জনজটলার ভিতর দিয়ে আনা-গোনা করেছি, কিন্তু এক ব্যাক্তিকেও ক্রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলতে দেখি নি। কলকাতার বড়বাজারে মারোয়াড়ী মহলে কখনও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তি দেখা দিয়েছে এমন খবর আজও কানে ওঠে নি। এদের ঐক্যবোধ অনন্যসাধারণ।

প্রাচীন দিনের ভারতের একটি টুকরো এসে দাঁড়িয়েছে যেন শিপ্রাতটবর্তী রামঘাটের প্রান্তে। এটি দেখে গোদাবরী তীরবর্তী নাসিকের ঘাটটির কথা মনে পড়েছিল। আমার মন তখন ছোঁক

ছোঁক করছে অবন্তীদেশের হৃদয় সন্ধানের জন্য। কিন্তু সেই রূপটি কোথায়? মন খারাপ হচ্ছে আধুনিককালের বাজার হাট দেখে। বাজার মানেই তো কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ আর দিল্লী। একটি শহর অন্যটির অনুকরণ। সেই ঘিঞ্জি জনবসতি, ভিতরে ভিতরে সেই নোংরা বস্তী। বোম্বাই সিনেমার ছবি দেখাবার জন্য পথে-পথে সেই বাজনাবাদ্যসহ প্রচারপত্র বিলি। সেই লাউড স্পীকারের কদর্য চিৎকার।

আসামের কামাখ্যা মন্দিরের ভিতরে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে দেখেছিলুম সতীদেবীর পীঠস্থান। এখানে মহাকালেশ্বর মন্দিরে ঢুকে ঠিক সেই দৃশ্যটি মনে পড়ছিল। এই মন্দিরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত। এখানেও সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। একটি রৌপ্যপট্টের উপরে জ্যোতির্লিঙ্গটি দাঁড় করানো। ভিতরটি স্ফটিক-বিচ্ছুরিত আলোয় কিছু স্বচ্ছ—অতটা অন্ধকার মনে হয় না! এর পিছন দিকে রয়েছে শ্বেতমর্মর নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পার্বতীমূর্তি। এমনটি দেখেছিলুম বৈদ্যনাথ ধামে! এই ঘাটে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করা হয়।

যেমনটি কাশীতে দেখা যায়। মেয়েদের হাতে ও গলায় বেশ মোটা মোটা গহনা। পরনে লাল এবং হলুদ রঙেব ঘাগরা এবং ওড়না। হাতে ও পায়ে মেহেদিপাতার রংয়ের ছোপ। চুমকি বসানো পরিচ্ছদ—তারা ঘট নিয়ে গান গেয়ে যায় রামঘাটের দিকে—যেমনটি দেখা যায় কাশী কিংবা ঝাঁসিতে। ঘাটে গিয়ে মেয়েরা জ্বালায় ধূপ, এবং প্রদীপ জ্বেলে শিপ্রার উপরে ভাসিয়ে দেয়। অনেক রাঙা বস্ত্রের টুকরোয় ফুল বেলপাতা এবং নারিকেল বেঁধে ভাসিয়ে দেয়। এই নারকেল তারা আনায় দূর দেশ থেকে। শিপ্রার ঘাটের কাছে কচ্ছপরা দল বেঁধে এগিয়ে আসে। ময়দার টোপ পাকিয়ে তাদের খাওয়ানোটা পুণ্যকর্ম।

মহাকাল মন্দিরটি দেখলে হঠাৎ অতি প্রাচীন বলে মনে হয় না!

অথচ ইতিহাসে দেখছি বহু শতাব্দী এর উপর দিয়ে চলে গেছে। প্রায় সাতশ বছর আগে এই মন্দিরটিকে একবার প্রায় ধ্বংস করাই হয়েছিল। অতঃপর বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

একটি শ্বেত পাথরের চালচিত্রের মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি দেখে তারিফ করেছিলুম। এটি গোপাল মন্দির। এটিও প্রায় একশ তিরিশ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরগুলি দেখে-দেখে বেড়াচ্ছিলুম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জয়পুরের মহারাজা জয়সিং যে পাঁচটি মানমন্দির পাঁচটি নগরে নির্মাণ করেছিলেন, উজ্জয়িনী তারই একটিকে বহন করছে। অতি নিখুঁত আঙ্কিক গণনার দ্বারা যে গম্বুজ এবং দেওয়ালগুলি তিনি নির্মাণ করেছিলেন, আজও উদয়াস্ত-কালের মধ্যে সূর্যের সেই ছায়া এই মানমন্দিরের নির্ভুল সময়টি ও গতিটিকে নির্দেশ করে। সূর্য-চন্দ্রের গতি প্রকৃতি, চন্দ্র গ্রহণ ব্যাপারের সঠিক হিসাব ও গণনা, সমস্ত মিলিয়ে এই বনবাগান ঘেরা মানমন্দিরকে একটি সত্যিকার আকর্ষণীয় বস্তু করে রেখেছে।

আরেকটি ছোট্ট কারণের জন্য উজ্জয়িনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এককালে ভারতীয় ভৌগোলিকরা সূর্যক্রান্তির পথে পৃথিবীর যে-মধ্যাহ্নকালীন মধ্যরেখাটির অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির পথ হিসাব করেছিলেন, সেই মধ্যরেখাপথ বিদিশার উপর দিয়ে এসে চলে গিয়েছে এই মহাকাল মন্দিরটির জ্যোতির্লিঙ্গের উপর দিয়ে। সম্ভবত বহু শতাব্দী পূর্বে এই গণনা এবং হিসাব করেই শিবের তৎকালীন উপাসকরা ঠিক এইখানেই জ্যোতির্লিঙ্গের স্থাপন করেন। মহাকালের কাছাকাছি যেটি মর্মরপ্রস্তরবেষ্টিত সরোবর—তারই কাছে রয়েছে মহাকালেশ্বরী—তিনিই ভিন্ন নামে দেবী অবন্তিকা।

শিপ্রার অপর পারে সেদিন দেখেছিলুম যে বিরাট সন্ন্যাসীর আশ্রম সেটির নাম "দত্তখারা।" এখানে সংসার বিরাগী ব্রহ্মচারীদের

বসবাসের স্থল। জীবন সম্বন্ধে যারা প্রশ্ন তোলে, যারা বলে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, যারা ঈশ্বর সংশয় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, এই "দত্তখারা" তাদের জন্য। সাধুসজ্জন, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, শাস্ত্রী, বেদপন্থী, দার্শনিক—ইত্যাদি যারা অদ্বৈতবাদী, তারা এখানে স্বচ্ছন্দেই বসবাস করেন।

নদীতটে ধর্মরাজ মন্দির। কিন্তু মন্দির ওখানেই শেষ নয়। প্রাচীন যেগুলি, সেগুলির মধ্যে ওঙ্কারেশ্বর স্বপ্নেশ্বর প্রভৃতি দেবস্থানগুলি প্রসিদ্ধ। অন্যান্য মন্দিরও আছে, কিন্তু তারা হাল আমলের।

আমার বিদায় নেবার দিন এগিয়ে এসেছিল। সেই কোন্‌কালের অবন্তীদেশের হাওয়া বোধ হয় বইল না আমার মনে। যে-বস্তুর আস্বাদ এই উজ্জয়িনীর পথে ও পথের প্রান্তে পেতে এসেছিলুম তা পেলুম কিংবা পেলুম না, অতটা তলিয়ে দেখি নি।

কিন্তু যেটি পেলুম সেটি অসামান্য হলেও সেটিতে মন ভরল না। সেই অনাদি অনন্তকালের ধারণা আমাদেব কল্পনায় বাসা বেঁধে থাক। সেটি এখানে নেই, সেটি আছে কোথায় তাও জানলুম না। বাইরে যেটি দেখে গেলুম সেটি একালেব একটি নগর। সেই নগরের সম্প্রসারণ ঘটছে এখানে ওখানে। পুরাতন কাল তার সমস্ত রাজ্যপাট একে একে তুলে নিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে! আমি একদিন বিদায় নিলুম।

ভূপালের পাড়াপল্লী পেরিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় আবার এসে গলা বাড়িয়ে দেখে যাচ্ছিলুম চৈত্যগিরির উপরে সাঁচিস্তূপকে। সেই একই দৃশ্য। অবশ্য এবার এলুম চার বছর পরে! সেবার আমার ডায়েরীতে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা সকৌতুকে লিখে রেখেছিলুম, সেটি বলি। সেটি ৮ই জনুয়ারী, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাঁচিতে উপস্থিত রয়েছেন। চৈত্যগিরির ঠিক নিচেই সমতল প্রান্তরে কলেক্টরের বাংলোয় তিনি

উঠেছেন। সেদিনকার সেই বিরাট রাজকীয় সমারোহ এবং রাষ্ট্রপতির সেই বিশাল প্রান্তরব্যাপী শোভাযাত্রা না দেখলে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপকে বোঝা যেত না! ঘণ্টা দুই আমি অবাক হয়ে ছিলুম। এক সময় ইচ্ছা হল, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কেমন হয়? সেই অনর্গল জনস্রোত এবং আনুষ্ঠানিকপর্বের ভিতর দিয়ে মধ্য প্রদেশের রাজপুরুষগণকে এড়িয়ে আমি এক সময় গিয়ে পৌঁছলুম মেজর জেনারেল যদুনাথ সিংয়ের কাছে। সেদিন সাঁচিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলুম, সুতবাং মেজর জেনারেল আমার দর্শন-প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর বেলা চারটার পর যখন রাষ্ট্রপতি ভিতর থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে গাড়িতে উঠবেন, সেই অবকাশটুকুর মধ্যে আমি তাঁর সামনে গিয়ে নমস্কাব করে দাঁড়ালুম। তাঁর পোশাক অতি সাদামাটা। একটি পুরনো লম্বা খদ্দরের লংকোট, পরনে ধুতি, এবং মাথায় টুপি। পরিচ্ছদে কোনও পারিপাট্য নেই, দেখে ভাল লাগল। বুঝতে পারা গেল ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রপতি এ-দুজন এক নয়। রাষ্ট্রপতির এই বিরাট সমারোহের মধ্যে ভারত রাষ্ট্রের আত্মাভিমান থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিটি হল নিরভিমান। এঁকেই আমার দরকার ছিল। পরে যখন তাঁকে সামান্য একখানা জিপ গাড়িতে ঘুরতে দেখলুম, আমার আরও ভাল লেগেছিল।

পরিষ্কার বাংলায় আমার কথাবার্তা আরম্ভ করতেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটু সচকিত হলেন। আমার আলাপটুকু আগেই স্থির করে রেখেছিলুম। সেটি এই। প্রায় আড়াই বছর আগে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে আমার "মহাপ্রস্থানের পথে" তথা "যাত্রিক" নামক সিনেমা চিত্রটি দেখে রাষ্ট্রপতি বিশেষ তারিফ করে নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র দেন। আমার আলাপ করার কালে সেই কথাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে আমার পরিচয়টুকু দিলুম। তিনি বেশ সহজ বাংলায় জানালেন, ছবিটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ

হয়েছে এবং তিনি এটি বিশেষভাবে স্মরণে রেখেছেন। কেদারবদরী দর্শনে যাবার তাঁর বিশেষ বাসনা। এ বইখানি যে পঁচিশ বছর আগে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এটি শুনে তিনি আনন্দিতই হলেন। পাশে দাঁড়িয়ে মেজর জেনারেল আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ছবিটি তিনিও দেখেছিলেন। আমি শুধু বলেছিলুম, জীবিত কোনও লেখকের জীবনের একটি টুকরো নিয়ে ছবি ভারতে এই প্রথম। অতঃপর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি বদরীনাথ তীর্থ দর্শনে যান।

আশপাশে কিছু কিছু লোক বোধ করি ঈষৎ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে থাকবে। সুতরাং আমি পুনরায় রাষ্ট্রপতিকে নমস্কার জানিয়ে আবার ভিড়ের মধ্যে এসে তলিয়ে গেলুম। হঠাৎ দেখি কয়েকটি লোক একটু প্রসন্ন হয়ে আমাব হাত ধরে টেনে এনে মস্ত সমিয়ানার তলায় বসিয়ে চায়েব পেয়ালা ও বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিল।

আজ সাঁচি জনশূন্য। মাঠের ধাবে শুধু একটি হোটেল। সেখানে এক আধজন পর্যটক যদি ছিটকে আসে তবে সেই হোটেলের পরিচালক নাসের খান আহার ও বাসস্থান যুগিয়ে তাদের পরিচর্যা করে। চাব বছর পরে আবার সেদিন এক পাক ঘুরে এলুম সাঁচি-স্তূপেব ওপব। ওখানে নতুন মন্দিরে ঢুকতে গেলে এখন আট আনা দক্ষিণা লাগে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যে বোধি-বৃক্ষের চারাটি পুঁতেছিলেন সেটি এখন আরেকটু বড় হয়েছে! এখন প্রতি বছর একবার মাত্র সারিপুত্ত আর মহামোগ্‌গলানার্ অস্থিখণ্ড দেখান হয়ে থাকে! মন্দিরের মেঝের নীচের দিকে ভূগর্ভের মধ্যে ইদানীং সেই অস্থি লোকচক্ষুব অন্তবালে রাখা হয়। আর একবার সাঁচিস্তূপের সেই বিরাট ও কালজয়ী মহিমার আশপাশে কয়েক ঘণ্টা ঘোরাফেরা করে অপরাহ্নের দিকে এসে ট্রেনে উঠলুম।

ঝাঁসি আসবার উৎসাহ ছিল না। কিন্তু আসতেই হল। বিশ বছর আগেকার যে-ঝাঁসি, আজ সেই ঝাঁসি নেই। একদিকে

সিভিল লাইন্‌স্‌ যেখানে সরকারী কাছারি, স্কুল কলেজ, কলেক্টরী আর হাঁসপাতাল—অন্যদিকে সাবেককালের সেই পুরনো নোংরা, ঘিঞ্জি ঝাঁসি। ঝাঁসি সেকালে মরুভূমির মত রুক্ষ ছিল। ভিস্তিরা পথে পথে জল বিক্রি করে যেত। সরকারী জলের কলে স্নান করে যেত যে-যেমন পারত। সেদিনকার সেই পরিত্যক্ত উপেক্ষিত অনুন্নত ঝাঁসি! ঝাঁসির রাণীর পীতাভ সেই ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকের নোংরা গলিঘুঁজির দিকে তাকালে সর্বব্যাপী অনাদর চোখে পড়ত। রুক্ষ মাঠ ধুধু করছে সব দিকে, দরিদ্র হাটতলা—পৃথিবীর সব নোংরা জমেছে নালা আর নর্দমায়! বস্তির মধ্যে মানুষ কিলবিল করত! তাদের ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। ইংরেজের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে সেই ঝাঁসি মনে মনে দগ্ধ হত।

আজকের ঝাঁসি অন্য। আজও পুরনো শহরে ধূলোয় ধূলোয় অন্ধকার, কিন্তু চেহারা ভিন্নপ্রকার। আজ জনতায় ভরে গেছে ঝাঁসি। পুরনো টাঙ্গা আছে, কিন্তু সাইকেল রিক্‌শা এসেছে। মোটরকার ছুটছে অগণ্য, এবং দুর্গপ্রাকারের নীচে মোটরবাসগুলো হাঁস-ফাঁস করছে সর্বক্ষণ। হোটেল, বাজার, কাফিখানা, কাজ-কারবার বিকিকিনি—চারদিক যেন থইথই করছে। ঝাঁসি আজও উত্তর প্রদেশের মধ্যেই রয়ে গেছে এবং উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে ঝাঁসি যেন ঝুলে রয়েছে।

সেই ঝাঁসি। দূরে দূরে অজানা গিরিশ্রেণীর বেষ্টন, গহন বন-ভূমি, এবং তার ভিতরে ভিতরে গিরিদরি—এরা শুধু রহস্যভরা নয়, সঙ্কটসঙ্কুলও বটে। এদেরই ভিতরে ভিতরে আত্মগোপন করে থাকে তারাই, যাদেরকে সহজ ভাষায় বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। তাদেরই বৃহৎ একটা অংশ আজও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নি, সমাজজীবন মানে নি, দেশোন্নয়নের কোনও কর্মে নিজেদেরকে সংযুক্ত করে নি। বৃহত্তর ঝাঁসি আজও তেমনি 'ডাকাতের দেশই' হয়ে রইল। কিন্তু সেই ডাকাতরা যে কোনদিন বিদেশী বিজেতাদের

কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, এমন খবরও পাওয়া যায় না। তারা আপন 'রাষ্ট্রসীমানার' মধ্যে কোনও বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় নি। চারটি নদী—বেতোয়া, সিন্ধু, চম্বল ও পার্বতী—এই চারটি বেষ্টনীর মধ্যে তারা আজও 'স্বাধীন' জীবন-যাপন করে চলেছে। এদের বীরত্ব ও দুঃসাহসের কাহিনী মধ্যভারতে বা মধ্যপ্রদেশে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে অদ্যাবধি কথিত হয়ে থাকে। তথাকথিত সভ্য জগৎ বা সভ্য সমাজে এরা আজও এসে প্রবেশ করে নি।

ঝাঁসির দুর্গের ভিতরকার 'হামামটি' এককালে আমার ভাল লেগেছিল। উনিশ বছর পরে আর একবার সেটি দেখে যেতে সাধ হল। ওর্ছার রাজা বীরসিং দেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম যখন জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সিংহাসন লাভ করলেন তখন বীরসিং দেও তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং তাঁব প্রিয়পাত্র হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পব তিনি মোগল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবেব সেনাদলেব নিকট তিনি পরাস্ত হন। তাঁর আয়ুষ্কাল কিরূপ ছিল আমার জানা নেই। কিন্তু একথাটি ভেবে বিস্ময় লাগে যে, তিনি প্রথম পুরুষে আকবরের প্রিয়মন্ত্রী আবুল ফজলকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় পুরুষে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। তৃতীয় পুরুষে সম্রাট সাহজহানের কালেও তিনি সুস্থকায় ব্যক্তি। চতুর্থ পুরুষে আওরঙ্গজেবের নিকট তিনি পরাজিত। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব সুদীর্ঘকাল সন্দেহ নেই। সেই কারণে এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের একটি প্রচার পুস্তিকা থেকে কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি:

"He murdered Abul Fazl, the favourite minister of the great Moghul Emperor Akbar...He rose to high favour when Salim ascended the throne as Emperor Jehangir. He was defeated by an army led by Aurangzeb, the last of the Great Moghuls."

এককালে কয়েকটি ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসির দুর্গদ্বারে পাহারায় থাকত। তাদেরই অনুগ্রহের উপর দর্শকদের প্রবেশ নির্ভর করত। তাদেরই একজন আমার একটি ক্যামেরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, সেই কারণে ঝাঁসি দুর্গে আর কোনওদিন আসব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু চাকাটা আজ হঠাৎ ঘুরে গেছে। আজ ট্যুরিস্ট দলের মধ্যে ইংরেজের সংখ্যা খুবই কম—কেননা ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তি দেখতে গেলে ইদানীং এক এক সময় ভারতীয় প্রহরীর কাছে অনুমতিপত্রের আবেদন জানাতে হয়। ইংরেজ-মনোবৃত্তি আজ সেটিকে অসম্মান-জনক মনে করে।

ঝাঁসি দুর্গের বাইরের চেহারাটি এককালে আরক্তিম ছিল, সেটি বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ভিতরের প্রথম অংশটায় জমেছে জঞ্জাল-- চেহারায় এসে গেছে জীর্ণতা। তার চেয়ে বড় কথা, ভিতরে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। ছিল প্রাচীন, হয়েছে আধুনিক। পুরনো ইমারতের কোথাও কোথাও একালের লিণ্টেল্ বসেছে। হঠাৎ চোখে পড়ে সিমেণ্টের পলস্তারা। ভিতরে যে দু-চারটি ঘর-দোর নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলি হাল-আমলের আপিস বাড়ি—নতুন আর পুরাতনে সঙ্গতি রক্ষা হয় নি। এখন এখানে ভারতীয় পল্টনের শিক্ষা দীক্ষা ঘটে থাকে। মাঝখানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তারা কুচকাওয়াজ করতে শেখে। এটি এখন একটি ব্যায়াম অভ্যাসের কেন্দ্র। ভিতর মহলে তাদের মস্ত আবাসিক ব্যবস্থা।

কই, সেই 'হামামটি' দেখতে পাচ্ছিনে--যার ভিতরকার স্ফটিক বিচ্ছুরিত আলোকে গঙ্গাধর রাওয়ের স্ত্রী রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোলাপের সুগন্ধি নির্যাস মিশ্রিত স্বচ্ছসলিলে অবগাহন স্নান করতেন। সেই স্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়াময় স্বল্পালোকিত 'হামামটি' আর খুঁজে পাচ্ছিনে। না, তার চিহ্ন কোথাও নেই! জিজ্ঞাসা করলুম এখানে ওখানে। কই, খবর রাখে না কেউ। "ভবানীশঙ্কর" নামক বৃহৎ কামানটি পড়ে রয়েছে যেন মস্ত এক মৃত লৌহদেহ! 'নীচের দিকে রয়েছে

সেই প্রখ্যাত শিবমন্দির—যেখানে তরুণী লক্ষ্মীবাঈ মাথায় করে আনতেন পূজার উপচার। আজও রয়েছে সেই 'গণেশ-তোরণ'—যেখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত তরবারিহস্তে রণোমত্ত অশ্বপৃষ্ঠে অসমসাহসিক অশ্বারোহী। পুষ্পোদ্যানটি এখনও মুছে যায় নি। উপর দিকে রয়েছে সেই দুর্গপ্রাকার প্রান্তের বিশেষ স্মৃতিস্থলটি—যেখান থেকে রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর পালিত পুত্রটিকে বুকের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেপরোয়া উন্মাদিনীর মত অগাধ নীচের দিকে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পলায়নের কালে। ঘোড়াটি বাঁচে নি। সেই ঘোড়ার মর্মর মূর্তিটি চারিদিকের শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে আজও রয়েছে দাঁড়িয়ে। এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনলে একালেও মন শিউরে ওঠে। দুর্গের নীচের দিকে রয়েছে কয়েকটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য বস্তু। একটি হল গঙ্গাধর রাওর আমলের ফাঁসির মঞ্চ, অন্যটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে গোয়ালীয়র দুর্গে গিয়ে পৌঁছবার অন্ধকার পথ।

হঠাৎ পল্টনদের দলের একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। যুবকটি বাঙ্গালী, বাড়ি বাঁকুড়ায়। তার কাছেই শুনলুম এখানকার পল্টনে কয়েকজন বাঙ্গালী সৈন্য আছে। তারা এখানে আপন-আপন যোগ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছে। রাইফেল প্র্যাকটিসে তাদের 'লক্ষ্য' বেশ নির্ভুল। আনন্দের কথা এই, আহার রুচি অভ্যাস বসবাস এবং জীবনধারণের ব্যাপারে বাঙ্গালীর দলটি সর্বভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেছে। এটি সুখের কথা। কেননা সাধারণ যুক্তি বলে, আমরা সর্বাগ্রে ভারতীয়, পরে বাঙ্গালী!

নতুন ঝাঁসি আধুনিক। পুরাতনের পাশ কাটিয়ে নতুন ঝাঁসি এবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নগর সম্প্রসারণের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। কেউ বসে নেই। বুক চাপড়াচ্ছে না কেউ। কথায় কথায় কোনও দল মিছিল বার করে মুখ্যমন্ত্রীকে কামড়াতে চাইছে না। কাজ বড় হচ্ছে, কচকচি চলছে না কোথাও। বিশ বছর আগেকার

সেই মূঢ় অশিক্ষিত এবং আদিমযুগীয় জীবনযাত্রাটা আর চোখে পড়ছে না। এখন এরা বসে গেছে নতুন জীবন নির্মাণের কাজে। এদের নতুন উৎসাহ এবং নবতম পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

পুরনো ঝাঁসি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে এবার—দেখতে পাচ্ছি। আঘাত হানছে নবযুগের মন এখানে ওখানে।

বস্তির ভিতর দিয়ে টাঙ্গাগাড়িখানা চালিয়ে এসে পৌঁছলুম সেই "রাণী তালাও-র" ধারে। সেই বিশাল স্বচ্ছসলিল সরোবরটির ছোট ছোট উর্মিমালা আজও বায়ুসঞ্চালনে থইথই করছে। পাশেই সেই কালীমন্দিরের চত্বর—সেই কাঁসরঘণ্টা মুখরিত সরোবরের বাঁধানো ঘাট। সরোবরের চতুর্দিকে প্রস্তর-গম্বুজের মত এক একটি ছায়াসন। ওদিকে শিবমন্দির। চারিদিকের সজল কোমল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ভারত ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের হৃদয়টি যেন উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

বৃক্ষলতার ছায়ার নীচে বসলুম কতক্ষণ। হাওয়া উঠেছে ফুর-ফুরিয়ে। দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমের দূর-দূরান্তর। মন্দিরের ভিতর পূজারীর মৃদু মন্ত্রোচ্চারণ এখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলুম। আমার তাড়া ছিল না। দেখতে বেরিয়েছিলুম অবন্তী দেশ। এসে পৌঁছলুম বুন্দেলখন্দের পশ্চিমপ্রান্তে বেত্রবতীনদীতীরস্থ ঝাঁসির এলাকায়। সুতরাং এই ছায়া নিরিবিলি গাছের তলায় ঘণ্টা দুই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকা ভালই লাগছিল।

॥ পায়ে পায়ে ॥

পূর্ব রাজস্থানে হেমন্তের হাওয়া উঠেছিল। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রাতের দিকে। ঘুমের ঘোরে গা থেকে চাদরখানা সরে গেলে একটু কুঁকড়ে শুতে হয়। আজমেরের দিকে যাচ্ছিলুম।

আজমের এখনও দূরে। কিন্তু জয়পুরে আজও, অর্থাৎ উনত্রিশ বছর পরেও, সেই প্রাচীন রোমাঞ্চ নিয়ে আসে! এই নগরীর রঙ্গীন বর্ণবৈচিত্র একদা আমার তরুণ মনকে পেয়ে বসেছিল, সে কথা ভুলি নি। আজ ভয় হল, আধুনিককালের নগর সম্প্রসারণের হুজুগে জয়পুরের সেই বর্ণাঢ্যতার সর্বনাশ হয়েছে কিনা। জয়পুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বহুবর্ণা রূপনগরীর সার্থক পরিকল্পনা এবং এই নগরীর প্রতি-অঙ্গ নির্মাণের মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যের সমাবেশ!

নেমে এলুম জয়পুরে। সময় ছিল না নামবার, দরকার ছিল না নতুন করে কিছু জানবার। কিন্তু পুরনো বন্ধুর বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে যাওয়া মন্দ কি? সেইজন্য জহুরী বাজারেব ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরার সময় নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করছিলুম, ভাল আছ তো? সেই তুমি আর আমি, সেই হাওয়া মহল আর নাহাবগড়, সেই সুপ্রাচীন অম্বর আর সেই গল্‌তা যাবার পথ—তোমরা ভাল তো? মাঝখানে গিয়েছে কত দুঃখ দুর্ভাগ্যের কাহিনী, কত যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ঝঞ্ঝা ও বিপর্যয়—বোধ হয় তেমন করে ধাক্কা তোমার ওপর লাগে নি! তুমি ভালই আছ, বন্ধু!

এক্কা ও টাঙ্গাগুলিকে এককালে নানারঙের সজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত

করা হত। ঝালর ঝুলতো রঙ্গীন, পিতলের হাতল ও আঙ্গট, ঘেরা-টোপটি সুচিত্রিত, ঘোড়াটির গলায় ঝুলতো ঘণ্টা, মাথার উপরে ময়ূরের পালক এবং তার সঙ্গে ঘুঙুর। এক্কাই হোক আর টাঙ্গাই হোক—সামনে দিয়ে মধুর ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে তারা ঝলমল করে চলে যেত। পথের দু পাশে দেখতে পেতুম রঙ্গীন ঘাগরা ঘুরিয়ে ময়ূরের মত মাথায় রূপার ঝুঁটি বেঁধে গান গেয়ে চলে যেত পসারিনী রাজপুতানী মেয়েরা। এরা আজও আছে, কিন্তু এদের উপর স্পর্শ করেছে আধুনিক কাল। এদের রুচি বদলেছে, পুরনো কালের আলঙ্কারিক রীতি তার বৈশিষ্ট্য খুইয়েছে, জীবনযাত্রার সেই পুরনো ছাঁচও আর দাঁড়িয়ে নেই। সামন্ত যুগ যেন তার যাবার আগে শেষবেলাকার পাওনা বুঝে পড়ে নিচ্ছে।

মোটর বাস চলছে জয়পুরের রাস্তায়, আমার কাছে এটি নতুন। অম্বরে গিয়ে হেঁটে পৌঁছতে দু ঘণ্টারও বেশি লেগে যেত; এখন আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়। অম্বর প্রাসাদের নীচে সেই সুদীর্ঘ সরোবরে আজও তেমনি অম্বরের ছায়াটি পড়ে, ঘন-নীল আকাশটিও তার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়। ইতিহাস নাকি এই কথা বলে, দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা থেকে একদল রাজপুত এসে স্থানীয় নরপতির হাত থেকে এই পার্বত্য নগরী ছিনিয়ে নেয়। তাদের রাজার নাম অম্বরীশ। কেউ বা বলে, অম্বিকেশ্বর শিবের নাম থেকে অম্বর নামটির উৎপত্তি।

আরাবল্লির অনুচ্চ একটি টিলা পাহাড়ের উপর অম্বর দুর্গটি রাজা মানসিং নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। এটি শেষ করেন প্রায় একশ বছর পরে রাজা জয়সিং। জয়সিংয়ের আমলে এই অম্বর প্রাসাদটি ভাস্কর্যে, চিত্রণে, শিল্পায়নে এবং ঐশ্বর্য সম্পদে ঝলমল করতে থাকে। এই বিরাট প্রাসাদটিকে রাষ্ট্র-বিবর্তনের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে দুর্গটি নির্মিত হয় সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল জয়গড়। মেবার ওরফে

উদয়পুরের কথা আমার মনে আছে, কিন্তু অম্বরের মত এমন রাজকীয় মহিমা অন্যত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ওর মধ্যেই গলা বাড়িয়ে প্রাসাদের মধ্যে যশোরেশ্বরীর নতুন শ্বেতপাথরের মন্দিরটিকে দেখে নিলুম। দেবী অষ্টাদশভূজা—এখন এঁর বর্তমান নাম হয়েছে শিলাদেবী। প্রাক্তন যশোরেশ্বরী একদা বাঙ্গালীর হাতে ছিল—কিন্তু কোনও একটি চৌর্যব্যাপারের নিষ্পত্তি-স্বরূপ এর দায়িত্ব বাঙ্গালী পূজারীদের হাত থেকে সরকারী দায়িত্বে গিয়ে পড়ে। এই অপরূপ ভাস্কর্য ও কারুকার্য সমন্বিত মন্দিরটি আধুনিক রাজস্থানী নক্‌শায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

কিন্তু গোবিন্দজীর মন্দিরটি বৈষ্ণব বাঙ্গালী পূজারীদের তত্বাবধানে আজও রয়েছে। বাঙ্গালী বটে, তবে তাঁরা রাজস্থানী ভাষাভাষী বললে ভুল হয় না। বাঙ্গলা ভাষা তাঁরা একটু যেন থতিয়েই বলেন। ব্যাকরণ যথেষ্ট শুদ্ধ হয় না। এক একটি শব্দের ব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের। সম্রাট আকবরের কালে রাজা মানসিংয়ের সহায়তায় বাঙ্গালীরাই একদিন বৃন্দাবনের মূল গোবিন্দজীকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের অদূরে জগৎপ্রসিদ্ধ মান-মন্দিরটি—যেটির নাম 'যন্তর-মন্তর'—সেটি মহাকালের সকল শাসন উপেক্ষা করে তেমনি দাঁড়িয়ে। জয়সিং ছিলেন গণিতবিদ্ এবং জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ। তিনি পর পর পাঁচটি মানমন্দির দিল্লী, কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং জয়পুরে নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে জয়-পুরের এইটি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ। এই সূত্রে অপর একটি মান-মন্দিরের ছবি মনে পড়ছে। সেটিও অবিকল এই ডিজাইনে নির্মিত। সেটি দেখেছিলুম মধ্য এশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ শহর সমরকন্দে। ভারত ইতিহাসে কুখ্যাত তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুকবেগ ছিলেন পণ্ডিত, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। তিনি তাঁর রাজত্বকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমরকন্দ শহরের উপকণ্ঠে একটি টিলার উপর এই মানমন্দিরটি স্থাপন করেন। অতঃপর কালক্রমে সমরকন্দের রাজত্ব রসাতলে যায়,

এবং তৈমুরের অন্যান্য পৌত্রের দ্বারা তিনি হত হন। উলুকবেগের মৃত্যুর পর থেকে এই মানমন্দিরটি বোধ করি মাটি চাপা পড়তে থাকে। একালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার জার নিকোলাসেব স্বৈরাচারী রাজত্বকালে একজন দেশপ্রেমিক রুশ যুবক বিপ্লব প্রচেষ্টাব অভিযোগে মধ্য এশিয়ার মরুলোকে নির্বাসিত হন। যুবকটি ছিলেন একজন অধ্যাপক, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় তিনি পান ডক্টরেট। তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে সমরকন্দে পৌছন, এবং উলুকবেগ নির্মিত এই মানমন্দিরটি আবিষ্কার করেন।

সমরকন্দের সেই মানমন্দিরটির সঙ্গে জয়পুরেরটির সাদৃশ্য দেখে আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করেছিলুম। পঞ্চদশ শতাব্দীর উলুকবেগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর জয়সিং—এই দুইয়ের সংযোগ কোথায় এবং কি প্রকার—সেটি ঐতিহাসিকরা বলবেন।

জয়পুরের মানমন্দিরের পাশেই রাজপ্রাসাদটি আজও তেমনি উন্নতশির। প্রিন্স অ্যালবার্ট মিউজিয়ম ওরফে জয়পুরের যাদুঘরে নানা-সময়ে নানা-বিচিত্র সামগ্রী এসে পৌছেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। মিসর দেশে এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয় যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের সাতশ আশি বছর আগে অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি মারা গেছে আজ থেকে দু হাজার সাতশ পঁচাত্তর বছর আগে। তার মৃতদেহটিকে সর্বপ্রথমে একটি লম্বা কাঠের বাক্সে রাখা হয়। সেই বাক্সটির মাপ অনুযায়ী আরেকটি মনুষ্যাকৃতি কাষ্ঠাবরণ নির্মাণ করে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির ভিতরে সযত্নে গচ্ছিত করা হয়। উপরিভাগে একটি নারীদেহের চিত্র প্লাস্টার করা। শবদেহটির পায়ের দুটি পাতা রয়েছে বাইরে। পায়ের কয়েকটি আঙ্গুল দেখতে পাচ্ছি। সেগুলি কালক্রমে জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিছু একটা আস্তরের গুণে দেহ থেকে আঙ্গুলগুলি আজও খসে পড়েনি। এই 'মমি'টি মিশর দেশ থেকে সোজাসুজি আনা হয়েছে। সমগ্র যাদুঘরে এই মমিটিই দর্শকদের ঔৎসুক্য আকর্ষণ করে সর্বাধিক পরিমাণে।

আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না। তবুও জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ এবং অদ্বিতীয় চিকিৎসক ডাঃ গিরিজানাথ সেনের জন্য একবার থমকিয়ে দাঁড়ালুম। ইনি জয়পুবের প্রাক্তন মহারাজার প্রধান মন্ত্রী স্বর্গত সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্র, এবং সুলেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সহোদর। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা ডাঃ সেন হলেন জয়পুরের 'বিধান রায়!!' ইনি আপন যোগ্যতা ও কর্মশক্তির বলে গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের নানাবিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন! এই সেন পরিবার দিল্লী এবং জয়পুরে অদ্যাবধি বিশেষ প্রভাবশালী।

বোধ হয় ত্রিশ বত্রিশ বছর পরে গিরিজার সঙ্গে দেখা। সেই এককালেব ছাত্রজীবন! সে পড়াশুনো কবেছে কলকাতায়। কবে তার প্রতিষ্ঠা হল, কবে সে প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কবে সে মস্ত সংসারের অভিভাবক হয়ে পুত্রকন্যাকে মানুষ করে তুলল—এসব আনুপূর্বিক জানতে পারি নি। কিন্তু পরস্পারের সাক্ষাতের পর উভয়ে যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম, দেখলুম গিরিজার কোনও পরিবর্তনই হয় নি!

পবদিন সন্ধ্যার গাড়িতে জয়পুব ছেড়ে আজমেরে যখন এসে নামলুম, রাত তখনও দশটা বাজে নি।

সামন্ত যুগের প্রকৃতির সঙ্গে একালের সংঘাত বেধে উঠেছে সমগ্র রাজস্থানে। আজমের তার একটি বড় সাক্ষী। জয়পুর পেরিয়ে যাবার পব থেকে আজও যেটি চোখে পড়ে সেটি সর্বব্যাপী শুষ্কতা। এককালে প্রান্তরে-প্রান্তরে বন্য হরিণের পাল এবং ময়ূর-ময়ূরীরা চরে বেড়াত। রেলগাড়ির অওয়াজে হরিণের পাল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিত। আজ মাঠে মাঠে একটি হরিণও চোখে পড়ে না। ময়ূরেরা পথেঘাটে আর ঘোরে না—তারা থাকে বনবাগান আর ঝোপ জঙ্গলের নিরিবিলি ছায়ায়—অনেকটা যেন লোকচক্ষুর বাইরে।

আধুনিক যন্ত্রযুগের ধাক্কা এসেছে আজমের শহরে। জলবিদ্যুতের কারখানার আয়োজন চলছে, খাল বিল আসছে, কল-কারখানা বসে যাচ্ছে মরুময়দানে, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠা চলছে, উপনগরী মির্মিত হচ্ছে একটির পর একটি—প্রাণের আগুন দপদপ করছে আজমের শহরের সর্বত্র। সামনে তারাগড় পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে শুধু আজমের নয়, রাজস্থানের অনেকখানি চোখে পড়ে। তেত্রিশ বছর আগেকার আজমের আজ স্বপ্নকথা মাত্র। আজ মহানূতন ডাক দিয়েছে যেন সবাইকে—জীবনের সর্বব্যাপী চঞ্চলতা যেন প্রবল চেহারায় দেখা দিয়েছে। আরাবল্লির সর্বত্র যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিরোধিতা ছিল, সেটাকে জয় করার জন্য সবাই যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তবু পুরনো ইতিহাস এখনও মোছে নি। সম্রাট আকবর নির্মাণ করেছিলেন তারাগড় দুর্গ—এটি এখনও মহাকালকে উপেক্ষা করে চলেছে। এর চার কোণে চারটি বিরাট প্রশস্ত মিনার। নগরের উপরে দাঁড়িয়ে তারাগড় দুর্গের বিশাল তোরণদ্বার আজও পর্যটকদের বিস্ময়াহত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোগল যুগের ভাস্কর্য ও স্থপতি-শিল্প আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। একথা এখনও আজমেরবাসীরা ভোলে নি, একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মামুদ সাহ, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী সমগ্র আজমেরকে লুণ্ঠন করে প্রায় সর্বস্বান্ত করেছিলেন! কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর আজমের শহরটিকে ছোটখাটো একটি রাজধানীতে পরিণত করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বোধ করি আজমের অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইসলাম সভ্যতার সঞ্চার হতে থাকে। তাতার, আরব, তুর্কি, ইরানী, পাঠান—এরা এসেছে অল্পে অল্পে, জায়গা নিয়েছে অতি ধীর গতিতে। আজমের শহরের উপান্তে বোধ করি এদেরই একটি শাখা যে সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ মসজিদটি নির্মাণ করে সেটি দেশী এবং বিদেশীদের চোখে আজও আনে বিস্ময়। এটি স্থাপত্য শিল্পের একটি

মহৎ নিদর্শন। এর নামটি বেশ কৌতুকপ্রদ, আড়হাই দিন্‌কা ঝোপড়া।' অর্থাৎ আড়াই দিনের আস্তানা।

কবে কোন যুগে কারা আরাবল্লির কোলে বালুপাথর খুঁড়ে বিরাট একটি কৃত্রিম সরোবর বানিয়ে আজমের শহরের রুক্ষ স্বভাবকে স্নিগ্ধ সজল করে তুলেছিল, সেই সংবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু এর নাম "অন্নসায়ব রেখেছিল কেন, এটি বুঝতে বিলম্ব হয় না। পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান এই অন্নসাগরের তীরে শ্বেতমর্মরের বিশ্রাম প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং তার নামকরণ করেন, 'দৌলত বাগ।' এই মনোরম প্রাসাদটি ওই আরাবল্লিবেষ্টিত অন্নসায়ব সবোবরটিকে যে রাজকীয় মহিমা দান করেছে, সেটি পরম রমণীয়। এইটি আজ আজমেরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে।

সন্ধ্যার দিকে জনতা পরিকীর্ণ একটি মস্ত বাজার-হাটের পথে এসে ঢুকলুম। চারিদিকে যেমনই লোকবসতি তেমনি পণ্য-বিপণি বেসাতির জটলা। সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে এসে সঙ্কীর্ণ একটি পথের কোণে উপস্থিত হলুম। সামনে কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠলে 'খাজা দরগার' সুবিশাল তোরণদ্বার। ফতেপুর সিক্রিব বুলান্দ দরওয়াজার কথা মনে আছে, তাজমহলের গেটটির কথা ভুলি নি, ওই যার সামনেই লর্ড কার্জনের দেওয়া ঝাড় লণ্ঠনটা আজও ঝুলছে! দিল্লীর জুমা মসজিদ মনে মনে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি আহমেদাবাদের সেই রানী সিপরি মসজিদ, দেখতে পাচ্ছি দৌলতাবাদের ছবি! আমার বেশ মনে পড়ে খাজা দরগা বা 'দরগা শরিফের' প্রবেশপথটি দেখে আমি কতক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে ছিলুম। এবার আজমের আসার প্রধান আকর্ষণ ছিল এই মুসলিম তীর্থ দর্শন।

এমন একটি অভাবনীয় পরিবেশের মাঝখানে এসে দাঁড়াব আগে ঠিক ভাবা ছিল না। কিন্তু এই দরগার ভিতরে আমার প্রবেশাধিকার আছে কিনা এটি জানা দরকার। আমাদের তরুণ বয়সে 'লরেন্স অফ আরাবিয়ার' রোমাঞ্চকর সংবাদ আমরা

পড়তুম। তিনি ছদ্মবেশে মক্কাতীর্থে যান, কেননা মক্কায় নাকি অমুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলেই বোধ করি আমার মধ্যেও একদা একটা তাড়না এসেছিল, আমিও যাব মক্কায়, দেখে আসব সেখানকার অপরূপ দৃশ্য! সেই তাড়না আজও আছে আমার মনে।

আমার সঙ্কুচিত এবং আড়ষ্টভাবটি লক্ষ্য করে জনৈক মৌলবী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। আমি আমার জাতি পরিচয় দিলুম। তিনি তেমনি প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করে বললেন, এখানে সকল জাতি এবং সকল ধর্মের অবারিত প্রবেশাধিকার! নিঃসঙ্কোচে ভিতরে আসুন, না না, জুতো ছাড়ার দরকার নেই, সোজা চলে আসুন আমার সঙ্গে।

পুরনো সংস্কারবশতই একটু অবাধ্য হলুম। জুতোটা ছেড়েই রেখে গেলুম নীচের সিঁড়িতে। জুতোটা নতুন, তা হোক।

এটি বোধ করি ভারতের সর্বপ্রধান মুসলিম তীর্থ। অনেকে বলেন, এই খাজাসাহেব দরগা বা দবগা ই-শরিফ—ভারতের মক্কা! কিন্তু এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা বা বিচার করার মত বিদ্যা আমার কম। শুধু ভিতরে গিয়ে পদে পদে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল, এই তীর্থকেন্দ্রটি না দেখলে আমার বাজস্থান ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত।

সাড়ে সাতশত বছর আগে পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভকাল কিনা, ঠিক আমার মনে নেই। তবে পৃথ্বিরাজ জয়চাঁদের যুগ শেষ হবার পর ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বলোকে তখন একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। সেইকালে মধ্য প্রাচ্যে যে সাধক এবং মহাপুরুষ সর্বজন-প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর নাম খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তি। এই দরগা-ই-শরিফ তাঁরই সমাধিক্ষেত্র। শুধু রাজস্থান বা ভারতবর্ষ বা আজকের পাকিস্তান নয়, এই পবিত্র এবং পুণ্যময় সমাধিক্ষেত্রটি দর্শনের জন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকটপ্রাচ্য থেকেও ধর্মপরায়ণ মুসলমানরা ভারতে আসেন। শোনা গেল প্রতি বছরে একটি বিশেষ সময়ে এখানে মস্ত উৎসবের আয়োজন হয়।

দিল্লীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। দাসবংশের প্রথম আমল। কুতুবুদ্দিনের পর বোধ করি ইলতুতমিস—সেই সময়কার কথা। সেই থেকে এই খাজা মুইনুদ্দিনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে দিল্লীর প্রত্যেকটি রাজবংশ। দাস, খিলজি তোগলক, সৈয়দ, লোদি—কে নয়? আলাউদ্দিন থেকে আরম্ভ করে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান আওরঙ্গজেব, নিজাম, রামপুরের নবাব, উদয়পুর ও জয়পুরের মহারাজা, সবাই একে একে যুগে যুগে এই খাজা দরগার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন? এক একজনের নামে এক একটি তোরণ নির্মিত হয়েছে।

প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ভিতরে যেন একটি ক্ষুদ্র শহর। কোথাও গান কোথাও কথকতা, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও বা প্রচুর কর্মব্যস্ততা। এটি সাধারণ দিন কিন্তু যেন উৎসবের তিথি। ভিতরে মসজিদ, বড় বড় কক্ষ, বিশাল এক একটি গম্বুজ। সন্ধ্যার আলোয় চারিদিকের মূল্যবান ও বর্ণাঢ্য পাথর জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। সামনে মস্ত গদি। প্রকাণ্ড বিছানার উপর যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের দেখে সম্ভ্রম জাগে। সেখানে বহু-লোক। আতর, গোলাপ, ধূপ, ধূনা, কুমকুম, চন্দন, ফুল এবং বিভিন্ন সুগন্ধির বাতাস বইছে। আমার গাইড সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি প্রকার পূজো আপনি দিতে চান?

আমার জীবনে এটি নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি যে একটি শ্রেষ্ঠ মুসলিম তীর্থে এসে এই অভিজ্ঞতা লাভ করলুম, এতেই আমার আনন্দ। সুতরাং মুখে বললুম, আপনাদের যেরূপ নিয়ম আছে তাই করুন?

গাইড সাহেব বললেন, আপনি আড়াই টাকা এখানে জমা দিন।

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলুম। তিনি বললেন, এবার আসুন আমার সঙ্গে।

আমার মনে পড়ছিল রুক্মিণী-দ্বারকার মন্দিরের কথা: ভাবছিলুম

মাছুরার মীনাক্ষী মন্দির ; মনে আসছিল শ্রীক্ষেত্র। সকল তীর্থে প্রায় একই কথা। খৃষ্টানদের বেলাতেও সেই রেভারেণ্ড, বৌদ্ধের বেলায় ভিক্ষু, হিন্দুর বেলায় পাণ্ডা-পুরোহিত, এখানে মৌলবী বা মৌলানা।

একটা অবাস্তব স্বপ্নলোকের মধ্যে আমি যেন এসে পড়েছিলুম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সমাধি মন্দিরের ভিতরে। সে কক্ষটি তেমন বড় নয়। মূল সমাধিটি রেলিং-ঘেরা, উপর দিকটি মণিমুক্তা জড়োয়া ও জহরতের দ্বারা আবৃত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বৃহৎ সম্ভার সর্বত্র। কিন্তু হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না, এবং অন্যান্য জহরত সমস্ত কক্ষটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তাদেরই মাঝখানে লাল, কালো, রক্তনীল, পীত-লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের মখমলের সঙ্গে জড়োয়া জহরতাদির যে দীপ্তি ও জ্যোতির্লেখন সেই কক্ষে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হচ্ছিল—আমি সেজন্য দিশাহারা বোধ করছিলুম। বলা বাহুল্য, আমিও সকলের সঙ্গে সেই সমাধি প্রদক্ষিণ শুরু করে দিলুম। কেউ যদি তখন আমার কানে কানে বলত, এই মূল সমাধি মন্দিরের কক্ষটিতে কোটি কোটি টাকার হীরামুক্তা জহরত বর্তমান, আমি অবিশ্বাস করতুম না। বরং সমগ্র দরগা-ই-শরীফ পর্যবেক্ষণ করে এই কথাই মনে হয়েছিল, সমস্তটা মিলিয়ে কত কোটি টাকার সম্পদ হতে পারে তার পরিমাপও কেউ জানে না! সেদিন সন্ধ্যায় মাত্র এক ঘণ্টায় এই সুবৃহৎ দরগার প্রত্যেকটি মহল দেখে শেষ করা সম্ভব ছিল না। এটি যেন এক বিরাট ছুর্গ, এবং এই প্রাকারবেষ্টিত ছুর্গে দশ বিশ হাজার নর-নারী অতি অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারে।

ফিরবার পথের একপাশে একটি অন্নভোগের ক্ষেত্র দেখলুম। সেখানে ছুটি সুবৃহৎ রান্নার কড়াই দেখে থমকিয়ে গেলুম। সেই ছুটি বৃহদাকার কড়াইয়ের মাপ কি প্রকার সেটি বোঝাবার জন্য এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কড়াই ছুটিতে একসঙ্গে মোট এক-শ আশী মণ চাউলের ভাত ফোটে। পালপার্বণ উপলক্ষে সেই অন্ন ও

তার উপযুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একজন বয়স্ক ব্যক্তি অনায়াসে একটি কড়াইয়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে পারে।

এত বড় বিরাট একটি সমাধিসৌধ, এমন একটি জনবহুল সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে তার জগৎজোড়া খ্যাতি নিয়ে—এটি ভাবতে সেদিন আমার ভাল লাগে নি।

নিজের জীবনের উপর দিয়ে যখন নিজেরই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে—তখন তার কৌতুক খানিকটা উপভোগ করি বইকি। তেত্রিশ বছর আগে আজমেরে প্রথমবার পদার্পণ করেছিলুম, কিন্তু সেদিন চোখ খুলে দেখি নি আজমের কেমন। শুধু সেই আজমেরের পথের ভিতর দিয়ে আরাবল্লি পেরিয়ে পুষ্কর সরোবর এবং তার অপর পারবর্তী সাবিত্রী পাহাড় দেখে সেদিন চলে গিয়েছিলুম। মাঝখানে কেবল মনে আছে সেকালের সেই কর্কশ ধূলিরুক্ষ কঙ্কর প্রস্তরাকীর্ণ আরাবল্লির জনহীন পথ। সেদিন একা ছিলুম না, দলবলের সঙ্গে, ছিলুম। কিন্তু একথা মনে আছে, ওই জনশূন্য প্রাণীশূন্য এবং তৃণাদিশূন্য আরাবল্লির মরুপাথরের জটলা পেরিয়ে রাজস্থানী ডাকাতরা আসত যাত্রীদেবকে লুট করতে। সেদিন ওই আট নয় মাইল পথ অতিক্রম করার জন্য টাঙ্গাগাড়ির চালক পর্যন্ত প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় পেরিয়ে যাবার সময় এই কথা বলত, আপনারা যাত্রীরা এবার একটু সজাগ সতর্ক হয়ে বসুন, এ-পথটা তেমন নিরাপদ নয়।

কী কারণে নিরাপদ নয়, এটি জানবার চেষ্টা না করে ওই গাড়ির মধ্যেই যাত্রীরা দুর্গানাম জপ আরম্ভ করে দিত। পাথুরে পথের নাম ছিল চাটান, এবং সেই চাটানের উপর দিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে ছুটত টাঙ্গা-গাড়ি। শীর্ণ ঘোড়াগুলি সেদিন মার খেতে খেতে আধমরা হত। পথেব সর্বত্র খানা-খন্দ, পাথরের বড় বড় ডেলা, বালুর রাশি, অসমান উঁচু-নীচু—আট মাইল পথ পেরোতে লাগত চার ঘণ্টার বেশি। রুক্ষ ও আরক্তিম আরাবল্লির চেহারা দেখে সেদিন ভয় করত বলেই

পাণ্ডারা জানিয়ে দিত, 'পুষ্কর দুষ্কর'! পথটি কষ্টসাধ্য ছিল বলেই বোধ করি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হত!

স্টেশনের দোতলার রেস্ট হাউস থেকে সকালের দিকে প্রথম চোখে পড়ল, আজমেরের বৃহৎ প্রাচীন বক্তিম দুর্গ, 'তারা কিল্লা'! তারই উপর সেই পুরাতন কালের প্রাসাদ—যার জলুস নেই বটে, কিন্তু শক্তি আজও দৃঢ়। এই দুর্গটি এখন সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। আজমেরের চতুর্দিকে আরাবল্লি গিরিশ্রেণীর যেন শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বালু, কাঁকর, পাথর, গহ্বর ও অন্তহীন ধূলিরাশির দিকে চেয়ে বার বার মনে হয়, পৃথিবীর কোনও ভূভাগে আরাবল্লির মত এমন নিষ্প্রয়োজনীয় গিরিশ্রেণী আর নেই। এই গিরিশ্রেণীর আদি, অন্ত, মধ্য—কোনটারই যেন কোনও সঠিক পরিমাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজস্থানে, পাঞ্জাবে বা মধ্যভারতে এই আরাবল্লির শিরা উপশিরা যেখানেই ছড়িয়েছে, সেখানেই যেন এক একটি শহর এরই অনুপ্রবেশের ফলে শ্রীহীন হয়ে উঠেছে। এই আরাবল্লির জন্য দিল্লীর নগর-পরিকল্পনা কিরূপ ব্যাহত হচ্ছে এবং জলনিকাশের সমস্যা কিরূপ জটিল হয়ে উঠেছে, ভুক্তভোগীরা সেটি জানেন। বর্ষার দিনে দিল্লীর দুরবস্থার কথা কে না জানে।

সেই আজমের আজকে আর নেই। তার খোল-নলচে গেছে পালটিয়ে। চারিদিকে যেন মনোরম উদ্যান-নগরী গড়ে উঠেছে—যেমনটি দেখে এলুম নতুন কালের জয়পুরে। যতদূর এদিক ওদিক চেয়ে দেখ, প্রান্তরের সেই রুক্ষতা হারিয়ে গেছে, এসেছে সবুজের শ্যামলাভা। বড় বড় প্রাসাদ উঠেছে, অজস্র জলের ব্যবস্থা হয়েছে—মানুষ এসে পৌঁছিয়েছে যুগান্তরে। পূর্ব রাজস্থানের দিকে তাকালে আজকে আর চোখ জ্বালা করে না, বরং জুড়িয়ে যায় দুই চোখ।

আজকে পিচঢালা চিক্কণ ও মসৃণ রাজপথ দিয়ে মোটরবাস যাচ্ছে পুষ্করে। সেই একই পথ—তবু সেই পথ নয়! রাখালী যেন হয়ে উঠেছে রাজরানী—ভাগ্য তার ফিরেছে যেন যাদুমন্ত্রে! কোথায়

মিলিয়ে গেছে সেই চাটান, সেই শীর্ণ ঘোড়াটানা টাঙ্গা, সেই ভয় আর উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা! চার ঘণ্টার টাঙ্গাপথ—যেন দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে গেল! আগে পুষ্কব ছিল একটি তীর্থ-গ্রাম, একটি বস্তিমাত্র—সেখানকার বালুপাথরেব স্তূপের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত অগণিত ময়ূর নেড়িকুকুরের মত, এবং যাত্রীদের হাত থেকে ছোঁ মেবে পুরির ঠোঙ্গা কেড়ে নিয়ে যেত। আজ একটি ময়ূর কোথাও নেই! বালুপাথরের চিহ্নমাত্র নেই এই ছোট্ট শহরটিতে। প্রাণ ধারণের উপযোগী যে দু-একটি খাবারের দোকান এখানে ওখানে টিমটিম করত, আজ তাদেব জায়গায় বসে গেছে মস্ত বাজার, বড় বড় মহাজনী গদি, পণ্য বিপণির ছড়াছড়ি চারিদিকে। সমগ্র পুষ্করদিঘীর চতুর্দিকে বিরাট এক একটি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে উঠেছে। পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী সমগ্র পুষ্করকে যেন বেষ্টন করে বেখেছে। সেই দারিদ্র্য ও জনবিবলতা, সেই নিরানন্দ ও নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পুষ্কব শহরটির পরিচ্ছন্ন পথঘাটগুলি যেন চেখে-চেখে বেড়াবার বাসনা হচ্ছিল। এখানকার হাজার হাজার নরনারী তো চলতি কালেব মানুষ! ওদের মধ্যে আমিই যেন কেবল জানি এই পুষ্করের সেকালের ইতিহাস। আজকের মত ইলেকট্রিক ছিল না সেদিন। সন্ধ্যার পর তেলের আলো জ্বলত টিমটিম করে। বড় বড় কুমির ঘাটের নীচে এসে ওত পেতে থাকত, এবং সুবিধা পাবামাত্রই যখন কোনও অসতর্ক যাত্রীর ঠ্যাংটি ধরে অগাধ জলে তলিয়ে যেত, তখন শোকাকুল সহযাত্রীরা এই বলে বিলাপ করত যে, কুম্ভীর-রূপী স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই উক্ত পাপীকে প্রপঞ্চময় মিথ্যা মায়ার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষলাভের পথে নিয়ে গেছেন! পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফল!

ব্রহ্মা এবং গায়ত্রীর মন্দির দেখে আমি অবাক। মস্ত বাগান চারিদিকে। মার্বেল পাথরের বিরাট মন্দির, নাটমন্দির তার কোলে। মনে পড়ছে ব্রহ্মা আর গায়ত্রীর অন্ন জুটত না একদিন! কাপড়ের

টুকরোর অভাবে ওদের মান রক্ষা হত না! প্যাঁড়া আর ফুল, বড় জোর দুটো পোকাধরা মেওয়া, তিন-আঙ্গুলে গোটা দুই আলোচাল— এই ছিল স্বামীস্ত্রীর ভোজ্য! জীর্ণ মন্দিরের ফাটলে ছিল বট-অশ্বত্থের শিকড়ের জটলা। যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। দরিদ্র পাণ্ডারা ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকত যাত্রীদের সঙ্গে। পূজো সারা হত দু-চার আনায়, না হয় দুটো টাকায়। কিন্তু 'সুফল' লাভের দরুন মাথা পিছু বেশ কয়েকটি টাকা না দিলে পুষ্কর থেকে একদা বেরনো কঠিন ছিল!

আজ ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী ভিতর থেকে হাসছেন! মর্মরনির্মিত অট্টালিকা। ষোড়শ উপচারে অন্ন। অঙ্গে অঙ্গে জড়োয়া অলঙ্কার। রঙ্গীন রেশমের পোশাক। প্রজাপতি ব্রহ্মার চেহারায় আত্মগৌরবের দীপ্তি! সেদিন আর নেই! ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে, আভিজাত্যে, আত্মাভিমানে—স্বামীস্ত্রীব চেহারা যেন দপদপ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওঁদেরও অবস্থা ফিরেছে!

আমি ভুলি নি সেই এককালের শীর্ণ প্রসন্নমুখ বৃদ্ধ পাণ্ডা শ্যামসুন্দরকে। দরিদ্র ঝুপসি একটি ঘরে সেই শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত বৃদ্ধ আমাদের সকলকে একদা নিবাপদ আশ্রয় দিয়েছিল। এ ছাড়া আমাদের ফাইফরমাশ এবং দেখাশোনা করার জন্য একটি তরুণী পরিচারিকা নিযুক্ত করেছিল। সেই বৃদ্ধ ছিল বিশেষ পণ্ডিত, স্বল্পে তুষ্ট, মধুর প্রকৃতি এবং স্নেহশীল। আজ নিশ্চয় সে কোথাও নেই, কিন্তু পুষ্কর তীরবর্তী সেই ঝুপসি ঘরখানা এবার খুঁজে পেলুম না! ঘাটের ধারে বসলুম, পাথরের সিঁড়িতে গা এলিয়ে একটু গড়িয়ে নিলুম। কিন্তু মোটা একখানা খাতা নিয়ে আজ কাছে আর কেউ এল না, পাপের ভয় এবং পুণ্যের লোভ কেউ দেখাল না, ব্রহ্মা ও গায়ত্রীর পূজা কেউ চাইল না! শুধু চেয়ার টেবিল পাতা বড় বড় হোটেল—যেখানে সাংঘাতিক কলরব তুলে রেডিও-লাউডস্পীকারে বোম্বাই সিনেমার

কামসঙ্গীত গাওনা চলছে—সেখানকার বয়-রা আমাকে বেশ ভোজন রসিক খরিদ্দার মনে করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর একদা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল পুষ্করের ওপারে কিয়দ্দূরবর্তী সাবিত্রী পাহাড়ে। বালুপাথরে আকীর্ণ সেটি মরুভূমির পথ। বালুর মধ্যে বড় বড় মোটা ছুঁচের মত কাঁটা —সে কাঁটা অবিশ্রান্ত পায়ের তলায় ফুটতে থাকে। জুতো পায়ে হাঁটলে বালুব মধ্যে জুতো ডোবে—তখন সবটাই অচল। খালি পায়ে হাঁটলে কথায় কথায় রক্তপাত! কৌতুকের বিষয় এই, মাইল-খানেক মাত্র ওই মরুপথ, পাহাড়ের চূড়া অবধি হয়তো বা মাইল দেড়েক—কিন্তু সেদিন ওই মরুপথটি যথেষ্ট সহজসাধ্য ছিল না। যারা প্রভাতকালে গিয়ে সাবিত্রী দর্শন করে ফিরে আসত, তারা লাভবান হত সকল দিকে। বেলা আটটার পর মরুভূমির রৌদ্র হয়ে ওঠে প্রখর এবং কষ্টদায়ক।

আমাকে যেতে হল বেলা দশটার পর। রৌদ্র তখন টা টা করে উঠেছে। মাঠের পথে নেমে বুঝলুম, এটি পুষ্কর নগরীর বহিপ্রান্ত—এটি এখনও উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আসে নি। প্রথম দিকে বালুপাথরের পরিনাণ আগের চেয়ে কিছু যেন কম। কিন্তু পথ তেমনি কষ্টদায়ক। তরুণ সেই বয়সের প্রবলতর উদ্দীপনা এবং উৎসাহ আজ নেই, সেজন্য গতি আমার কিছু মন্থব। কিন্তু ঔৎসুক্যের মৃত্যু কি হয়েছে? স্থির থাকতে দেয় না কেন অন্তহীন সেই আদিম কৌতূহল? মন তেমনি ছুটে চলে, কিন্তু দেহ তার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে জন্তুর মত জিহ্বাগ্র বার করে হাঁপায়।

পায়ের তলাকার বালু বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বৌদ্রের ঝাঁজ প্রখরতর হয়ে ওঠে বালুর তপ্ত বাষ্পে। জয়শলমেরের দিগন্ত জোড়া 'থর' মরুভূমির মধ্যেও দেখেছি, রৌদ্র উদয় হবার অল্পকালের মধ্যে গরম হয়ে ওঠে মরুশ্বাস। রতনগড়-বিকানেরে তাই, যোধপুর-ফালোদি বা পোকারনেও তাই। আজ আমার সুবিধা ছিল এই,

সাবিত্রীর পথে এখন জনপ্রাণী কেউ নেই। সুতরাং আমার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে কোথাও কথা উঠছে না। আমি একাই যাচ্ছিলুম। কিন্তু রৌদ্রদগ্ধ মরুপথ নিঃসঙ্গ হলে মন যেন কেমন ছমছম করতে থাকে। ওই বালু পাথরের ভিতর থেকেই পথের দু পাশে দুটি বৃহৎ বট ও অশ্বত্থ তাদের দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। ওর পরে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। সামনের দিকে পাহাড়ের চূড়ার উপরে শুধু দেখা যায় সাবিত্রীর শ্বেতবর্ণের মন্দিরটি। উচ্চতায় মোটামুটি হয়ত পঁচিশ ফুট হবে। হয়ত বা তার চেয়ে কম। কিন্তু চড়াই পথটি কষ্টদায়ক।

প্রথম যাদের সঙ্গে এই পাহাড়ে এসেছিলুম তাদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। এই পথে দুঃখ এবং আনন্দ ছিল, সেই জন্য পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে একটি সজল মধুর বেদনা জড়িয়ে রয়েছে। আজ এই কর্কশ বন্ধুর প্রস্তর-জটলা অতিক্রম করে উপরে উঠবার সময় সেই সেদিনের মানুষরা অশরীরী ছায়ার মত যেন আমার সঙ্গ নিয়েছিল। এই অগ্নিক্ষরা রৌদ্রের তপ্ত-শ্বাসের মধ্যে আমি যেন সেই তাদের সকরুণ স্নেহস্পর্শ লাভ করছিলুম। চারিদিকের দিগন্ত জোড়া বালুসমুদ্রের মাঝখানে এই রুক্ষস্বভাব ও ক্লান্তিদায়ক সাবিত্রী পাহাড়ের চড়াইপথের এক একটি ধাপ ধীরে ধীরে বেয়ে এক সময়ে উপরে উঠে এলুম। রৌদ্রের খরতাপে ঘর্মাক্ত হয়েছিলুম।

মন্দিরের চত্বরটি সমতল। এটি ক্ষুদ্র একটি মালভূমি। একপাশে পূজারীদের বসবাসের জন্য ছোট দু-একটি ঘর। আশে পাশে কয়েকটি গাছপালার ছায়া স্নেহাশ্রয়ের মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি গিয়ে সাবিত্রীর ছোট মন্দিরটির সামনে দাঁড়ালুম। সেই সেকালে এই একই সুশ্বেতা দেবীমূর্তিটি দেখে গিয়েছিলুম। সেই অম্লান ও সুন্দর দুটি স্ফটিকের চক্ষু, মুখখানিতে তেমনি প্রসন্ন মধুর হাসি। এই ছাঁদের সকল মূর্তি নির্মিত হয় জয়পুরে, এবং এদের বলা হয় জয়পুরী মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশ পথে বহু বাঙ্গালী

যাত্রীর নাম ও ঠিকানা খোদিত রয়েছে। বাঙ্গালী সমাজে সাবিত্রীর স্পর্শ-করা শাখা-সিঁদুর ও নোয়া বিশেষভাবে সমাদৃত। সাবিত্রীর বামপার্শ্বে মহাশ্বেতার সুন্দর একটি মূর্তি।

ছোট ঘরটি থেকে এক অতি বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। আমি পরিশ্রান্ত, তিনি বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন। আতস কাঁচের চশমা তাঁর চোখে। তিনি গিয়ে ঘরের ভিতব থেকে সামান্য মিষ্টান্ন এবং একলোটা ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে আমার প্রণামী নিবেদন করলুম। তিনি বললেন, বেটা ঠণ্ডে হো যাও—এই গাছতলায় মুখ হাত ধোবার জল আছে। ছায়ার তলায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাওগে।

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলুম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে যখন সামনে দাঁড়ালুম তখন বৃদ্ধা বললেন, আমার ছেলে এখানে পূজারী। অব মেরে লড়কেভি বুড়ঢে বন গৈ! মেরে উমর শ বর্ষ হোতা হ্যায়।

প্রশ্ন কবলুম, আপনি কতদিন এখানে আছেন?

বৃদ্ধা হাসিমুখে বললেন বাস, এবাব যাবার ডাক আসবে! বেটা আমি এখানে সত্তর বছব আছি!

এতক্ষণে আমার সংশয় ঘুচল। একদা যখন আমার জননীর সঙ্গে প্রথম এখানে এসেছিলুম, এই মহিলাকেই তখন প্রবীণ বয়স্কা দেখে গিয়েছিলুম! ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ছে বটে।

উপরে জলের সরবরাহ কোথাও নেই। জল আসে নীচের পুষ্কর সরোবর থেকে। পানীয় জল প্রতি কলসের মূল্য আট আনা পড়ে। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় একটি সম্পূর্ণ দিনেব পক্ষে প্রয়োজনীয় জলের ব্যয়ভার বহন করলুম। যে সকল যাত্রী প্রভাতকালে এখানে এসে সারাদিনমান অতিবাহিত করতে চান তাঁদের আহারাদি ও বিশ্রাম নেবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা আছে। উপর থেকে পুষ্করের ছবিটি সুন্দর দেখা যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্রেই ফিরব মনে করে যখন বৃদ্ধার নিকট বিদায় নিয়ে নামছিলুম, তখন ডানদিকে পাথরের ফাটলের ধারে কয়েকটি বন্যচারার জটলার মধ্যে পতঙ্গের গুঞ্জন শুনে থমকিয়ে গেলুম। বিশ্বচরাচরের উপর মধ্যাহ্নের সূর্য তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। দিবাভাগে পৃথিবী এমন নিষুপ্তি, এমন স্তব্ধ নিশ্চুপ —মরুপর্বতের উপর না এলে হয়তো সেটি বোঝা যায় না। এই সর্বব্যাপী নৈঃশব্দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সহসা মনে হল, পতঙ্গের পরিচিত গুঞ্জন ঠিক এটি নয়—এর মধ্যে একটি ঐকতানিক বাদ্য নিহিত। সুতরাং রৌদ্র একটু বাঁচিয়ে পাথরের চাটানের উপর বসলুম।

একটি কাঁটা ফুলের ছোট গাছের পাতায় ছোট ছোট নীল, হলুদ ও সবুজ বর্ণের পাঁচ-সাতটি ফড়িং বসেছে। একটি তার মধ্যে অতি মিহি মিষ্ট আওয়াজ তুলছে, অন্যটি তাল দিচ্ছে। তৃতীয়টি বাঁশি, চতুর্থটি হারমোনিয়াম, পঞ্চমটি ঝুমুর-ঝুম, ষষ্ঠটি জলতরঙ্গ, সপ্তমটি করতাল, অষ্টমটি···

আমি শুধু অভিভূত নয়—দিশাহারা! ওদের মধ্যে এক এক সময়ে একটি দুটি উড়ে যাচ্ছে, আবার দু-একটি এসে বসে পড়ছে! প্রতিটি পতঙ্গের আওয়াজের মধ্যে সুরের এই সংগতি এবং বৈচিত্র্য, অপরপক্ষে এই ঐকতানিক সুষমা এবং পারস্পারিক সহযোগিতা— আমাকে যেন এই মরুপ্রকৃতির আবেকটি বহস্যতোরণের সামনে এনে বসিয়ে দিল। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা।

কোথাও যাবার তাড়া আমার নেই। সুতরাং গায়ের জামাটা খুলে চাটানের উপর পেতে একটু গড়িয়ে নিই ততক্ষণ। গাছগুলির ছায়ার নীচে হাওয়া দিয়েছে ফুরফুরিয়ে। পতঙ্গদলের ঐকতানবাদ্য কিছুকালের জন্য মন্ত্রপাঠ করুক আমার কানে কানে। চোখ বুজে শুনি।

॥ দক্ষিণে নর্মদা ॥

ইতার্সি স্টেশনের যাত্রীশালায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। বোধহয় জংশন স্টেশন মাত্রই এই। একটু আগে যেখানে জনতার ভিড়, একটু পরে খান দুই ট্রেন আনাগোনা করলেই সেই ভিড় মিলিয়ে যায়। আবার সঞ্চারিত হতে থাকে নতুন জনতা। কত যাত্রী কত অজানার দিকে চলে যায়, কোনও খোঁজই তার পাওয়া যায় না।

যাত্রীশালার এক কোণে ময়লা মেঝের উপর কম্বল বিছিয়ে জায়গা নিয়েছিলুম। এটা সাধারণ মুসাফিরখানা—আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মড়ার মত অনেকেই এখানে রাত কাটায়। কেউ তাদের ডাকে না। আমি প্রায় রাত দুটোয় এসে জায়গা নিয়েছি একটি কোণ ঘেঁষে—কোনও দ্রুতপদীর হোঁচট না লাগে আমার গায়ে। মুড়ি দিতে না দিতেই আমার ঘুম এসেছিল ক্লান্তিতে। চারিদিকের অপরিচয়ের মাঝখানে আমি মিলিয়ে গিয়েছিলাম।

ঝাড়ুদারের গলার আওয়াজে ভোরবেলায় যখন জাগলুম, তখন ভূপালের গাড়ি সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। কম্বলখানা গুটিয়ে সুটকেসটি ঝুলিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন গিয়ে উঠলুম—সকাল সাড়ে ছ-টা। আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলুম অবন্তীদেশ। মালোয়া-বিদিশা ইতিহাসের তলায় কোথায় তলিয়ে গেছে—অন্তত তার ভৌগোলিক সন্ধান করা যায় কিনা, সেটি আমার জানার দরকার ছিল।

ইতার্সি থেকে উত্তরের পথ ধরলে নর্মদা পেরিয়ে যেতে হয়। নর্মদার দক্ষিণে সাতপুরার গিরিদল চলে গিয়েছে দূর পশ্চিমে—বোধ

করি সেই খানদেশ পর্যন্ত। কিন্তু উত্তরে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বিন্ধ্য-গিরিশ্রেণী। এ অঞ্চল ভারতের হৃৎকেন্দ্র। পূর্বদিকে এই গিরিশ্রেণী প্রসারিত হয়ে গেছে বুন্দেলখন্দ এবং বাঘেলাখন্দের দিকে। নর্মদার উত্তরপারে বিন্ধ্যগিরি, দক্ষিণে সাতপুরা। নর্মদার মত এমন বন্য, সঙ্কট-সঙ্কুল এবং প্রস্তরাকীর্ণ নদী উত্তর ভারতেও কম।

আমাদের ট্রেন চলেছে ভূপালের দিকে বিন্ধ্যগিরির আনাচে কানাচে। জানুয়ারীর প্রারম্ভ। ঘন অরণ্যানীর রহস্যলোক চোখে পড়ছে দূরের পাহাড়গুলির আশেপাশে। কোনও কোনও জলাশয়ে পড়ছে ঘন নীলের আভা ; প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বিন্ধ্যগিরির শিরদাঁড়া। সেখানে যেন কোনও এক পৌরাণিক যুগ মুদিতচক্ষু সন্ন্যাসীর মত বীজমন্ত্র পাঠ করছে আপন মনে। এক এক সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলুম পাহাড়ের নীচেকার এক একটি ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গলোক। এমনি সুরঙ্গ ছিল আরাবল্লির তলায় তলায় মারোয়াড় থেকে উদয়পুর-চিতোরের দিকে।

ভূপালকে এড়াবার উপায় ছিল না। মধ্যপ্রদেশেব রাজধানী ভূপাল। কিন্তু মধ্য ভারতে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে গেলে ভূপাল হল তার প্রধান কেন্দ্র। ভূপালে গাড়ি এসে দাঁড়াল সকাল নটায়।

ভূপালের সামন্ত যুগ কেটে গেছে। সেই যুগ—যখন একদিকে দরিদ্র হতভাগ্য অর্ধাহারী জনসাধারণ নোংরা শহরের ইতর বস্তির নালা নর্দমায় মুখ থুবড়ে জীবন কাটাত, এবং অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার হীরা, মণিমুক্তা, জড়োয়ার নবাবী আমল ঝলমল করত। সেই ইংরেজ আমলের রেসিডেন্সি আজ নেই, বড়লাটের চাটুকারের দল গুহাবাসী জন্তুর মত এখানে ওখানে আত্মগোপন করেছে, এবং তাদের শেষবেলাকার কূটনীতির কামড়স্বরূপ প্রিভি পার্স আদায় করে নিয়ে গেছে। আজ ভূপালের চেহারা বদলে গেছে অনেকটা।

রাজস্থানের সুরুচিবোধ এবং তার স্থাপত্যশিল্পের ভিতর দিয়ে

যে সৌন্দর্য সাধনা—সেটি মধ্যভারত বা মধ্যপ্রদেশে কম। এখানে মোটা হাতের তুলি—ছবি ফোটে নি সুন্দর হয়ে। রাজস্থানের যে কোনও শহরে নামলে মন প্রফুল্ল হয়—এমন কি বিকানেরের মত বালুশহরও মনে অনুপ্রেরণা আনে। কিন্তু ভূপালে এসে দাঁড়ালে প্রথমেই গা ঘুলিয়ে ওঠে। কথায় আছে 'পহিলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি'—ভূপালের প্রথম দর্শনেই সেদিন মনটা অপ্রসন্ন হয়েছিল। নোংরা স্টেশন, তার চেয়েও নোংরা স্টেশন পল্লী, কদর্য নালা-নর্দমা দুর্গন্ধে ভরা, তার বাজারের পথ, বস্তিবাসিন্দাদের ইতর জীবনযাত্রা, জরাজীর্ণ এবং হতশ্রী তার বসবাসের ব্যবস্থা—সমস্তটা মিলিয়ে গোড়া থেকেই মন বিমুখ হয়ে ওঠে। আমি বছর ছয়েক আগেকার কথা বলছি। কিন্তু সেদিন এখানকার মানব-সংসারের যে অবমাননা এবং অবনতি চোখে পড়েছিল সেটি ভুলি নি। বুঝতে পারা গিয়েছিল, সমস্ত নরপতিদের কোনও রাজ্যেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কোনও প্রাণের যোগ ছিল না। চাতুরী এবং চাটুবাক্যের বাইরে অপর কোনও রাজনীতি থাকতে পারে এটিও তাদের অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু এর বাইরে আরেকটি ভূপাল আছে কয়েক ফার্লং দূরে। সেই ভূপালটি ইংরেজ আমলের নবাবী ভূপাল। সেখানে বিন্ধ্য-গিরির শিরা উপশিরা এসে পৌঁছেছে। সেখানে সামন্তযুগীয় বিরাট দুর্গ রয়েছে, রয়েছে সমুদ্রবৎ সুবিশাল একটি জলাশয়—বোধ হয় মধ্যপ্রদেশে এত বড় সরোবর অন্য কোথাও নেই। সেই সরোবরের তীরে পরম রমণীয় পাথর বাঁধানো সোপান শ্রেণী, এবং পিছন দিকে পাহাড়ের বিশাল দেওয়াল। নগরের প্রাকার হিসেবে এই দেওয়াল বোধ করি কাজ করছে যুগযুগান্ত। এদেরই মাঝখান দিয়ে অতি চিক্কণ ও সুশ্রী রাজপথ চলে গিয়েছে দূর দূরান্তরে। এই পথেই এককালে ইংরেজ বড়লাট বিপুল রাজকীয় সমারোহ সহকারে তাঁর বশংবদ নরপতির কাছে আসতেন মাঝে মাঝে আশনাই করতে।

সেকালের সেই ভূপাল, রামপুর, হায়দরাবাদ, সেই উদয়পুর, যোধপুর, বিকানের, জয়শলমের, জয়পুর—তাদের রাজ্যপাট তুলে দিয়ে সাড়ে পাঁচ শ সামন্ত নরপতির সঙ্গে ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ আজ মুখ লুকিয়েছে।

নানাপথের আশেপাশে নতুন কালে বসে গেছে ইস্কুল, কলেজ আর হাসপাতাল। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠেছে একালের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনসাধারণ বংশ পরম্পরায় ভুলতে বসেছিল যে, ভূপাল ভারতেরই একটি ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। তাদের সেই মূঢ়তা আজ ঘুচতে বসেছে। আজ ধাক্কা এসেছে নতুন যুগের, ঝড় উঠেছে ভারতবাসীর মনে, অর্থনীতিক অগ্রগতির তাড়নায় যা কিছু জীর্ণ এবং পুবাতন, মানুষের নানা ইতর কুসংস্কারের সঙ্গে জড়ানো যা কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধারণা—তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে। নতুন জীবনের সাড়া এসেছে ভূপালে।

. নির্জন মধ্যাহ্নকালে ঠুংঠুং আওয়াজ তুলে আমার টাঙ্গা মন্থরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গাড়িটি নতুন, এবং চালকটি বৃদ্ধ এক মুসলমান। ওর বাড়ি এখানকাব পাহাড়ী এক বস্তিতে। বাজারে ওদেরই আছে একটি দর্জীর দোকান। সেখানে জরি ও মখমলের টুপি, বেলদার কামিজ এবং চুমকি বসানো ওড়না তৈবি হয়। এই গাড়িটি ঘোড়া সমেত কিনতে লেগেছিল হাজার টাকারও কিছু বেশি।—"পুরানে জমানা চল্ গৈ, সাব।"—আগে এ গাড়ি-ঘোড়া সাড়ে তিন শ টাকার মধ্যেই হত! আজকাল ছয় সাত টাকার কম দৈনিক না কামালে চলে না। এখন এক টাকায় সওয়া তিন সের 'গেঁহু!'

বুড়ো আমার সঙ্গে গল্প করে আর পথ-ঘাটের খবর দেয়। ভ্রমণকালে বৃদ্ধ পথিপ্রদর্শককে আমি বেশী পছন্দ করি, কেননা তাদের কাছে জনজীবনের প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। ওই বৃদ্ধই আমাকে দেখিয়েছিল ভূপালের সর্ববৃহৎ জুমা মসজিদ। সেটি দেখে আমি

অভিভূত হয়েছিলুম। ওরই সঙ্গে গিয়েছি সুপ্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরে এবং হামিদামহলে। এক সময় ওরই গাড়িতে ভূপাল নবাবের প্রাসাদ প্রান্তবর্তী প্রাকারের সামনে এসে নামলুম। এই প্রাচীর শ্বেত লোহিতবর্ণ। কেউ যদি তখন বলত, এই প্রাচীরটি এক মাইল লম্বা, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে একটুও অবিশ্বাস করতুম না। প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করবার অনুমতি আমার ছিল না। হয়তো তার ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু সময় ছিল কম। বনবাগান উদ্যান পুষ্পবীথিকার আড়াল আবডাল পেরিয়ে যেটুকু চোখে পড়ল, সেটুকু আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু একালের শিক্ষায় আমাদেব মন বদলিয়েছে বই কি। এককালে আমাদের দরিদ্র দৃষ্টি যে স্তূপাকার সম্পদের আড়ম্বর দেখে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত, আজ দেশজোড়া দুর্গতির সামনে দাঁড়িয়ে সেই দৃষ্টি নবাবী সম্পদের আর তারিফ করতে চায় না। আজ ভূপালের সর্বাপেক্ষা নিম্নবিত্ত মানুষটিও যদি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে পারত, তবে তাই দেখেই সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা জাগত মনে। সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ অট্টালিকার পাশে কোটি কোটি অর্ধনগ্ন আর বুভুক্ষুর দলকে আর দেখতে ইচ্ছা যায় না।

কিন্তু ভূপাল সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা না বলে গা ঢাকা দেওয়া চলে না। ভূপাল নামটি এসেছে এই রাজ্যেব যিনি এককালের প্রতিষ্ঠাতা সেই রাজা ভূজের নাম থেকে। সঘন সবুজ নীলাভ বিন্ধ্যগিরির কোলে একটি অতি নিরিবিলি সুন্দর অধিত্যকায় রাজা ভূজ তাঁর এই অপরূপ রাজধানীটি একদা নির্মাণ করেছিলেন। বোধ হয় তৎকালে এই অধিত্যকায় একটি জলাভূমি ছিল। ভূজরাজ তার থেকেই সম্ভবত এই বিশাল ভূজসরোবরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এমন স্বচ্ছ সুন্দর জলাশয় মধ্যভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভূপাল রাজ্য একটি নবাব বংশের অধিকারে আসে। কালক্রমে সমগ্র ভূপাল মুসলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

যে জুমা মসজিদটির কথা আগে বললুম, সেটির ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। এটি একশ পঁচিশ বছর আগে নির্মাণ করেন একজন বেগম—তাঁর নাম শ্রীমতী কুশদিয়া। তাঁরই কন্যা বেগম শিকান্দ্রা দিল্লীর জুমা মসজিদের অনুকরণে নির্মাণ করেন মোতি মসজিদ। অতঃপর বেগম শিকান্দ্রার কন্যা শাহজাহান বেগম তৃতীয় মসজিদ তাজ-উল্ নির্মাণ করেন। এই তিনটি মসজিদ ভূপালে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

একটি ছোট ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি উর্দু সাহিত্য, কাব্য ও সংস্কৃতি ভূপালের নবাবদের দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। যেমন আমাদের এদিকে ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূপালে দুজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবির আবির্ভাব ঘটে। একজন হলেন সিরাজমীর শের, এবং অন্যজন মহম্মদ মিঞা শহিদ। এঁদের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি দেশবিদেশে প্রসারিত হয়। আজও এই দুই বরেণ্য কবির সমাধি ক্ষেত্র দর্শনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ থেকে বহুলোক ভূপালে আসে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তারা উর্দু পড়তে চাইল না।

প্রাচীন বিদিশা রাজ্য খুঁজে পেলুম কিনা জানি নে। কিন্তু সাঁচিতে এসে পৌঁছলুম পরদিন মধ্যাহ্নকালে। জানুয়ারীর প্রথম পাদ। তবু উত্তপ্ত রৌদ্র টা-টা করছিল। ভূপাল থেকে সাঁচি মাত্র একুশ মাইল রেলপথ।

আমার তরুণ বয়সের এক প্রিয় বন্ধু সাঁচিস্তূপের মধ্যে আশ্রমিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর বৌদ্ধ নাম ছিল ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী উগ্রায়ন। লৌকিক নাম সুহৃদ্‌রঞ্জন রায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বছর আগে সুহৃদ্ দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায়। সে ২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রামের ছেলে। তার বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম। সুহৃদ্ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কারাবরণ করে।

অতঃপর সুহৃদ্ লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করতে থাকে। সে কাশীতে তার দিদিমার কাছে মানুষ হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে সুহৃদ্ যখন কাশীতে একটি সামান্য উপজীবিকা গ্রহণ করে তখনই তার মনে সংসার বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কাশীতেই সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এই সময় সে রাজা যুগলকিশোর বিড়লাকে 'দায়ক' করে সন্ন্যাস নেয়। তারপর শ্রীযুক্ত বিড়লার সহায়তায় সে দিল্লীর বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আসন লাভ করে। এই মন্দিরটি বিড়লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই সময় ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে সুহৃদ্ বিভিন্ন মনীষীগণের নিকট-সম্পর্কে আসে। তাঁদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ ও সি-এফ-এণ্ড্রুজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মূল্যবান চিঠিপত্রগুলি সুহৃদ্ তার মৃত্যুর আগে কোথায় রেখে গেছে তার খোঁজখবর অনেক চেষ্টা করেও পাই নি। সে যাই হোক 'ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী উগ্রায়ন' এই নামটি গ্রহণ করে সুহৃদ্ তার পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছিল। তার মৃত্যু সংবাদে সাঁচির সিংহলী ও ভারতীয় আশ্রমিকরা শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন। আজ যখন সাঁচিতে এসে দাঁড়িয়ে সুহৃদের আমন্ত্রণ রক্ষা করলুম, তখন সে নেই!

স্টেশন থেকে সাঁচি বোধ হয় এক মাইলও নয়। উভয়ের মাঝখান দিয়ে সুন্দর রাজপথ চলে গেছে। সাঁচি একটি জনবিরল গ্রাম, এর বাইরে তার অন্য পরিচয় নেই। মোট দুই তিন শ লোকের বাস—তারা প্রধানত চাষী। ভূপালের অন্তর্গত দেওযানগঞ্জ মহকুমার মধ্যে সাঁচি পড়ে। অনেকে বিস্মিত হন এই ভেবে যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে অথবা ইতিহাসে কোথাও সাঁচিস্তূপের কোনও প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিন্ধ্য গিরি শ্রেণীর একটি অতি ক্ষুদ্র টুকরো পাহাড়ের উপর এই সাঁচিস্তূপটি গাছপালা, বনজঙ্গল ও মাটি

চাপা পড়ে ছিল প্রায় ছয়শ বছর অবধি। অতঃপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজ জেনারেল টেইলর গন্ধে-গন্ধে বিদিশা থেকে এসে এই সাঁচিস্তূপ নূতন করে আবার খুঁজে পান। এই কূর্মপৃষ্ঠ অনুচ্চ পাহাড়টি চৈত্য বা চেতিয়গিরি নামে পরিচিত। আনন্দের কথা এই কালক্রমিক জীর্ণতার প্রশ্ন বাদ দিলেও জেনারেল টেইলর এই স্তূপটি একপ্রকার অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করেন। এর প্রায় ষাট সত্তর বছব পরে অপর একজন ইংরেজ মেজর কোলে এই স্তূপ সংস্কারের কাজে লাগেন। কিন্তু তিনি এ কাজ সম্পূর্ণ করার সময় পান না। অতঃপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বোচ্চ অধিনায়ক সার জন মার্শাল সাঁচিস্তূপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁরই সময় থেকে সাঁচির সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে।

একালে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সাঁচিস্তূপ সম্বন্ধে পৃথিবীর ঐতিহাসিক মহলে যেমন একটি সাড়া জাগে, ঠিক তেমনি আমাদের দেশেরই একদল লোক ধনরত্নসম্ভারের লোভে এই স্তূপের প্রত্যেকটি স্তর হাঁটকিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতে থাকে। এই লুণ্ঠনের লোভ সাঁচিস্তূপের চেহারাকে ক্ষত বিক্ষত করে রেখেছে।

গ্রামের সমতল থেকে চৈত্যগিরির উচ্চতা সামান্যই। হয়তো দু শ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু নয়। একালে প্রাচীন রাস্তা ছাড়াও অন্য একটি সুদৃশ্য পথ নির্মাণ করা হয়েছে। উপরে উঠে গেলে সামনেই বিস্ময় লাগে এই কথা ভেবে যে, এই বিরাট স্থাপত্য শিল্পকীর্তি শত শত বছর ধরে কি প্রকারে মাটি ও জঙ্গল চাপা পড়েছিল! বিগত পনেরো বছরের মধ্যে সাঁচি এবং চৈত্যগিরির উন্নতি হয়েছে অনেক। বন-বাগান, বাঁধান, পথ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সুদৃশ্য পুষ্পবীথিকা, বিশ্রাম নেবার ঘর—এগুলির সুবন্দোবস্ত হয়েছে।

সাঁচির সম্পর্কে একটি অভিমত স্পষ্ট। সম্রাট অশোক এই বৃহৎ

স্তূপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাল সপ্তম শতাব্দী অবধি, অর্থাৎ কম বেশী হাজার বছর ধরে সাঁচিস্তূপের উপরে নানা যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন নির্মাণ হতে থাকে। বিস্ময়ের কথা এই, চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বা হুয়েন-সাঙ—উভয়ের কেহই সাঁচিস্তূপের উল্লেখ কোথাও করেন নি। সাঁচিস্তূপের তৎকালীন নাম ছিল, 'কাকানবা'—অনেকে বলত, 'বোধশ্রী পর্বত।' এটি নিয়ে সিংহলী পুরাণে একটি গল্প আছে। "সম্রাট অশোক বিদিশাবাসী এক শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বধূব গর্ভে দুই পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। দুই পুত্রের নাম উজ্জেনীয় ও মহেন্দ্র। কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। সম্রাটেব স্ত্রী আপন অধ্যবসায়ে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করেন। এই বৌদ্ধবিহারটি বিদিশার নিকটবর্তী চৈত্যগিরি নামক একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত।" সেই কারণে সাঁচিস্তূপের অপর একটি প্রাচীন নাম হল, 'চৈত্যগিরি বিহার'। আড়াই হাজার বছর আগে এই চৈত্যগিরিতে আগমন কবেন গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং, এবং তিনি তাঁর দুই সুপ্রিয় শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গলায়নের অস্থির টুকরো দুটি প্রস্তরপাত্রে রেখে সহস্তে সমাধিস্থ করেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই, গৌতম বুদ্ধ চৈত্যগিরিতে কখনও এসেছিলেন, অথবা তাঁব জীবনে এই চৈত্যগিরির কোনওদিন কোনও যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা—ইতিহাসেব কোথাও এটির উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, এই ঘটনার দুই শতাব্দী পরে সম্রাট অশোক এই সমাধির খোঁজ পান এবং একটি বিশাল স্তূপ বানিয়ে এই পাত্র দুটিকে স্তূপের অভ্যন্তরে গচ্ছিত রাখেন, এবং তাদের উপরে একটি সাঙ্কেতিক প্রস্তরছত্র নির্মাণ করেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে জেনারেল কানিংহাম এই দুটি প্রস্তরপাত্র আবিষ্কার করে সোজা বিলাতে নিয়ে চলে যান—যেমন তাঁদের নিয়ে পালানো অভ্যাস! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ লণ্ডনের কর্তারা এই

অস্থি-অবশেষের পাত্র দুটি ভারতীয় মহাবোধি সোসায়েটির হস্তে প্রত্যার্পণ করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী উ নু এই পবিত্র দুটি পাত্র আপন মস্তকে ধারণ করে সাঁচিস্তূপের পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত 'বিহারে' পুনঃ স্থাপনা করার জন্য নিয়ে যান। ভারতীয় মহাবোধি সোসায়েটির তৎকালীন সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুও এই বিরাট পুনঃস্থাপন উৎসব সমারোহে সাঁচির স্তূপে উপস্থিত হন। সেই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত নেহেরু সিংহল থেকে আনা মূল বোধিবৃক্ষের একটি চারা উক্ত 'নববিহারের' সম্মুখে রোপণ করেন। সেই অশ্বত্থের চারাটি ইদানীং বেশ বেড়ে উঠেছে। এই সেদিনও আবার দেখে এসেছি।

সাঁচির বৃহত্তম স্তূপটির আশেপাশে আরও কয়েকটি স্তূপ বর্তমান। তাদের মধ্যে একটিতে আছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপ এবং মোগ্‌গলিপুত্তর অস্থি অবশেষ।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চৈত্যগিরির মালভূমিটি প্রস্তর প্রাকারে বেষ্টিত করা হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি স্তূপ এই বেষ্টনীর মধ্যে আসে। এই মালভূমিটি লম্বায় ৪০০ ও চওড়ায় ২২০ গজ। উত্তর প্রাকারের নীচেকার প্রাচীন পথটির নাম চিকনিঘাটি।

প্রধান স্তূপের চারিদিকে যে সুবৃহৎ প্রাচীর বেষ্টনী, সেটি বৌদ্ধস্থাপত্যকলার বিশ্ববিজয়ী সাফল্যের নিদর্শন। চারদিকে চারটি তোরণদ্বারের উপরে ভাস্কর্যের যে আলঙ্কারিক মহিমা, তার রাজকীয় সৌন্দর্য পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের পুরাকীর্তিতে নেই—একথা পৃথিবীঘোরা বিদেশী পর্যটকরাই বলে যায়। কিন্তু এর জন্য চারজন ইংরেজের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গিয়ে পৌঁছয়। তাঁরা হলেন, টেইলর, কোলে, কানিংহাম ও জন মার্শাল।

বেত্রবতীর পুল পার হলেই নাকি মহাপ্রাচীনের সেই রোমাঞ্চ রাজ্য বিদিশা—তা হবে। এখানে ওখানে মধ্যভারত এবং মধ্যপ্রদেশের

সংযোগে এখনও দেখা যাচ্ছে বিন্ধ্যগিরির শাখা-উপশাখা। এ যেন একদল দুরন্ত বালক—মা-বাপের অবাধ্য হয়ে যেখানে সেখানে বেরিয়ে পড়েছে।

মধুর বাতাস উঠেছে মধ্যভারতে। তন্দ্রা জড়ানো হাওয়ার মৃদু-গুঞ্জনে ভাসছে যেন কবেকার সেই বিস্মৃত যুগের ছোট ছোট কাহিনী। কিন্তু ট্রেন থেকে যে স্টেশনে এসে নামলুম, সেখানে প্রাচীনের কোনও কাহিনী দাঁড়িয়ে নেই। আধুনিককালের যে জনকোলাহলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম, সেটিকে বলা চলে রূঢ় বাস্তব। এই স্টেশনের নাম ভিল্‌সা, এবং এটি গোয়ালীয়রের অন্তর্গত। কবেকার সেই বিদিশা কোন্ মালোয়ারাজ্যের মধ্যে ছিল, সে যেন হারিয়ে গেছে কোন্ এককালেব রাষ্ট্রবিবর্তনেব মধ্যে। আমার চোখের তন্দ্রা ছুটে গেল।

মস্ত বাজার বসেছে ভিল্‌সা নগরে। মোটর বাস ছুটছে। এককালে যাদেরকে বলা হত শ্রেষ্ঠী, এখন তারা 'বেওপারি'। যারা ছিল বণিক, তারা বেনিয়া। রেডিয়োয় বা লাউড স্পীকারে গলাফাটা সঙ্গীত চলছে দোকানে-দোকানে। বড় বড় মারোয়াড়ীর গদি। জিলাপির দোকানে ভিড় জমেছে। বয়েল গাড়িতে গমের বস্তা চলেছে। ওখানে হাসপাতালে রোগীরা ঢুকছে। এ পথ দিয়ে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ওখানে মস্ত এক কলেজের ফটকে লেখা রয়েছে 'সম্রাট অশোক টেকনোলজিকাল ইনস্টিট্যুট।' সাইন বোর্ডে সম্রাট শব্দটি বলা দরকার, নইলে আজ অশোককে চিনবে না কেউ! ভুলে গেছে সবাই—একটি ধর্মাশোক জন্মাবার জন্য একলক্ষ নরমুণ্ডের দরকার হয়েছিল কলিঙ্গে!

পুলিস লাইনের পাশ কাটিয়ে আধুনিককালের এক ডাক বাংলায় সেদিন উঠেছিলুম। বিদিশার মৃত্যু হয়েছে—ভিল্‌সা উঠেছে দাঁড়িয়ে। এখন নবনগর একটি গড়ে উঠছে বিদিশার সেই শ্মশান প্রান্তরে। সেই প্রান্তর মুখরিত হবে নতুন কালের মানুষেব কলরবে।

তারা আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি সেই মহাজনতার। তাদেরই পথ প্রস্তুত হচ্ছে দেখে এলুম রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে—তারা এসে নতুন ভারত গড়বে! আরও অনেকেই আসছে মহামানবের সাগরতীরে!

কিন্তু সেই মালোয়ার অন্তর্গত ধর্মাশোকের বিদিশা—তাকে মনে রাখবে কি কেউ? সে রইল ভিল্‌সার বন্য অংশটায় লুকিয়ে—যে দিকটায় মন্থর বয়েল গাড়ি ধূলো উড়িয়ে চলেছে দূর দূরান্তরে।

মাইল চারেক মাঠ পেরিয়ে গেলে উদয়গিরির গুহাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। অনুচ্চ পাহাড় হয়তো বা এক শ ফুটের বেশী উঁচু নয় কিন্তু এমন জনহীন, লোকপরিত্যক্ত, এমন উপেক্ষিত যে, এর উপরে গিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় গা ছমছম করে! মোট বোধ করি কুড়িটি গুহা উপরে ও নীচে। এটি বৌদ্ধশ্রেণীর গুহা নয়—যেমন অজন্তা, কানেরি, বাগ প্রভৃতি। এগুলি প্রধানত হিন্দু পুরাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই পাহাড় পাথরের জটলায় আকীর্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ, আগাগোড়া ভগ্নাবশেষ, এবং প্রত্যেক অলিগলি বোলতা ও মৌমাছির চাকে বিপজ্জনক। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা নাকি এখানে ঢুকে মূর্তিগুলি ভেঙ্গে চুরমার করেছে। কিন্তু তারা ভাঙ্গল কেন, তার ইতিহাসটি কোথাও স্পষ্ট শোনা যায় না। যাদের হাতে হাতুড়ি ছিল, তারাও এখানকার ধূলোয়-ধূলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! পাহাড়ের পাদমূলে শঙ্করনারায়ণ, উপরে জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, গহ্বরের মধ্যে পাঁচ-ছয় হাত উঁচু একটি অশোকস্তম্ভ—পরিশেষে পার্শ্বনাথের নাককাটা, হাত ভাঙ্গা—কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি! দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে। সমগ্র উদয়গিরি যেন বিপুল এক ধ্বংসাবশেষ।

পঞ্চম শতাব্দীতে উদয়গিরির গুহাগুলি কাটা হয়। একটি গুহায় লিখিত, 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মালোয়া জয় করে তাঁর সমর ও শান্তিসচিবকে সঙ্গে নিয়ে এই উদয়গিরি দর্শন করতে এসেছিলেন।'

যিনি উদয়গিরির পাথর কেটে-কেটে গুহাগুলি কুঁদে বার করেছিলেন, তাঁর নাম হল, বীরসেন। নীচের দিকে এসে পাঁচ নম্বর মূর্তিটির দিকে চোখ পড়ে। এটি সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। এই মূর্তিটিতে সাধক-ভাস্কর ও মহৎ শিল্পী বীরসেনকে চিনতে পারা যায়। ছবিটি হল একটি বরাহমূর্তির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব। মাথাটি বরাহ, দেহ মানুষের। বাম-পদের দ্বারা এই মূর্তিটি নাগরাজের বহুধা-মস্তক মথিত করছে, এবং দক্ষিণের বিলম্বিত দন্তের দ্বারা দেবী ধরিত্রীর তনু-দেহটিকে প্রলয়পয়োধি জলরাশির ভিতর থেকে উদ্ধার করে তুলছে। এই মূর্তিটির মধ্যে যে প্রবলতা, যে তেজস্বিতা যে পরিকল্পনা এবং ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে—সেটি অন্য কোথাও দুর্লভ। এই মূর্তিটি সমগ্র উদয়গিরির মূল প্রকৃতিকে যেন উদ্‌ঘাটন করেছে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা এটিকে যে ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে নি, তাই রক্ষা। শুধু তাই নয়, এখান থেকে মাত্র মাইল ছয়েক দূরে সাঁচিস্তূপের খবর তারা পায় নি—পেলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যেত!

উদয়গিরির ক্ষুদ্র পাহাড়টির তলা দিয়ে বয়ে চলেছে একটি অপ্রশস্ত নদী। নদীটির নাম 'বেশ!' কেউ কেউ এটিকে বলে 'ব্যাস।' এই নদীটির এপারে-ওপারে রয়েছে কয়েকটি জীর্ণ ফাটলধরা মন্দির। ধোপারা কাপড় কাচছে ঘাটে, পাথুরে চর জেগে উঠেছে নদীর এখানে ওখানে—যেমনটি দেখেছি নাসিকের পঞ্চবটীর সীমানাস্থিত গোদাবরীতে! এখানে অদূরে বয়ে চলেছে বেতোয়া, প্রাচীনকালের বেত্রবতী।

বেশনদী পেরিয়ে আবার ফিরে এলুম বেশনগরে। এটি সেই বিদিশারই একটি অংশ। চারিদিকে অনুন্নত গ্রামাঞ্চল, ঝোপ-জঙ্গল, দরিদ্র চাষীপল্লী, জীবনযাত্রার দীনতা—সব মিলিয়ে রয়েছে পাশাপাশি। একটি পথ চলে গিয়েছে পূর্বদিকে বোধ হয়। এখানে ওখানে স্বল্পবিত্তরা সাহস করে দুচারখানা ঘর তুলেছে। পথেরই

দক্ষিণ পাশে ফিরলুম। একটি প্রাচীরঘেরা মাঠে এসে দাঁড়ালুম। সামনেই একটি স্তম্ভ উঠেছে দাঁড়িয়ে—নীচেটা একটি প্রস্তর-বেদী। এটির নাম 'খাম্বাবা।' খাম্বাবার অর্থ বুঝি নে, শুধু সরু লম্বা উঁচু—কিছু একটা বোঝায়। ওপাশে বস্তিতে মেয়েরা 'গোহার' অর্থাৎ ঘুটে দিচ্ছে চালার দেওয়ালে; তার পাশে চ্যালাকাঠের আড়ত। এপাশে শ্রমিকদের ঘর। এখানে ওখানে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এই লম্বা পাথরের স্তম্ভটাকে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা বুঝি মাঝে মাঝে পূজো করে যায়। এর বেশী এ অঞ্চলের লোকেরা এই 'খাম্বাবার সম্বন্ধে আর কিছু জানে না!

যূথভ্রষ্ট খাম্বাবা যেন গ্রামের মধ্যে হঠাৎ উঠেছে দাঁড়িয়ে মস্ত এক অসঙ্গতির মত। একালের জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত গ্রাম-বাসীদের নিত্য আনাগোনার পথে এই কুড়ি ফুট উঁচু প্রস্তরস্তম্ভটা যেন সকলের মনে কাঁটার মত বেঁধে। এটার সম্বন্ধে ঘোরতর উপেক্ষা, অনাদর এবং ঔদাসীন্য দেখলে এই কথাই মনে হয়, এ বালাইটাকে যদি কেউ রাতারাতি ভেঙ্গেচুরে এর পাথরের ডেলা-গুলো কাজে লাগায়—তাহলে কোনও দিক থেকে ক্ষোভ করবার কিছু থাকবে না। এখানে এসে বেশ বুঝতে পারা গেল, খাম্বাবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কারও নেই।

কিন্তু ঔৎসুক্য আছে প্যারিসে, রোমে, ওয়াশিংটনে, সিডনীতে টোকিয়োয়, মস্কোতে, ডাবলিনে, এমন কি কায়রোতে, বাগদাদেও—যেখানে ভারত গভর্নমেণ্টের ট্যুরিস্ট বিভাগের লোক এইসব দেশে প্রচারপত্র ছড়িয়ে পর্যটকদের আমন্ত্রণ করেন। তাদের দেশের লোক যখন এই 'খাম্বাবার' সামনে এসে দাঁড়িয়ে নোট বইতে নানা কথা টুকতে থাকে, বেশনগরের গ্রাম-বাসীরা তখন বেশ একটু কৌতুক বোধ করে। এমন একটা অনাদৃত হতভাগ্য এবং অকিঞ্চিৎকর স্তম্ভের কাছে কোথাকার 'উজবুক' এক সাহেব এসে দাঁড়ালে গ্রামের তরুণী পসারিনীরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে চলে

যায়। কিন্তু আমার মতন স্বদেশী পর্যটককে দেখলে কোন দিক থেকে কেউ মুখ ফিরিয়েও তাকায় না।

অপরাহ্ণকালের সেই রৌদ্রে খাম্বাবার বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে সেই সকালের মালোয়ারাজ্যের গৌরবযুগের গল্পটা আরেকবার মনে পড়ে গেল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশীলা ও পাঞ্জাবের ইন্দো-ব্যাকট্রিয়ো নরপতি অ্যান্টিয়ালকিদস তাঁর নিকট-আত্মীয় ডিয়ন নামক এক সভাসদের পুত্র রূপবান তরুণ রাজকুমার শ্রীমান হেলিওডোরাসকে পাঠিয়েছিলেন মালোয়ারাজ্যে রাজদূত-রূপে। তখন মালোয়ারাজ্যের বনেজঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তক্ষশীলার গ্রীক নরপতি আপন রাজ্যকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার জন্য হস্তী-লাভের বাসনা জানিয়েছিলেন। বহিঃশত্রু দমনের জন্য তাঁর একটি হস্তীবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, গ্রীক রাজকুমার সুদর্শন হেলিওডোরাস তাঁব উন্নত দেহ, আয়ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, মধুর হাসি ও সুগৌরবর্ণ স্বাস্থ্যশ্রী নিয়ে যখন মালোয়ার রাজা ভগভদ্রের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর অ-ভারতীয় দেহকান্তি দেখে মালোয়ারাজ্যে বিস্ময়ের ঝড় উঠেছিল। তরুণী রাজকন্যা মাধবিকা এই ব্যক্তির সম্পর্কে একটু যেন কৌতূহল বোধ করেন। নূতন রাজদূত অল্পকালেই জনপ্রিয় হন।

রাজা ভগভদ্রের পুত্র সমর-কৌশল শিক্ষার জন্য তৎকালে তক্ষশীলায় যান, এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিরাময় কবে তোলেন হেলিওডোরাস এবং তাঁর জননী। সেই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ মালোয়ার রাজপরিবারে হেলিওডোরাস অপত্যস্নেহ লাভ করেন, এবং তাঁর মিষ্ট ব্যবহার, সৌজন্য এবং রূপশ্রীর প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হন। রাজকন্যা মাধবিকার সহিত তরুণ গ্রীক রাজকুমারের মধুর পরিচয় ঘটে।

অতঃপর বসন্তঋতুর আবির্ভাবে এই বিদিশার বনে-বনে যখন শাল-পিয়াল-তমালের শাখায়-শাখায় পুষ্পমঞ্জরী দেখা দেয়, এবং

সমগ্র মালোয়ায় যেদিন বসন্তোৎসবের দিনে ফাগুয়ার রক্তবর্ণে চারিদিক রাঙ্গা হয়ে ওঠে, সেইদিন রাজকন্যা মাধবিকা যখন ঝুলনের দোলায় আপন দেহলতাকে দুলিয়ে পুষ্পবীথিকার উপরে মাঝেমাঝে তাঁর চরণাঘাত করছিলেন, তখন পশ্চিমের রক্তরাঙ্গা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তরুণ গ্রীকরক্ত ওই ঝুলনের দোলনাব মতই দুলে উঠেছিল। কুণ্ঠাজড়িত পদে এগিয়ে এলেন রাজকুমার হেলিওডোয়াস হাসিমুখে। কিন্তু রাজকন্যার দেহলাবণ্যশ্রীর দিকে চেয়ে তাঁর কণ্ঠের ভাষা গিয়েছিল জড়িয়ে। খৃষ্টপূর্ব সেই দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন নি যে, তাঁর কাব্যের একটি টুকরাও হেলিওডোরাসের কণ্ঠস্থ থাকবে। রবীন্দ্রনাথও তখন ছিলেন না যে, রাজকুমার সেই মধুরলগ্নে রাজকীয় প্রণয় সম্ভাষণ জানিয়ে বলবে, 'কাননে যত কুসুম ছিল ফুটিল তব পায়ে—' সুতরাং ছেলেটি শুধুই বলল, 'যদি আমি পুষ্পবীথিকা হতে পারতুম, দেবীর চরণ স্পর্শে ধন্য হতুম!'

মাধবিকা সলাজনম্র হাস্যে সেই প্রশস্তি-সম্ভাষণ গ্রহণ করে রাজকুমারের প্রণয়াসক্তা হলেন। কিন্তু এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে মালোয়ারাজ ভগভদ্র তাঁর রাজধানী থেকে হেলিওডোরাসকে বিতাড়িত করেন। বিদায় নেবার কালে মাধবিকা অশ্রুপাত করে বললেন, আমি তোমার বাগদত্তা স্ত্রী! তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে না কোনদিন! তুমি আজ থেকে কায়মনোবাক্যে মালোয়ার কুলদেবতা বাসুদেবের ভজনা কর। তিনি মুখ তুলে তাকাবেন!

শ্রীবাসুদেব মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন—ইতিহাস এইটি বলে। বিরহ-বিধুরা রাজকন্যা দীর্ঘদিনের অন্তর্বেদনায় যখন একদিন শীর্ণ তনুলতা নিয়ে শয্যাগ্রহণ করেন, সেইদিন মালোয়ারাজের টনক নড়ে। কন্যার অবস্থা দেখে মাতা ও পিতা অশ্রুবিগলিত হন। সেই অশ্রু সেইদিন হিন্দু ভারতের সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আত্মীয় সম্পর্ককে সঞ্জীবিত করেছিল।

তরুণ হেলিওডোরাস তখন তপস্বী এবং ঘন বনপথে একটি কুটীরের অধিবাসী। বাসুদেবের পূজার্চনায় তাঁর দিন কাটে। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী—সন্ন্যাসব্রতী। সনাতনী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে 'পরম ভাগবত' আখ্যা দান করেন। তিনি সেদিন বৈষ্ণবের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। অতঃপর হেলিওডোরাসের সঙ্গে মাধবিকার বিবাহ হয়, এবং সেই গ্রীক রাজকুমার বাসুদেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে গরুড়-স্তম্ভটি নির্মাণ করেন গ্রীক-ভারত মৈত্রীর প্রতীক স্বরূপ—আমি সেইটির গায়ে হেলান দিয়ে একটু আগে আমার দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরিয়ে ছিলুম।

স্তম্ভগাত্রে ব্রাহ্মীলিপিতে এই কাহিনীর মর্ম কথাটি উৎকীর্ণ করা আছে! চারিদিকের সেই মহাধূলিরাশির মধ্যে সেদিন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সুপ্রাচীন বিদিশাকে দর্শন করে অতঃপর আমি অবন্তীদেশের দিকে অগ্রসর হয়েছিলুম।

॥ চম্বল থেকে সরস্বতী ॥

মধ্যভারতকে অনেকে অনেকবার বলে গেছে রূপক-রাজ্য। বোধ হয় ইংরেজ আমলে সর্বাপেক্ষা কম পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল এই মধ্যভারতে। এই রাজ্য—অনেকটা রাজস্থানের মত—চিরদিন মানুষের মনে যুগিয়ে এসেছে পরীরাজ্যের স্বপ্ন এবং পক্ষীরাজের রস-কল্পনা! মানুষের শৌর্য, বিক্রম, আত্মত্যাগ, প্রেম, দুঃসাহস এবং বিবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনীতে আজও মধ্যভারত পরিপূর্ণ। মানব-দেহের প্রতি অঙ্গের রক্ত চলাচলের প্রভাব যেমন হৃৎকেন্দ্রকে নিত্য নিয়ত পুষ্ট করে রাখে—মধ্যভারত ঠিক তেমনি চারিদিকে তার শিরা-উপশিরা প্রসারিত করে এতকাল আপন মনে স্পন্দিত হচ্ছিল।

বাইশ বছর আগে প্রথম যেদিন গোয়ালীয়রে পৌঁছেছিলুম সেদিন মহাষ্টমী। বাংলার বাইরে এটির নাম হল, 'দুশেরা' বা দশহরা!

মধ্যভারত তখনও নিবিড় তন্দ্রায় নিমীলিত। সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে ইংরেজ মধ্যভারতকে আর কোনদিন বিশ্বাস করে নি, এবং মধ্যভারতের আশি লক্ষ নরনারী ইংরেজকে কোনদিন প্রীতির চক্ষেও দেখে নি। এর ফলে ইংরেজের বক্রচক্ষু প্রায় এক শ বছর ধরে এই মধ্যভারতের প্রতি সদাজাগ্রত ছিল, এবং এই তন্দ্রাচ্ছন্ন মধ্যভারতই অনেকের মত গোপনে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের হাতে টাকা দিত।

ভারতের এই অঞ্চল একদিকে চিরদিন দস্যু সমাকীর্ণ—তারা মাঝে মাঝে স্থানীয় সামন্ত নরপতিদের সঙ্গে যদি বা হাত মিলিয়েছে, দিল্লীর নিকট তারা মনে প্রাণে কখনও বশ্যতা স্বীকার করে নি। তারা আজও সেই সামন্ত যুগকেই বোধ করি ধরে রাখতে চায়,

স্বাধীন ভারত তারা বোঝে না। সেই কারণে এই সেদিন যখন মোট পঁচিশটি সামন্তরাজ্য নিয়ে বৃহৎ মধ্যভারত গড়ে উঠল, তখন দিল্লীর নাকের উপর কলা দেখিয়ে এই মধ্যভারতেই চম্বল-বেত্রবতী-সিন্ধু ইত্যাদি নদী ও পশ্চিম বিন্ধ্যগিরির আশে পাশে সামন্ততন্ত্রের স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠল বিরাট একটি দস্যুতন্ত্র! তাদের সেই পুরনো কালের দিল্লী-বিরোধিতা আজও রয়ে গেছে মধ্যভারতের মর্মে মর্মে। কিন্তু এই দস্যুতন্ত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশেষ 'নীতি ও শৃঙ্খলার' মধ্যে। এরা চুরি করে না, ডাকাতি করে! এরা হত্যা করতে এবং হত হতে ভয় পায় না। প্রিয়ব্যক্তির অপমৃত্যুর সংবাদ শুনেও এরা অশ্রুজলের মধ্যেও গৌরব বোধ করে। লুণ্ঠিত সম্পদের দ্বারা এরা আপন রাজ্যপাট পরিচালনা করে। এরা নাকি দানশীল, নীতিপরায়ণ, শিবশক্তির উপাসক, মহারণ্যচারী। এদের নিজস্ব 'বিচার-শালা, গ্রামপঞ্চায়েৎ, জমিবণ্টন ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়' ইত্যাদি প্রায় সমস্ত রকমের ব্যবস্থাপনা আছে। আজও দিল্লীর কাছে এরা আত্মসমর্পণ করে নি। গোয়ালীয়র, ভিন্দ, ঝাঁসি ইত্যাদি অঞ্চল এদের বিচরণক্ষেত্র।

প্রাচীন মধ্যভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য বর্তমান। বোধ হয় অপর কোথাও ভারতের কোনও রাজ্যে এতগুলি স্মৃতিসৌধ এবং স্থাপত্য-কীর্তি নেই—যেমনটি আছে মধ্যভারতে। এমন তার বৈচিত্র, এত তার ব্যাপকতা, এমন তাদের সৌন্দর্য-মহিমা—যেগুলি পূর্বভারতে এক প্রকার দুর্লভ। পূর্বভারতে 'স্মৃতি' আছে অনেক, কিন্তু 'সৌধের' সংখ্যা অল্পই। মধ্যভারতে প্রায় প্রত্যেকটি স্থাপত্যকীর্তি জাগ্রত—তারা প্রতিটি সামন্ত রাজ্যের প্রকৃতিগত ঐতিহ্য বহন করে। বিগত দু হাজার বছর ধরে প্রায় দু হাজার স্মৃতিসৌধকে তারা উজ্জ্বল করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকের পিছনে যে ইতিহাস, সেটি শুধু মধ্যভারতের নিজস্ব নয়, সেটি উত্তর ভারতেরই ইতিহাস। গোয়ালীয়র সেই প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে। মধ্য-ভারতই ভারতবর্ষের হৃৎকেন্দ্র!

গোয়ালীয়রের সর্বপ্রধান আকর্ষণ গোয়ালীর দুর্গ। এই বিরাট দীর্ঘলম্বিত দুর্গটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা এবং আধ মাইলেরও বেশি চওড়া। এই দুর্গটি একটি টিলাপাহাড়ের উপর অবস্থিত। কিন্তু এটির প্রথম নির্মাতা কে, ইতিহাসে সে-বিষয়ে তর্ক রয়ে গেছে। এই দুর্গের নির্মাণ কর্ম প্রথম আরম্ভ হয়, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। সম্ভবত এই তর্কের ভিতর থেকেই দু-একটি কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে ঘোরে। কিন্তু অধুনা ভারত সরকার বিশেষ ভাবে যে কিংবদন্তীটির উপর আস্থা স্থাপন করে তাঁদের প্রচার-পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন, সেটি এই: "গোয়ালীয়র অঞ্চলে এক কালে একজন সামান্য শাসন কর্তা ছিল, এবং তার নাম ছিল সূর্যসেন। সূর্যসেন ছিল কুষ্ঠরোগী। বয়সে ছিল তরুণ। একদিন সে একটি হরিণের পিছনে দৌড়তে থাকে শিকারের লোভে। প্রাণভয়ে ভীত হরিণ পলায়ন করে একটি বিশেষ টিলা পাহাড় পেরিয়ে যেন কোন দিকে। রৌদ্রে ও পথশ্রমে কাতর হয়ে অবশেষে সূর্যসেন তৃষ্ণার জল অন্বেষণ করতে থাকে। এক সময় এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে সে কাতর ভাবে পানীয় জল প্রার্থনা করে। সন্ন্যাসী দয়ার্দ্র হয়ে সূর্যসেনকে নিয়ে অদূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র কুণ্ডের ধারে আসেন এবং পানীয় জলের উপর মন্ত্রপাঠ করে সেই জল রাজকুমারকে দেন। জল পানের অব্যবহিত পরে সূর্যসেন দেখতে পায় তার কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে। তখন সে কেঁদে পড়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে—তুমি আমার ত্রাণকর্তা, তুমি যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করব! তোমার পরিচয় দাও।

সন্ন্যাসী বলে, আমার নাম 'গোয়ালিপা'। আমার আদেশ হল, প্রথমে তুমি ওই কুণ্ডটিকে সংস্কার করে ওটিকে একটি জলাশয়ে পরিণত কর। তারপর এই পাহাড়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দাও।

অতঃপর কালক্রমে জলাশয়টির নাম হয় 'সূরযকুণ্ড', এবং বলা বাহুল্য, গোয়ালিপার নাম থেকে হয় গোয়ালীয়র! গোয়ালিপা

সূর্যসেনের নূতন নামকরণ করেন সূর্যপাল, নির্দেশ দেন—এই 'পাল' উপাধিটি পরবর্তী প্রত্যেক নরপতিব নামের পাশে ব্যবহার করা চাই। কিন্তু এই আদেশের ব্যতিক্রম ঘটে তেজকরণ নামক এক নরপতির কালে। তিনি বছরখানেক পরে তাঁর শাসনকার্যের ভার "পরিমলদেব প্রতিহার" নামক এক পরিষদের উপব অর্পণ করে প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রে বিবাহ করতে যান। সেই যাওয়াই তাঁর কাল হল। বছরখানেক ধরে নববধূর সঙ্গে মধুযামিনী যাপন করে আপন রাজ্যে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ওই পূর্বোক্ত পরিমলদেব তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ান। পালগোষ্ঠীর রাজত্ব ওইখানেই শেষ হয়। দাঁড়িয়ে থাকে শুধু গোয়ালীয়র!

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে যখন তৈমুরলঙ্গ প্রমুখ তাতার আক্রমণ ঘটে, সেই গণ্ডগোলের মধ্যে 'তোমর' বংশের বীরসিংদেও গোয়ালীয়রকে স্বাধীন এবং নিজকে তার অধিপতি ঘোষণা করেন। তারই কাল থেকে গোয়ালীয়র সম্পদে, ঐশ্বর্যে ও শিল্পকলায় প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এই 'তোমর' গোষ্ঠীর বংশধর হলেন রাজা মানসিং। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পদে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমগ্র গোয়ালীয়রেব সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করেন। গোয়ালীয়র দুর্গের অপর একটি নাম তাঁরই নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে "মানসিং কিল্লা বা মানমন্দির" নামে পরিচিত হয়েছে।

রাজা মানসিং গোয়ালীয়র দুর্গের ভিতরে যে সুবৃহৎ প্রস্তব-প্রাসাদটি নির্মাণ করেন, ভারতের স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ সেটি "মানমন্দির" নামেই আজও ওই দুর্গে স্বগৌরবে দণ্ডায়মান। তার ভিতর ও বাহিরের স্থাপত্যশিল্প এবং ভাস্কর্য একালেও লক্ষ লক্ষ স্বদেশী ও বিদেশী পর্যটকের প্রশংসা অর্জন করে।

রাজা মানসিং সম্বন্ধে একটি মধুর গল্প প্রচলিত আছে। একদা মৃগয়ার কালে কোনও এক গ্রামে গিয়ে একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে তিনি দেখতে পান। মেয়েটির নাম "মৃগনয়না"। এই প্রকার নাম

কেন তার রাখা হয়েছিল, সেটি তার তুই দীর্ঘায়ত আশ্চর্য চক্ষুতেই প্রকাশ পাচ্ছিল। পরম্পরায় ওই গ্রামেই শোনা গেল, সম্প্রতি এই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি একটি বন্য মহিষের সঙ্গে লড়াই করে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে পদানত করে। শারীরিক শক্তির জন্য মেয়েটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা মানসিং মেয়েটির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তার পাণিপ্রার্থনা করলেন। গুজর-কন্যা মৃগনয়না তার সম্মতি জানাল। কিন্তু সে গ্রামের মেয়ে বলেই মধুর সরলতার সঙ্গে একবার প্রশ্ন করল, তোমার তুর্গের মধ্যে আমাদের 'রাই নদী' আছে তো ?

সুদর্শন তরুণ মানসিং খুব হাসলেন। বললেন, রাই নদীটি যদি সমতল ভূমি থেকে ওই তুর্গেব পাহাড়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে তোমার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেও যাবে বইকি। তোমাকে ছেড়ে সমতলে সে থাকবে কেমন করে ?

খুশী হল মৃগনয়না। অতঃপর রাজা মানসিং "গুজর মহলটি" নির্মাণ করেন, এবং একটি কৃত্রিম নালীর দ্বারা পাহাড়ের উপরে সেই রাই নদীর প্রবাহটিকে নিয়ে আসেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুপ্রসিদ্ধ মারাঠা যোদ্ধা মাধব রাও সিন্ধিয়া গোয়ালীয়র তুর্গ জয় করেন এবং তাঁরই বংশ গোয়ালীয়রে রাজত্ব করতে থাকে। আজও তাঁরাই 'রাজপ্রমুখ' হয়ে রয়েছেন। এই তুর্গটির মধ্যে প্রবেশ করলে যেন সেই দেড় হাজার বছরের থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ তাদের সমস্ত অলঙ্কার আভরণ এবং তথ্যাদি নিয়ে কথা কইতে থাকে।

এক হাজার বছব বয়সের একটি দেবস্থাপনার সামনে এসে আজ আমি যেন দাঁড়ালুম ক্ষুদ্র এক মানবকের মত। যুগযুগান্ত কেটে গেছে। এমন বিশাল এবং বিস্ময়প্রদ স্থাপত্যকীর্তি সমগ্র ভারতের মধ্যেও আছে অল্পসংখ্যক। সম্মুখভাগের সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে হতচকিত হয়ে সেদিন আমাকে থামতে হয়েছিল। এই দেবস্থাপনাটির নাম 'তেলিকা মন্দির'। এটি এক শ ফুট উঁচু।

এর বিস্তৃতি এবং প্রশস্তরূপ বিস্ময় আনে মনে। এর গাম্ভীর্যের যে মহিমা—সেটি দর্শককে বিমূঢ় করে তোলে। এর শোভা সৌন্দর্য এবং ভাস্কর্য পৃথিবীর যে কোনও ইঞ্জিনীয়ারকে অভিভূত করতে সমর্থ। এর তুলনা নেই।

শুনতে পেলুম এই 'তেলিকা মন্দির' নির্মাণ করেন দক্ষিণ তেলেঙ্গানার অধিবাসী তেলেগু ভাষাভাষী প্রস্তরশিল্পীরা। তাঁরা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে-এই মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দেন। এই মন্দিব দ্রাবিড় স্থাপত্যকলার আদর্শে কোণাকার বা মোচাকার শীর্ষ লাভ করে। এই স্থাপত্যে ইন্দো-এরিয়ান এবং দ্রাবিড়ীয় শিল্প একটি মহৎ মিলনক্ষেত্রে রূপায়িত হয়।

এর পর শুধু একে একে দেখে যাওয়া! সমগ্র গোয়ালীয়র দুর্গটি সমতল প্রান্তবের তিন শ ফুট উঁচুতে। বহু-দূর-দেশাঞ্চল থেকে এই বিশাল দুর্গ পর্যটকের দৃষ্টি অকর্ষণ করে। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার জন্য মোট পাঁচটি বৃহদাকার তোরণ দেখা যায়। আলমগিরি, হিন্দোলা, গণেশ, লক্ষ্মণ এবং হাতী দরওয়াজা—মোট পাঁচটি গেট। আরেকটি তোরণ আছে, তার নাম উববাহী—এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বানানো হয়।

মানমন্দির প্রাসাদের প্রবেশ পথ হল 'হাতী দরওয়াজা'। কেননা হাতী হল ভারতের সম্পদের প্রতীক। মানমন্দিরকে আরেকটি নামে পরিচিত করা হয়—সেটি "চিত্র মন্দির" যেহেতু এই মনোরম ও বৃহৎ প্রাসাদ বিভিন্ন ও বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত। রাজা মানসিংয়ের প্রিয়তমা মহিষী মৃগনয়না ছিলেন পার্বত্য গুজর জাতির কন্যা। সেই কারণেই বিশেষ অংশটির নাম হয়েছিল 'গুজর মহল'। এই মহলেরই মধ্যে একটি প্রত্নতাত্বিক যাদুঘরে নানা যুগের নানা সামগ্রী দেখা যায়। ঐতিহাসিকদের পক্ষেও সেটি অতি মূল্যবান দ্রষ্টব্য বস্তু।

এরপর আসে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মন্দির, এবং "শাশ-বহু" মন্দির।

'শাশ-বহু' অর্থে 'শাশুড়ী ও বউ'। দুটি মন্দির প্রায় পাশাপাশি। এমনতর কৌতুকজনক নাম এ দুটি মন্দিরের কেন হল, তার যথাযথ জবাব আজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নামেই এই বৃহৎ এবং বৃহত্তর মন্দির দুটি সেই একাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকেই চলে আসছে। বড় মন্দিরটি সত্যিই বড় এবং এটি শ্রীবিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত। এ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রাজা মহীপাল ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে। ছোটটিও শ্রীবিষ্ণুর নামাঙ্কিত।

একটি বিষয় খুব স্পষ্ট। গোয়ালীয়র দুর্গের পাথরে-পাথরে ভারতের সকল যুগের ইতিহাস যেন খোদিত। সেই গুপ্তযুগ থেকে একালের ইংরেজ যুগ—একে একে তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। গোয়ালিপা সন্ন্যাসীর স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে কে যেন একটি মসজিদ বানিয়েছিল, সেটির অবশেষ আজও আছে। জৈন স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন এখানে ওখানে ছড়ানো। জৈনদের মোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের নগ্ন মূর্তিগুলি দুর্গপ্রাকারে খোদিত। আদিনাথের মূর্তিটি সাতান্ন ফুট উঁচু এবং মূর্তিটির দুখানা পা নয় ফুট লম্বা। দুর্গের ভিতরে যে মস্ত উদ্যানটি রয়েছে, সেটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামাঙ্কিত। সব যুগই যখন রয়েছে, ইংরেজের চিহ্নও কিছু থাকুক!

রৌদ্র টা-টা করছিল। ক্লান্ত পা আর চলতে চায় না। এক সময়ে মানমন্দির থেকে নেমে এলুম।

শহর বাজারের এখানে ওখানে যে সকল দৃশ্য প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি গোয়ালীয়রের ভারতীয় রূপ। পাথরের জাফরি ঢাকা ছোট ছোট জানলা, অলঙ্কৃত করা পাথরের খিলান—যেগুলি কাশীর মহাজনটোলা বা বিশ্বেশ্বরগঞ্জে চোখে পড়ে। আগ্রা এবং লক্ষ্ণৌর গলিঘুঁজির দুধারে উঁচু রোয়াকওয়ালা যে খুপরিযুক্ত বাড়িগুলি—এখানে সেগুলি যেন বিশেষ একটি ছাপ পেয়েছে। কলকাতার

চৌরঙ্গী অঞ্চল, বোম্বাইয়ের ফোর্ট অঞ্চল, মাদ্রাজের গ্র্যাণ্ট রোড, দিল্লীর কনট্ প্লেস—এগুলি ভারতীয় নয়। আধুনিক একটি মহানগর —পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় একটি অপরটির অনুকরণ। তারতম্য সামান্যই। কিন্তু নাসিকে গিয়ে গোদাবরীর ঘাটের ধারে দাঁড়াও, উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের নীচে নামো, কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে ওই শ্মশানের ধারে সেই আধ-ডোবা হেলানো মন্দিরটির পাশ দিয়ে একটা ডুব দিয়ে ওঠ—দেখবে তুমি—সেখানে কোনও দেশের অনুকরণ নেই, সেখানে যেন আশ্চর্য একটি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের একটি চেতনা যেন মনকে পেয়ে বসে। এরা যেন ভারত-আত্মার বস্তু-মূর্তি।

গোয়ালীয়বেব প্রান্তরে সম্রাট আকবরের আমলের নবরত্নদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের সমাধিটি একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। তাঁর সমাধির উপরে ছায়া পড়ে একটি তেঁতুল গাছের। তানসেন তাঁর গানের আগে বুঝি তেঁতুল পাতা চিবোতেন। এতে নাকি কণ্ঠস্বরের মাধুর্য এবং পবিচ্ছন্নতা ঘটে। তানসেনের কবরের পাশেই যে বিরাট সমাধিমন্দিরটি দাঁড়িয়ে সেটি সম্রাট আকবরের দীক্ষাগুরু ঘাউস মহম্মদের। ইনি সেকালের একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। এই সমাধি মন্দিরেব নির্মাণ পদ্ধতি, এর মিনার, গম্বুজ, পাথরের জাফরি, এর খিলান—সমস্তগুলি মিলিয়ে প্রথম মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্পের সুপরিচয় দেয়।

এর পরে যা রইল তা একালের স্থাপত্য। তবু 'জয়বিলাস' প্রাসাদ বা মোতিমহল, কিংবা জয়াজী চৌক—এরা অসামান্য স্বাতন্ত্র্য বহন করছে। নির্মাণকাল আধুনিক বটে, কিন্তু নির্মাণ পদ্ধতি ভারতীয় ঐতিহ্যের বাইরে নয়। রাতারাতি আমেরিকা বা ইউরোপ ঘুরে এসে বিশেষ মডেলের বাড়ি ঘব বানাবার চেষ্টা নেই। সেখানে গোয়ালীয়র তার তিল মাত্র বৈশিষ্ট্য হারায় নি, এবং এই ব্যাপারে পরদেশীয় কোনও ছাঁচের সে তোয়াক্কা করে না।

সিপাহী বিদ্রোহের কালে গোয়ালীয়র আঠারো হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসির রাণীর পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। সেনাপতি ছিলেন তাঁতিয়া তোপি একদিকে, লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন অন্য দিকে। তরুণী লক্ষ্মীবাঈয়ের পালিত শিশুপুত্রটি গঙ্গাধর রাওয়ের উত্তরাধিকারী বলে ইংবেজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নি—এজন্য রুদ্ধ আক্রোশ রাণীর বুকের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল। তা ছাড়া তিনি সামান্য মাসোহারা নিয়ে সরে যাবেন আপন রাজ্য বিসর্জন দিয়ে—এটি তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল। ইংরেজের অন্যান্য রাজনীতিক কৌশল-চক্রান্তও সেই সময় রাণীর মর্যাদাকে বিপন্ন করতে চেয়েছিল। তিনি সেই ১৮৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী স্লোগান তুলেছিলেন, 'মেরি ঝাঁসি নহি দুংগী।' ইতিহাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা এই, সেই কালে ইংল্যাণ্ডের রাজ সিংহাসনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পর-রাজ্য লোভের প্রতি ইংরেজের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ও সমর্থন ছিল।

ঝাঁসির রাণী রণতরঙ্গ পৃষ্ঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন পররাজ্য অপহারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য দলের মাঝখানে। তাঁর হাতে ছিল রক্তাক্ত তরবারি—সেই তববারি হস্তে রণোন্মত্তা রাণী গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃতদেহে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেটি ১৭ই জুন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর সমাধি মন্দিরটি রয়েছে একটি বাগানের মধ্যে। কিন্তু সেদিনকার রাণীর বুকের রক্ত ব্যর্থ হয় নি। সেই রক্তের থেকে তিলক তুলে নিয়েছিলেন পরবর্তী নব্বই বৎসর কালের রাজনীতিক নেতারা। সেই রক্তেই অন্য একটি তারিখ আরেকদিন লেখা হয়েছিল—সেটি ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ!

গোয়ালীয়র থেকে আগ্রার দিকে আসতে গেলে ঢোলপুর মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের রেলপথ। ঢোলপুর রাজ্যটির সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কে, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কেউ বলে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার

বছর আগে ঢোলপুরের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ বা বলে রাজা মালদেও এটি নির্মাণ করেন। রাজা মালদেও কে, এবং কবে ছিলেন, অথবা তাঁর ভিন্ন পরিচয় কি—এ আমি জানি নে। আমাদের দেশে অনেক ইতিহাস গড়ে উঠেছে শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে অনেকেই। বারংবার পুনরুক্তি করার ফলে অনেক অসত্য সত্য হয়ে উঠেছে। মালদেওর পর স্বভাবত আরও অনেক নরপতি ঢোলপুরে এসেছেন এবং চলেও গেছেন—কিন্তু ঢোলপুরেও তার আনুপূর্বিক রেকর্ড নেই! তবে শেরসাহ যখন এসেছিলেন, তখন থেকে তারিখ আর ভুল হয় নি! সেটি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ। শেরসাহ সম্রাট হয়ে ঢোলপুরের দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করেন, এবং তাঁর নাম দেন শেরগড়। বারি দুর্গটি নির্মাণ করা হয় এরও প্রায় তিন শ বছর আগে—১২৮৬ খৃষ্টাব্দে। ঢোলপুরের আগাগোড়া গল্প শুনতে শুনতে চমক লাগে!

সম্রাট শাহজহানের জন্য একটি বিরাট প্রমোদ ভবন নির্মাণ করা হয় বারি দুর্গে। তার নাম দেওয়া হয় 'খানপুর মহল'। সেই প্রাসাদটির অভ্যন্তরে যে কয়েকটি সুবিস্তৃত ও কারুকার্যময় চত্বর বানানো হয়েছে সেগুলি মোগল আমলের শ্রেষ্ঠ কারুকার্যের পরিচয় দেয়। বিলাস বৈভবের সঙ্গে যে সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ঘটেছিল মোগল যুগের স্থাপত্যকলায়, তারই একটি বড় পরিচয় রয়ে গেছে ঢোলপুরে।

আমার সময় ছিল কম। যাবার আয়োজন ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে, এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছি। ঢোলপুরের দিকে তাকালে সেই পুরনো ইতিহাসের কথাটা মনে পড়ে, যখন শাহজহান তাঁর রোগ শয্যায় শায়িত এবং তাঁর ছেলেরা বাধিয়েছে প্রবল রাজনীতিক দ্বন্দ্ব। সিংহাসনের উপরে উত্তরাধিকার স্বত্ব নিয়ে যখন চারি দিকে প্রবল বিরোধ বেধে উঠেছে তখন এই ঢোলপুরের ওই 'রণ-কা-চবুতরে' দারা শিকো পর্যুদস্ত ও পরাভূত হলেন তাঁর সেজ ভাই আওরঙ্গজেবের

কাছে। সেটি ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ। এর ঠিক একশ বছর পরে পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ ভারতে ইংরাজ সম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন! কিন্তু সেই ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে একে একে মৃত্যু ঘটেছে সকলের। মৃত্যু এবং অপমৃত্যু দুই-ই। শাহজহান, দারা, সুজা, মোরাদ, আওরঙ্গজেব—একে একে সকলের! আবার এই ঢোলপুরেই—আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ওই একই বিবাদ ঘটে—সেই সিংহাসনের প্রতি সেই একই আকর্ষণ! বোধ হয় ময়ুর সিংহাসনটি তখনও ইরানী-লুণ্ঠনে দিল্লী থেকে লোপাট হয় নি, তারই আকর্ষণ। এই ঢোলপুরেরই দূরবর্তী প্রান্তরে আলমগীরের দুই পুত্র আজম ও মুয়াজ্জম—রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন! সেই যুদ্ধে মরতেই হবে একজনকে, নইলে চলবে কেন? আজমেরই বোধ হয় ন্যায্য অধিকার ছিল, সুতরাং তাকেই মরতে হল! সম্রাট হলেন মুয়াজ্জম!

কিন্তু তাঁর নিজের সম্রাটত্বটাও যে 'পদ্মপত্রে নীর'—সেটি ইতিহাসের ছাত্ররা বলবে। আমি নয়।

এর অনেকদিন পরে যখন দৌলতাবাদ দুর্গের তলা দিয়ে পথের পাশ কাটিয়ে আওরঙ্গাবাদের দিকে যাচ্ছিলুম, তখন সেই পথের বাঁ দিকে পড়েছিল একটি শান্ত নিভৃত পরিবেশের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধিস্থল। মোগল যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাটের কবরভূমিটি চারিদিকের বিরাট অপরিচয়ের মধ্যে এমন ভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে দেখে আমার বড় ভাল লেগেছিল!

দুটি অন্ধ বৃদ্ধ ভিখারী—তারা মুসলমান—এই সমাধি মন্দিরের সামনে ভিক্ষা করছিল। তারাও খোদার ফকিরি করছে সন্দেহ নেই, এবং তাদেরও যাবার দিনের আর বিলম্ব নেই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সম্রাট আলমগীরও যে 'ভিখারী' হয়েছিলেন সেই খবরটি দিল আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার—জাতিতে সে মুসলমান। সে বলল, সম্রাটের মৃত্যুকালে তাঁর জেবের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল

মোট চৌদ্দ আনা—এটি তাঁর সোপার্জিত। তিনি সূচীশিল্পের কাজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

চোদ্দ আনা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক সম্রাট আলমগীর সগৌরবে বলেছিলেন, আমার শবদেহের উপরে শুধু মাটি ভরাবার মজুরি! যদি কেউ রাষ্ট্রের অর্থে আমার স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে ছোটে, তবে যেন তার গর্দান নেওয়া হয়!—এই কথা বলে সম্রাট বিদায় নিয়েছিলেন।

সরস্বতী নামটি বোধ করি কোনও নদীর পক্ষে শুভ নয়। দেখে আসছি বাংলাদেশ থেকে। সরস্বতী নদী মাত্রই সব জায়গায় শুকিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাধরীর মত সরস্বতীও বাঁচে নি। প্রয়াগে মরে গেছে সরস্বতী। জয়শলমেরের পথে থর মরুভূমির মধ্যে দেখে বেড়িয়েছিলুম সরস্বতী আর দৃষদ্বতীর অপমৃত্যু ঘটেছে বালুরাশির মধ্যে!

ইন্দোরের প্রান্তে সরস্বতীও হারিয়ে গেছে। এখন যে ক্ষুদ্র নদীটি বয়ে যাচ্ছে তার নাম খান নদী। কিন্তু যদি কেউ সেদিন আমার কানে কানে বলত, ওটা খান নয়, ক্ষণাব অপভ্রংশ—আমি তার সঙ্গে যোগ করে দিতুম, মদিরেক্ষণা!

ইন্দোরের পথের পাশ দিয়ে খান নদী বয়ে চলেছে গ্রামের মেয়ের মত। মাথার খোঁপায় ফুল, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, 'ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,' পায়ের গুল্মেও ফুলের তোড়া বাঁধা! নদীটির দুই পারে অন্তহীন পুষ্পোদ্যান, আমবন, জামবন, পেয়ারা ও বাঁশবন। সেদিন আমার ডায়েরীতে লিখেছিলুম, "নদীর গতিপথটি অরণ্যময়, দ্বীপময়, বনময়—এবং আগাগোড়া যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়—কাব্যময়! মাঝে মাঝে কুঞ্জবন, মাঝে মাঝে রঙ্গীন পাখিরা ডুকরে উঠছে তার তলায় তলায়। চারিদিকে অনন্ত শান্তি!"

কে না জানে, মধ্যভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাণী অহল্যাবাঈ ইন্দোর নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে যখন চতুর্দিকব্যাপী হিংসা, দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম দিল্লী-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলিকে অশান্ত করে তুলেছে, সেই অন্ধকার অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থার কালে রাণী অহল্যাবাঈ ইন্দোর নগরী স্থাপন করলেন। ইতিহাস বলে, একই কালে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুই রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। একজন রাণী ভবানী, অন্যজন রাণী অহল্যাবাঈ। এই দুই মহীয়সী নারী সেদিন একটি নবসভ্যতার পত্তন করেছিলেন—সেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ছিল দানে ও পুণ্যকর্মে। সেই সভ্যতার সঙ্গমতীর্থ হল তীর্থ শ্রেষ্ঠ কাশীতে। সেই সুপ্রাচীন কাশীকে এই দুই নারী নবীনশ্রী দান করেছিলেন।

ইন্দোর নগরী প্রতিষ্ঠার মধ্যে রাণী অহল্যার একটি আদর্শ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের সংসারে শান্তি, এবং মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায় বিচারের একটি মহৎ কেন্দ্র। তিনি ইন্দোরের শাসন ভার আপন হস্তে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধন্য বোধ করেছিল।

'সেণ্টাল লজ' নামক একটি বৃহৎ হোটেলে উঠেছিলুম। সেখানে দৈনিক একটি ঘরের ভাড়া তিন টাকা। সেটি শীতকাল।

ভাবতে ভাবতে পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। এখানে প্রাচীন ভারতের তেমন স্বাক্ষর কোথাও নেই। সমগ্র সুন্দর ইন্দোর নগরীটি যেন রাণী অহল্যাবাঈয়ের একটি স্তব! আসমুদ্র হিমাচল ভারতে এমন জায়গা অল্পই আছে যেখানে অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি সৌধ নেই। ভারতের ইতিহাসে এমন ধর্মপরায়ণা ও চরিত্রবতী সুশাসিকা অল্পসংখ্যকই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাশীর অহল্যাবাঈ ঘাটে বসতে পারলে আজও আনন্দ পাই।

দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম।

মহারাজা টুকাজি রাও হাসপাতাল, ছত্রী মন্দির, অহল্যা

উদ্যান—এগুলি একে একে কালে কালে গড়ে উঠেছে। বৃহৎ হনুমান মন্দিরটি রয়েছে খান নদীর তীরে 'নওলঙ্কায়।' ওখানে রাজোয়ারা —মহারাজার প্রাসাদ। ছত্রী মন্দিরগুলি খান নদীর ধারেই! মাইল দুই এগিয়ে গেলে লালবাগ এবং মানিকবাগের বিশাল প্রাঙ্গণ। দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণী। ওই প্রান্তরের নিরিবিলি ছায়ায় ছায়ায় কাব্যের একটি ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাচ্ছে। এদিকে ডালি কলেজের মস্ত প্রাসাদ, এবং তার পরে রইল সেই বৃহৎ প্রশস্ত একটি হ্রদ, যেটির নাম 'পালা তালাও।' এই হ্রদের চারিপাশে অতি মনোরম এক একটি কুঞ্জবন গড়ে উঠেছে। ইন্দোরের অভিজাত সম্প্রদায়ের নর নারীরা গাড়ি করে আসেন এখানে সান্ধ্য ভ্রমণে। এই 'পালা তালাও'-এর পল্লীতে মেয়েরা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার নাম দিয়েছে 'নগর পালিকা সেবাশ্রম।' ওরই আশেপাশে খৃষ্টান মিশনারী 'নান'-দের কাজ কর্মের পরিচয় পাওয়া গেল। আমার মনে পড়ছে, হনুমান মন্দিরের কাছে নওলঙ্কায় একটি 'গুলর'বৃক্ষ দেখেছিলুম, যার বৃহৎ কোটরের মধ্যে একটি মুসলিম দরগা ছিল—যেটাকে ফুল বেলপাতা, ধূপ ধূনো চন্দন গুগ্‌গুল ও কাঁসর ঘণ্টাসহ আরতি ও পূজা করা হয়। এটি দেখে সেদিন ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম।

নগরের মধ্যে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি মন্দির রয়েছে। ওটির নাম 'শঙ্খমহল।' তাজমহল বানাতে শাহজহানের কত খরচ হয়েছিল আমার মনে নেই। কিন্তু এই মন্দিরের নির্মাতা শ্রীযুক্ত হুকুমচাঁদ শেঠ মহাশয় যদি আজও জীবিত থাকেন তাহলে তাঁর বয়স হয়েছে প্রায় নব্বই বছর। তিনি যদি বলেন, এই শঙ্খমহল নির্মাণ করতে তিরিশ-চল্লিশ কোটি টাকা তাঁর খরচ হয়েছে, তাহলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে।

বড় রাস্তার সামনে একটি বৃহৎ অট্টালিকা দাঁড়িয়ে। কেউ যদি চিনিয়ে না দেয় তবে চট করে বোঝবার জো নেই যে, এটির

মধ্যে একটি কুবেরের ভাণ্ডার লুক্কায়িত রয়েছে। এই মহলের মধ্যে আছে একটি কষ্টিপাথরের এবং দুটি শ্বেতপাথরের বৃহৎ মূর্তি। সেগুলির নাম চন্দ্রপ্রভ, শান্তিনাথ ও আদিনাথ। মণি-মুক্তা, চুনি, পান্না, হীরা এবং সকল প্রকারের ও সকলবর্ণের স্ফটিকে এই মহলের আগাগোড়া ভিতর বাহির ঘর দেওয়াল মেঝে ছাদ বারান্দা সমস্তই পরিপূর্ণ। একটি বৃহৎ মুকুরের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে ব্রোঞ্জের নির্মিত ওই একই জৈন মহাপুরুষগণের মূর্তি—এবং সেগুলি সেই বেলোয়ারী মুকুরে শত সহস্র সংখ্যায় পরিণত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

এই মহলের মধ্যে যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তার সেই বিপুলতার বর্ণনা আমার সাধ্যের অতীত। এমন একটি সম্পদের প্রাচুর্যের চেহারা দেখে এসেছিলুম আজমেরে—যেটি মুইনুদ্দিন চিস্তির 'দরগা শরিফ' নামে মুসলিম জগতে প্রসিদ্ধ।

আমার জানা নেই ধর্মমন্দিরের মধ্যে বিপুল সম্পদ স্তূপীকৃত করে রাখার মূল কারণটি কোথায়। এত জড়োয়া, এত মণিমুক্তা, হীরা, চুনি-পান্না, এত বিপুল পরিমাণ ধনভাণ্ডার—এই বৃহৎ সঞ্চয় কেন? একদা রামেশ্বরম্, মীনাক্ষী, কাঞ্জিভরম, বোম্বাদেবী, রুক্মিণী-দ্বারকা—এদের মন্দিরে ঢুকে বার বারই একথা মনে হয়েছিল! এর জবাব মেলে নি।

ভারতের দারিদ্র্য হাহাকার করে বেড়িয়েছে বহুকাল ধরে। আজও ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এদেশে ওদেশে যেতে হচ্ছে। তার পাশে এই বিপুল পরিমাণ রত্ন সঞ্চয়-এর নিহিতার্থ সহসা খুঁজে পাই নে। বরং সমগ্র ভারতে বর্তমানে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, এই কুবেরের ভাণ্ডারের সঙ্গে যদি তার যোগ থাকত তাহলে সুখী হতুম। প্রতি মানুষের মধ্যে ক্ষুধার্ত নারায়ণ যদি উপবাস করে রইল, তাহলে মন্দিরের ভিতরকার ধনসম্পদ কোন্ কাজে

আসবে? ধর্মমন্দিরের মধ্যে ধনরত্ন সঞ্চয়ের অর্থ আমি বুঝতে পারি নে।

গজনীর মামুদ নাকি একাধিকবার সোমনাথেব মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমবাব যখন সোমনাথ মন্দিরের দেবস্ব লুঠ করেন, তখন সেই লুণ্ঠিত রত্ন ও ধনসম্ভার নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্য নাকি চার হাজার উটের দরকার হয়েছিল।

রাণী অহল্যাবাঈ তাঁর শেষ জীবনে দেবী অহল্যাবাঈ নামে পরিচিত হন। আপামর সাধারণের প্রতি তাঁর যে অসীম করুণা —যে করুণা তাঁকে ভারত-ধাত্রীর পর্যায়ে উন্নীত করে—সেই অন্তহীন অপার করুণার জন্যই তাঁকে দেবী আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর স্থাপত্য-কীর্তি ও দানপুণ্যকর্মের কেন্দ্র কেবলমাত্র ইন্দোরে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে সকল অন্নসত্র, বস্ত্র-বিতরণসত্র, আশ্রয় লাভের ধর্মশালা, মন্দিরে-মন্দিরে বেদ-বিদ্যালয়, রোগনিরাময় কেন্দ্র, সন্ন্যাস আশ্রম, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেগুলি তাঁর ইন্দোর রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। ভারতের নানা নগরে, সাগরের তীরে, নদীর তটে, হিমালয় পর্বতে, বিভিন্ন তীর্থস্থানে—সেগুলি ছড়ানো। চোখে দেখলুম দাঁড়িয়ে, মন্দিরের বিগ্রহ এবং অহল্যা-বাঈয়ের তৈলচিত্র—একই সঙ্গে পূজা পাচ্ছে!

অহল্যাবাঈয়ের কন্যা বিধবা হয়েছিলেন। তখন সতীদাহ প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। কন্যা যখন পূজা ও প্রার্থনা সমাপ্ত করে তার মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তার জননী অহল্যাবাঈ কন্যাকে বহু প্রকার তর্ক-বিতর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বুঝিয়ে আত্মাহুতি-দানের থেকে রক্ষা করার চেষ্টা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কন্যার জন্ম অহল্যাবাঈয়েরই গর্ভে। সে নিরস্ত হয় নি। অবশেষে জননী এসে দাঁড়ালেন জামাতার জ্বলন্ত চিতার সম্মুখে, কন্যা সেই চিতায় ঝাঁপ দিল। অহল্যাবাঈ

স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে শান্ত-চক্ষে দেখলেন, কন্যার দেহ ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হল।

ছত্রীবাগে সকলেরই সমাধি ফলক রয়েছে। হোলকার রাজন্যবর্গ অহল্যার পুত্র মালহররাও, তাঁর পুত্রবধূ এবং অহল্যাবাঈয়ের নিজের। বিস্ময়ের কথা এই, জনসাধারণ চিরদিন বিস্মৃতিশক্তি-প্রবণ হলেও তারা আজও তাদের দেশধাত্রীকে ভোলে নি। অহল্যা-বাঈ আজও সুপ্রত্যক্ষভাবে ইন্দোরবাসীর জীবনের প্রতিদিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সদাজাগ্রত নামটি প্রতি ব্যক্তির মুখে মুখে ঘোরে।

।। পাঁচমারি ।।

বিন্ধ্যগিরি শ্রেণী এবং সাতপুরার মাঝামাঝি অঞ্চলটায় আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য পরস্পরকে সেলাম ঠুকেছে। একদা অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যগিরি পেরিয়ে সেই যে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তিনি বোধ করি আজও ফেরেন নি। তাঁর যাত্রার তিথি ছিল কোনও এক-কালের পঞ্জিকার পয়লা তারিখ।

সাতপুরার সর্বোচ্চ চূড়া ধূপগড়েব নীচে একটি ছোট্ট পার্বত্য শহরের একটি চায়ের দোকানে বসে মুক্তিস্বামী আমাকে স্থান কাল সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন। ডিসেম্বর শেষ হবার তখনও সপ্তাহ-খানেক বাকি!

মুক্তিস্বামী বললেন, মধ্যপ্রদেশের এখন আর সেদিন নেই। যে বনে কাঠুরিয়া আব কালো বাঘ ছাড়া ভিন্ন প্রাণীর দেখা পাওয়া যেত না—দেখে আসুন, সেই সব জঙ্গলের এখানে-ওখানে ইস্কুল-পাঠশালা বসে গেছে। মিশনারীরা গিয়ে ঢুকেছিল আদিবাসীদের আনাচে-কানাচে। খৃষ্টান করে ছেড়েছে হাজার হাজার পরিবার। এখন ওরা ধাক্কা খাচ্ছে এখানে-ওখানে। দেখে আসুন গে মধ্যভারতের নূতন চেহারা।

দোকানে রেডিয়ো বাজিয়ে গান হচ্ছিল। মুক্তিস্বামী তাঁর নিজের কাহিনী বলে যাচ্ছিলেন। গায়ের রং ঘন কালো, চোখ দুটোয় বুদ্ধির প্রখরতা। তাঁর পান-সিগারেট খাওয়ার ধুম দেখলে একটু খটকা লাগে। আমি প্রশ্ন করলুম, রামকৃষ্ণ মিশন আপনি ছাড়লেন কেন?

ছাড়ি নি। শুধু বাঁধন কেটেছি!—স্বামিজী বললেন, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ছাড়া আমার চলবে না! পান-সিগাবেট? এ আমার

বিদ্রোহের চিহ্ন। হ্যাঁ, আমি জানি আপনি অবাক হচ্ছেন—পরনে আমার কালাপাড় ধুতি ফের্তা দিয়ে পরা! গেরুয়া নেই, তাই আপনি অবাক, কেমন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে! মানে দেখা অভ্যেস নেই কিনা—

স্বামিজী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরেকটি পানামা সিগারেট ধরালেন। পরে বললেন, শুনুন, এই আমার পরিচয় হোক—কিছু আমি মানিনে! ধর্ম নয়, গেরুয়া নয়, সন্ন্যাসের স্ট্যাম্প্ও নয়—মানি শুধু মানুষকে, যাদের কাজ করব। সেই কাজ মানুষের কল্যাণের।

কি প্রকার সেই কাজ? একটু আলোকপাত করুন।

বিনা কুণ্ঠায় স্বামিজী বললেন, রুগ্নের জন্য চিকিৎসা আর পথ্য এবং মূঢ় জনসাধারণকে শিক্ষাদান। আপনাদের শুভেচ্ছায় শুধু মধ্যপ্রদেশে আমি চল্লিশটি ইস্কুল বসিয়েছি। ডাঃ কাটজু আমাকে সাহায্য করেছেন যখন যা চেয়েছি! মন্ত্রীরা, পুলিসের কর্তারা কেউ আমাকে কখনও বিমুখ করেন না।—না, না, কথাটা ঠিক হল না! আমাকে বিমুখ করা যায় না!

কেন?—জিজ্ঞাসা করলুম।

আমি যে জাত-সন্ন্যাসী! না খেয়ে পথে পড়ে থাকব, এই আমার অহঙ্কার!—মুক্তিস্বামী বললেন, অপমান করে তাড়ালে স্বীকার করব না যে, আমি অপমানিত! আমি তো মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের দয়া চাই নে, আমি চাই তাদের অন্নের উপর সাধারণের অধিকার! মন্ত্রী তার অন্নের ভাগ দিক একটি নিরন্ন কাঠুরিয়াকে—সেইখানে আমার জোর। পুলিস আমাকে অনেকবার ঠুকরেছে, কিন্তু আমি যে চরম অধিকারের জোর নিয়ে দাঁড়িয়ে! আমাকে মার, যত পার মার, কিন্তু মানুষকে মারলে কিছুতেই সইব না। আমি যে তাদেরই লোক—যারা ভাত-কাপড় না পেয়ে শুকিয়ে মরে।

হাসিমুখে বললুম সত্যি সত্যি আপনি মার খেয়েছেন কখনও ?

খাই নি ?—পেয়ালা ছেড়ে প্রায় রুখে উঠলেন স্বামিজী এবং এতক্ষণ পরে ভালো করে দেখলুম তাঁর মুখশ্রী। আরক্ত দুটো চোখ, কিন্তু সুন্দর। ঘন কালো মুখে টকটক করছে তাঁর পান-খাওয়া ঠোঁট। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য।

বললেন, খাই নি ? বলছেন কি ? হাড়-পাঁজড়া গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওই তারা, যাদের জন্যে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরেছি। ব্ল্যাক-প্যান্থার বেরিয়েছে, ভয়ে গাছে রাত কাটিয়েছি। ভাতের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মাঠের ধারে ফেলে রেখে গেছে—জানি নে বাঁচলুম কেমন করে। মিশনারীরা গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, বাইসন তাড়া করেছে—কিন্তু হার মানি নি। কেন মানব ? আমি যে তীরের ফলার মতন সোজা গিয়ে প্রাণের মধ্যে বিঁধতে জানি! বলুন কে অস্বীকার করবে আমাকে ? মার খেয়ে পিছিয়ে এলেই তো মৃত্যু!

বেলা হয়ে যাচ্ছিল, এবার আমি উঠলুম। মুক্তিস্বামী বললেন, জায়গাটা বেশ। ঘুরে ঘুরে দেখবেন সব। আছেন কদ্দিন ?

এই দু চারদিন।

লিখবেন কিছু নাকি এখানকার সম্বন্ধে ?

আমি হেসে বেরিয়ে গেলুম।

ডিসেম্বরের শেষ। কিন্তু সাতপুরার এই শৃঙ্গ-শহরে এবার শীত তেমন নেই। শহরটির নাম পাঁচমারি—'পঞ্চমর্হি', পাঁচটি কুটীর! এই নামটি এসেছে এই উপত্যকার উপরিস্থিত পাঁচটি গুহার থেকে। দূর প্রান্তরে একটি টিলা পাহাড় কেটে কবে কোন্ কালে কারা যেন পাঁচটি গুহা বানিয়েছিল, এটি আজও চলেছে পঞ্চপাণ্ডবের নামে। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে বুঝি একবার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সনাতনীদের পর বোধ করি এটি কিছুকাল বৌদ্ধরা দখল করেছিলেন—নাম রেখেছিলেন বৌদ্ধ বিহার। অর্থাৎ এই গুম্ফার পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনও তথ্যই নির্দিষ্ট নেই। সাধারণত যা হয়—লোকশ্রুতির উপর এর নানা ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটি তথ্য কেবল পাওয়া যায় হাল আমলে, অর্থাৎ ইংরেজের শাসনকালে। আজ থেকে একশ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর পরোয়ানা নিয়ে ক্যাপ্টেন ফরসাইথ নামক একজন সামরিক কর্মচারী সাতপুরার আরণ্যক অধ্যুষিত বনময় গিরি শ্রেণীর মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকাটি আবিষ্কার করেন। পাঁচমারি উপত্যকা তখনকার আমল থেকেই মধ্যপ্রদেশের গোরা ছাউনিতে পরিণত হয়। আজও এটি মস্ত বড় ভারতীয় সৈন্যাবাস।

কৌতুকের বিষয় এই, এই উপত্যকার কোন কোনও খাদ্যসামগ্রী সামরিক বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটু অবাক হয়েছিলুম এই কথা শুনে, যখন ছোট শহরটির প্রায় প্রত্যেক দোকানদার এই কথা জানান, মাখন-পাউরুটি ইত্যাদি সাধারণের জন্য নয়! খাঁটি দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রায় দুষ্প্রাপ্য। তাজা শাক-সবজি, মাংস, মাছ প্রভৃতি যদি কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, তবেই সাধারণের ভাগে পড়ে। আমাদের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন পাঁচমারির সুখ্যাতি করেন, তখন সম্ভবত এটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—তাঁর সুখ্যাতি শুনে স্বদেশী ও বিদেশী পর্যটকরা এই সুশ্রী উপত্যকাটি ভ্রমণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হন।

দোকানে-দোকানে যখন ঘুরছিলুম তখন সহসা একটি সুশ্রী যুবক কোথা থেকে যেন বেরিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, সে বাঙ্গালী। নাম পরিমল, পান খাচ্ছে প্রচুর। বছর সাতেক আগে একখানি আয়নায় নিজের মুখখানি দেখে তার বিশ্বাস জন্মেছিল, বোম্বাই সিনেমার ছবিতে হিরোর ভূমিকায় তাকে মানাবে ভাল। সে গিয়েও

ছিল বোম্বাইতে। কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল কেন, কেনই বা সে কলকাতায় আর ফেরে নি এবং কেনই বা সে এই পাঁচমারিতে সামান্য খাবারের দোকানের 'বয়' হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, এটি তার কথাবার্তায় স্পষ্ট হল না!

পরিমলের সুদীর্ঘ আত্মকাহিনীর মধ্যে আমি যেন কোথায় আমার নিজের প্রাচীন জীবনের ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম। তাকে সানন্দে তারিফ করছিলুম মনে মনে। এক সময় সোৎসাহে প্রশ্ন করলুম, তুমি নিশ্চয় শূন্য হাতে একদিন বেরিয়ে পরেছিলে পরিমল?

এবার সে সলজ্জ কুণ্ঠায় একটু ইতস্তত করল। পরে মুখ তুলে বলল, আপনাকে লজ্জা করে আর কি হবে? আমি পালিয়েই এসেছিলুম—!

বললুম, বেশ তো—

পরিমল বলল, আমার কাছে ক্যাশ টাকা ছিল অনেক। তা প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকার কাছাকাছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে মহা খুশী হয়ে বললাম, বলো কি পরিমল? সেদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলে কি আনন্দ হত বল তো? আমার কপাল।

পরিমলের এখন বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। বোধ করি সেইজন্যই সে আমার কয়েক গাছা পাকা চুলের দিকে চকিতে একবার তাকাল। পরে সহাস্যে বলল, সে টাকা আমি দুহাতে উড়িয়েছি! বছর দেড়েকের মধ্যেই সব ফাঁক! দুঃখ রাখি নি কিছু! তবে হ্যাঁ, ঠকিয়েও নিয়েছে কেউ কেউ। হাতে টাকা থাকলে কি কি পাওয়া যায়, তা আমি দেখে নিয়েছি, স্যার।

এবার একটু কেসে বললাম, টাকাটা কি তোমার স্বোপার্জিত, না পেলে কোথাও থেকে?

সুন্দর রঙ্গীন দাঁতগুলিতে পরিমল একটু হাসল। তারপর বলল, অত অল্প বয়সে আমি কোথায় অত টাকা পাব, স্যার?

তবু ভাগ্যের জোরে পেয়ে গিয়েছিলুম! টাকাটা আমার এক মাসির—

কথাটা আর না বাড়ানই ভাল! পরিমল ছু খিলি পান আবার মুখে গুঁজে বলল, আমাদের দোকানেব মালিক আমাকে খুব ভাল-বাসেন। ওরা মস্ত কাববারী এখানে। পাঁচমারিতে তিনখানা বড় বড় বাড়ি। আমি যখন যা চাই উনি দেন। চলুন, আমি আপনাকে সব জায়গায় নিয়ে যাব! এখানে সব আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

পরিমলের সঙ্গে তখন থেকে আমার খুব ভাব হয়ে গেল, এবং পাঁচমারির নানা অঞ্চলে আমার ভ্রমণের পক্ষে তার অকৃপণ সাহচর্য বিশেষ কাজে লেগেছিল। তাকে ছেড়ে আসতে ব্যথা পেয়েছিলুম।

দার্জিলিং বা মুসৌরী গেলে পথঘাটই জানিয়ে দেয় যে, ওরা পার্বত্য শহর। শিলঙে অতটা বোঝা যায় না, পাহাড়ী শহরে আছি কি না। কিন্তু পাঁচমারির সমস্তটাই সমতল। সমুদ্র সমতা থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু—কিন্তু আগাগোড়া মসৃণ সমতল। দূর-দূরান্তর অবধি প্রান্তর, বড় বড় বাগান, স্কুল-কলেজের মাঠ, গোরা ছাউনির এক-একটি বিস্তৃত প্রান্তব—অথচ বোঝবাব যো নেই যে এটি পার্বতীয়। এমন জনবিরল, বন সৌন্দর্যময়, পাখি-ডাকা এবং প্রজাপতি পতঙ্গভরা পাহাড়ী শহর অন্তত মধ্য ভারতের পক্ষে কল্পনাতীত।

ডাকবাংলাটির সামনে দিয়ে অর্ধ চন্দ্রাকার পথ চলে গিয়েছে নিরিবিলি মাঠের দিকে। এ যেন আপন মনের পথ! নিজের সঙ্গে কথা কইতে কইতে হাঁটো—কেউ কোথাও নেই! কেউ কুশল প্রশ্ন করছে না, নমস্কার ঠুকে খেলো ধরনের আলাপ জমাতে চাইছে না—অম্ল রোগীদেরও ভিড় নেই! আত্মগোপন করে থাকাব মতও এমন জায়গা দুর্লভ।

ডাকবাংলার পিছন দিকে গিরি-খাদ। এই সকল খাদের নীচে দিয়ে পথ চলে গিয়েছে নানা জলপ্রপাতের দিকে। এইটুকু শহরের আশেপাশে গহন গভীর অরণ্যলোকে শিকারীদের সংশয় দিনে ও রাত্রে ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়। আমাদের ডাকবাংলার বুড়ো খানসামা এখানকার অধিবাসী। নাম মিঃ লরেন্স। বুড়োর কাছে বন-জঙ্গলের দৈনন্দিন ইতিহাস খুব স্পষ্ট। লরেন্স বলল, গত পরশু এই ডাকবাংলাব ধার থেকে যে মহিষটিকে বাঘে নিয়ে গেছে, সেই কৃষ্ণকায় বাঘটি এখান থেকে এখন চার ফার্লংয়ের মধ্যেই আছে, বেশি দূরে সে যাবে না! বাঘ নাকি প্রতিদিন এখানে আসে বার দুই। সন্ধ্যার ঝোঁকে এবং মধ্য রাত্রে। এখানে ধুপগড় যাবার পথে দুই পাশে ঘন জঙ্গল বহু দূর অবধি বিস্তৃত। এই সব জঙ্গলে বাইসনের আক্রমণে মাঝে মাঝে চাষীরা মারা পড়ে। বুঝতে দেরি হয় না, জন্তু জানোয়াব নিয়ে এরা এক প্রকার ঘরকন্না করে। সন্ধ্যার পর কেমন একটা করালচক্ষু নিষুতি ভাব এ অঞ্চলটায় ছমছম করতে থাকে। আমরা বাইরে বেবোবার সাহস পাই নে।

মিঃ লরেন্স সেই পুরনো আমলের খিদমতগার। সামান্য বেতন এবং তার চেয়েও সামান্য পোশাকপত্র। সে বাসন ধোয়, জল তোলে, ঘর ঝাড়ে, কাপড় কাচে, রান্না করে—খানসামা মাত্রই যেমন। কিন্তু তার দুটি শিক্ষিত সাবালক ছেলে এখন উপার্জনশীল। মেয়ে বুঝি দুটি। কৃষ্ণাঙ্গিনী—যে মেয়েটির নাম গায়তি বা গায়ত্রী—সেটি মেয়ে-টিচার। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে শিক্ষয়িত্রী। বেতন এক শ দশ টাকা। মেয়েটি মিষ্টভাষিণী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমার কন্যা শ্রীমতী নন্দিতার সঙ্গে মধুর বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসল। শুধু তাই নয়, যেদিন আমরা চলে আসি সেদিন নন্দিতার হাতে সে গছিয়ে দিল কিছু উপহার-সামগ্রী, যার আর্থিক মূল্য নিতান্ত সামান্য নয়।

লরেন্সকে প্রশ্ন করেছিলুম। বুড়ো বলল, আমি নয়, আমার

বাবা নিয়েছিলেন খৃষ্টধর্ম। ভাত-কাপড় পেয়েছি, কাজ পেয়েছি, অভাব ঘুচেছে, ইজ্জত ফিরেছে। আমরা লেখাপড়া শিখেছি নিখরচায়, স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি খৃষ্টীয় সমাজে। উঁচু-নিচু কেউ নয়, সব সমান। সুতরাং নাই বা রইলুম হিন্দু হয়ে। এ আমরা বেশ আছি, বাবু।

বুড়ো লরেন্স ইংরেজী বোঝে, খৃষ্টান সমাজের সর্বপ্রকার রীতি-নীতির সঙ্গে সে পরিচিত। পর্যটকদের আদর অভ্যর্থনা সে জানে, আবার ওরই মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে গির্জার সার্ভিসেও সে যায়। আমরা যেন অল্পবিস্তর লরেন্স পরিবারের একটু অনুগত হয়ে উঠলুম।

পরিমল একদিন সকালে বলল, চলুন, জটাশঙ্কর দেখতে যাবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

আমাদের প্রাতঃরাশের পর পরিমল আমাদের পান খাইয়ে তবে ছাড়ল। তার ধারণা এখানে আমাদের যত্ন হচ্ছে না, আমাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই এবং নতুন জায়গায় এসে আমরা কোথাও যেন থই পাচ্ছি নে।

পরিমল ?—চলতে চলতে এক সময় ডাকলুম।

পরিমল মুখ ফিরাল। আমি বললুম, তুমি যে আমাদের সঙ্গে এখানে-ওখানে যাচ্ছ, তোমার ছুটি আছে তো ?

কিছু ভাববেন না আপনি। কর্তা আমাকে ভালবাসেন ছেলের মতন। —পরিমল বলল, আমার স্বাধীনতা সব সব সময় আছে! চলুন—

মোট মাইল দেড়েক পথ। মাঠের পথ পেরিয়ে বড় রাস্তা ছাড়িয়ে ক্ষেতখামার ডিঙ্গিয়ে আমরা প্রবেশ করছিলুম বনময় পথে। অতিকায় শাল্মলীর ঘন জটলায় নিচেকার পায়ে চলা অরণ্য পথ ছায়াছন্ন। রৌদ্রোজ্জ্বল বেলা প্রায় দশটা। কিন্তু অরণ্যের নিচের দিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে যেন। এপাশে-ওপাশে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল, ভিতরে ভিতরে তার বড় বড় ফাটল। হিমালয়ের

গ্র্যানাইট নয়—এরা সেই সিংভূম-ধলভূম-ছোটনাগপুরের আলগা পাথরখণ্ডের কালো কালো ছায়া যেন সঙ্গে এনেছে। এদের উপরে রয়েছে সেই আদিম ও প্রাচীন বালিপাথরের ছিদ্রবহুল অবক্ষয়। হায়দরবাদে এদেরকে দেখে বেড়িয়েছি, দেখেছি দক্ষিণ আরাবল্লির কোথাও কোথাও। এরা হিমালয় অপেক্ষা অনেক প্রাচীন-- যখন ভারতবর্ষ ছিল না, ছিল শুধু জম্বুদ্বীপ। এখানে আমাদের পথের চারিদিকে বিশালকায় নির্বাক দৈত্যদল যেন সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজও কালপ্রহরীর মত দাঁড়িয়ে।

অরণ্যের প্রান্তে এসে গিরিখাদের নিচের দিকে নামতে লাগলুম। অনেক নিচে—প্রায় সাড়ে তিন শ ফুটের মত। পাথরের ফাটলে এবং অন্ধ গুহার এখানে-ওখানে ভয় জমে আছে যেন। ভরা মধ্যাহ্নকাল ভিন্ন এখানে আসে না কেউ। নামতে নামতে আমরা এসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের তলাকার অন্ধকারে ঢুকলাম। এক পাশে জটাশঙ্কর মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মুণ্ড-বিগ্রহ বসানো, তার উপরে একটি জটাছত্র। অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না-- কেউ বোধ হয় সিঁদুর মাখিয়ে গেছে। ফুল পড়ে রয়েছে দু-চারটে। পাথরের নিচের দিকে কালো জল ছলছলিয়ে শব্দ তুলে কোন্ দিকে যেন বয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন পশ্চিমের কোনও বিরাট এক ইঁদারার সুগভীর তলদেশে নেমে এসেছি—গা আমাদের ছমছম করছে! সন্ধ্যার দিকে জন্তু ও সরীসৃপ এখানে গুড়ি মেরে এসে বুঝি জল খেয়ে যায়। এই জলেতেই একটি স্রোতস্বিনীর জন্ম হচ্ছে। সেই নদীটির নাম 'জম্বুদ্বীপা!'

মিনিট পনেরোর বেশি এই ছায়াময় গিরিখাদের তলায় থাকার উৎসাহ আসে না। আমরা আবার সেই চড়াই সিঁড়িপথ ধরে উপরে এলুম।

পাঁচমারির আদি অধিবাসী যারা—তারা চিরদিন দারিদ্র্যের

বোঝা বয়ে চলছে। সেই বীভৎস দারিদ্র্য তাদের কারও কারও ঘরে ঢুকে দেখেছি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তারা জীর্ণ। মাঝে মাঝে মিলিটারির পথঘাট তৈরির কাজে এক এক দলকে ডাকা হয়। তখন তারা কাজ পেয়ে বাঁচে। সেই পুরনো সব বস্তির নোংরা নর্দমার ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, সেই সর্বহারার দল, সেই বিনা চিকিৎসায় মুখ বুজে ইহলীলা সাঙ্গ করা—সেই সকাতর প্রার্থনা রেখে যাওয়া ভবিষ্য মানুষের দরবারে! ওদের বস্তির ভিতরকার জীবনযাত্রার চেহারাটা রাষ্ট্রপতির নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

নতুনকালে পাঁচমারিতে এসে যারা জায়গা জুড়েছে তারা ছোট বড় ব্যবসায়ী। তারা কেউ খাদ্যসামগ্রী আনে, কারও মহাজনী দোকান, কেউ হোটেল চালায়, কারও হাতে বা সেগুনের জঙ্গলের ইজারা, কেউ বা আবার সরকারী ঠিকাদার। প্রতি বছরে এপ্রিল মে এবং জুন—এই তিন মাস এখানে মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের দপ্তর উঠে আসে। তখন গমগম করে এই পাঁচমারি। প্রতি বাড়ি ও বাংলোর ভাড়া দশগুণ বেড়ে ওঠে। নইলে অন্য সময়ে প্রকাণ্ড বাগান-সমেত আট-দশটি বৃহৎ সুন্দর সুসজ্জিত ঘর-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ বাড়ি দৈনিক পাঁচ টাকা ভাড়াতেও সহজে মেলে। কলকাতার হারে দেড় শ টাকার বাড়ি শীতকালে পাওয়া যায় পনেরো কুড়ি টাকায়। যারা হোটেলে গিয়ে ওঠে, তারাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে না—কেননা খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য লাভ করে মন খুশী থাকে।

পাঁচমারির যেটি শ্রেষ্ঠ অঞ্চল—সেখানে আজও ইংরেজ আমলের জীবনযাত্রাটা সুস্পষ্ট। পাঁচমারি ক্লাব, হোটেল, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস—এগুলি সব মিলিয়ে আছে পাশাপাশি। এরা সবাই আমাদের ডাকবাংলার প্রতিবেশী।

হঠাৎ হোটেলের ওই প্রাঙ্গণে দেখা হয়ে গেল এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। নাম কমল সরকার। সেই আমলের কমল? মনে পড়ছে

এককালে মিহি পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরে কমল ইস্কুলে যেত। ওদের অবস্থা ছিল ভালো। সেদিনের মত আজও কমলের মুখ হাসি সৌজন্যে ভরা। নন্দিতাকে সে প্রথম দিনেই পালিতা কন্যা বলে ধরে নিল। কমল বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড়। কিন্তু ওর প্রবীণ চেহারা পক্ক কেশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয় পেলুম !

কমল উচ্চকণ্ঠে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, না না, মিথ্যে কথা, তুমি তেমনই আছ।" বুঝলে ভাই, বয়স হল মনের। বুড়ো ভাবলেই বুড়ো !—এস, আমরা এসেছি দলবল নিয়ে। ওই ছাখ, দৈনিক সাড়ে চার টাকার রাজ বাড়ি! প্রতি হলে খাট-পালঙ্ক-দেরাজ আর ফায়ার প্লেস। বৈঠকখানা দেখলে তাক লাগবে। বিকেল বেলায় বাপ-বেটী চা খাবে আমাদের ওখানে !

কমল আজও দারপরিগ্রহ করে নি। স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকলে নাকি তারা বিড়াল আর ময়না পাখি পোষে। পুরুষ পোষে কুকুর আর নয়ত বেকার এক ভাগ্নে! কমলের শখ, সে গাছ পুষবে! সে যেখানেই যায়, দু-চারটি চারাগাছ সংগ্রহ করে আনে! গার্হস্থ্য জীবনে শিশুর পাল নাকি তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কমলের বিধবা ভগ্নী এসেছেন সঙ্গে তার একটি ছেলে ও কন্যা, জামাতাকে নিয়ে। মেয়েটির নাম মাধুরী, জামাইটি মিঃ মিত্র। সঙ্গে মাধুরীর উৎসাহী বালকপুত্র।

আমাদের একটি দল বেশ পাকিয়ে উঠল।

নতুন জায়গায় দ্রষ্টব্য বস্তুর ফর্দ বাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এমন একটি ক্ষুদ্র অনুচ্চ এবং লোকলোচনের বাইরেকার পার্বত্য শহর আমার দেখতে বাকি ছিল—যার সীমানার এক মাইল থেকে তিন মাইলের মধ্যে মোট ছত্রিশটি জলপ্রপাত দেখে নেওয়া যেতে পারে। জনশূন্য বনভূমি, গিরিদরি, এবং গিরিখাদগুলির শোভা সৌন্দর্য, অজানা রহস্যলোকের আকর্ষণ, সন্ধ্যাবেলাকার জঙ্গজানোয়ার-

দের শঙ্কাসঙ্কুল কাহিনী—এই সমস্ত মিলিয়ে সাতপুরার পাহাড়শ্রেণী একটি পৃথক ছবি যেন মনের সামনে তুলে ধরে। শীতের রৌদ্র-উজ্জ্বল নীল আকাশ যেমন নিবিড়, বায়ু তেমনি নির্মল। আলস্যে এবং আনন্দে আমাদের স্থিতিকাল মধুর হয়ে উঠেছিল।

পরিমল আমাদের নিয়ে চলল অম্বিকা দেবীর মন্দিরে—শহর থেকে কিছু দূরে। সামান্য মন্দির, ভিতরে ক্ষুদ্র দেবীর বিগ্রহ। আশে-পাশে গাছপালা ছাওয়া পার্বত্য পরিবেশ। পরিমল বলেছিল, দেবী বড় জাগ্রত! আপনি যা কিছু কামনা করবেন তাই পাবেন। এই ধরুন না একজন গুজরাটী ব্যবসায়ী তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন এই কিছুদিন আগে। এ তল্লাটে অম্বিকাদেবীর মহাত্ম্য সবাই জানে। আপনিও মানত করুন বৃদ্ধ পূজারীর কাছে।

আমার কামনার কথা শুনে বৃদ্ধ পূজারী এবং তাঁর প্রবীণা পত্নী শুধু হাসলেন। বৃদ্ধ বললেন, এ আর এমন কি! ঠিক আছে। আজ আমি যজ্ঞ করব। খরচ হবে বারো টাকা। টাকাটা আপনি দিয়ে যান। কাল সকালে অন্তত লাখ দুই টাকা আপনি পাবেন!

আমিও উৎসাহের সঙ্গে বললুম, কুচ পরোয়া নেই! আমার অ্যাকাউন্টে আপনি বেশ বড় রকমের যাগযজ্ঞ করুন। তারপর কাল বেলা বারোটার মধ্যে আসুন আমাদের ডাকবাংলায়। যা পাব তার আধা-আধি বখরা আপনাদের। —তারপর পরিমলের দিকে চেয়ে বললুম, তোমারও এই সুযোগ ভাই। সেই যে তুমি চৌদ্দ হাজার টাকা নিয়ে একদিন বেরিয়ে এসেছিলে—সেই টাকাটা আমিই তোমাকে দিয়ে যাব পরিমল।

পরিমল অবশ্য মহা খুশী। কিন্তু অম্বিকাদেবীর সম্পর্কে এইসব কাজ-কারবার ধারে করা যায় কি না, এই প্রশ্নটি নিয়ে পূজারী মহাশয় কতক্ষণ তোলাপাড়া করছিলেন। আমরা তখনকার মত এই জাগ্রতা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

বলা বাহুল্য, পরদিন মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল। কিন্তু পূজারী মহাশয় টাকা নিয়ে এসে আর পৌঁছলেন না! পরিমল আমাদের ডাকবাংলার বারান্দায় অধীর আগ্রহে এবং একান্ত বিশ্বাসে বৃদ্ধ পূজারীর আগমনের অপেক্ষায় বসে ছিল। কিন্তু কোনও দিক থেকে কোনও আশ্বাস যখন এল না, তখন পরিমল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে লাগল, এবার বুঝলুম সব মিথ্যে। যজ্ঞ করে দেবীর মন ভোলানো? আপনি কেন ঘুষ দিতে যাবেন? কে দিচ্ছে টাকা? কোত্থেকে আসছে? দুই লাখ টাকা • সোজা কথা? ওই বুড়োটা এতদিন ধরে আমাকে সব মিথ্যে বুঝিয়ে এসেছে। সব ফাঁকি! সব বুজরুকি!

পরিমলেব মানসিক উত্তেজনার চেহাবা দেখে একটু দুঃখিত হলুম। দেবী মাহাত্ম্যের গুণে সে তার সেই পুরনো চৌদ্দ হাজার টাকাটা যেমন করেই হোক ফিরে পাবে—এইটি এক মনে সে বিশ্বাস করেছিল!

আরাবল্লি, সাতপুবা এবং বিন্ধ্য—এই তিনটি গিরিশ্রেণী ছড়িয়ে বয়েছে মধ্য ভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব বাজস্থানে। এরা কাজ করছে ভারতের একটি পঞ্জরাস্থির মত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলায় এসে এই তিনটি গিরিশ্রেণীর মধ্যে সাতপুরাই সর্বোচ্চতা লাভ করেছে। পাঁচমারির পরিপার্শ্বই হল এই উচ্চতার সংযোগস্থল। প্রধানত সাতপুরা এবং বিন্ধ্যাগিরির তলায় তলায় চলে গিয়েছে অনেকগুলি নদী—যেমন চম্বল, বেত্রবতী, বানাস, শোন, নর্মদা ও তপতী। প্রথম কয়েকটি গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিন্ধ্যগিরির তলায় তলায়। চম্বল ও বেত্রবতী গিয়েছে যমুনায়, শোন গিয়েছে গঙ্গায়, এবং নর্মদা ও তপতী পশ্চিম ভারতের ভিতর দিয়ে গিয়েছে কাম্বে উপসাগরে; নর্মদার জন্ম হয়েছে মহাকাল পর্বতের আশেপাশে অমরকণ্টক নামক একটি পর্বত্য অঞ্চলে। এই সকল পাহাড় হল বিন্ধ্যগিরি ও সাতপুরার শিরা-উপশিরা।

পাঁচমারির বৈশিষ্ট্য হল, এটি সাতপুরার প্রাকার বেষ্টিত। ইংরেজ এতকালের মধ্যে জানতে দেয় নি—মধ্যপ্রদেশ যখন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, তখন সেখানে এমন একটি নিভৃত নিকুঞ্জলোক আছে যেখানকার স্নিগ্ধ গিরিখাদগুলির নিচে নেমে গিয়ে নির্মল ও সুশীতল ঝরনার জলে স্নান করে ছায়ানিবিড় প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নেওয়া যায়! ইংরেজের ভয় ছিল, এ জায়গাটা জানাজানি হলে পাছে নেটিভদের ভিড় বেড়ে ওঠে! একথাটা বলা চলে, স্বাধীনতা লাভের পর যেন এই ক্ষুদ্র ও সুন্দর পার্বত্য নগরীটির ঘুম ভেঙ্গেছে। কিটি ক্র্যাগ, বেলভ্যু, ডরোথি ডীপ, ডেইজী খদ, লেডি রবার্টসন ভিউ, হেলেনস পয়েন্ট, আইরিন পুল প্রভৃতি। কিন্তু আজ একে একে তাদের সকল নাম ও কীর্তি মুছে যাচ্ছে।

পাহাড়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়া হল ধূপগড়। পাঁচমারির সমতা থেকে এটি আরও পাঁচ শ ফুট উঁচু। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট। কিন্তু এই ধূপগড়ের চূড়া সমগ্র সাতপুরা বিন্ধ্যগিরি এবং আরাবল্লি মিলিয়ে যতগুলি শৃঙ্গ আছে—তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই চূড়ার আশে-পাশে যে ক্ষুদ্র মালভূমিটি পাওয়া যায়, সেখান থেকে বৃহৎ মধ্যপ্রদেশের সমতল ভূভাগটি চোখে পড়ে।

চিক্কন ও মসৃণ পাকা পথগুলি চলে গিয়েছে নানা দিকে, তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সেই অবারিত দূর-দূরান্তরের অবকাশের মধ্যে এমনি একটি সুন্দর আঁকাবাঁকা পথ ধূপগড়ের দিকে চলে গিয়েছে। অরণ্যবহুল জনবিরল সেই পথে নাকি বাইসন, ভালুক ও ব্ল্যাক প্যান্থার ছিটকিয়ে আসে মাঝে মাঝে। এদেশে বাইসন যখন মানুষকে মারে তখন গভর্নমেণ্ট অবশ্য দুঃখিত হন। কিন্তু মানুষ যদি বাইসনকে হত্যা করে তবে আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয়। জন্তু ছাড়া পায় তার হিংস্রতা সত্বেও, মানুষ শাস্তি পায় তার হিংসার জন্য!

পরিমল আমাদের জন্য একখানি মোটরকার-এর বন্দোবস্ত করেছিল। আমাদের সঙ্গে চলল কমল এবং মাধুরীর ছোট ছেলেটি। যখন ধাপ-গড়িয়ে নিচেকার পাহাড়তলিতে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম তখন অপরাহ্ণ। চড়াই পথটি খুব সুসাধ্য ছিল না। তবু কমল তার নাতি ও নন্দিতাকে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে গেল আঁকা-বাঁকা চড়াই পথে। পরিমলের সঙ্গে আমি চললুম পিছনে পিছনে।

ধূপগড়ের চূড়ার নিচে বিশ্রাম ভবনটি দেখে সেদিন তারিফ করেছিলুম বইকি। তারই সামনে বিস্তৃত সমতল প্রাঙ্গণ—বনবাগানে ভরা। শুনেছিলুম এখানকার সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের দৃশ্য নাকি বড় মনোরম। যেমন মনোরম একদা মনে হয়েছিল দক্ষিণ রাজস্থানের আবু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি বৃহৎ জনতার সমাবেশ ঘটে 'সানসেট পয়েণ্টে'। থর মরুভূমির অনন্ত বালুর গর্ভে নীললোহিতবর্ণ মেঘের তলা দিয়ে সেখানে প্রতিদিনের সূর্য কোথায় যেন হারিয়ে যায়!

আমাদের বিদায় নেবার সময় হয়েছিল। বোম্বাইয়ের দিকে আমরা যাব। আমাদের নিয়ে মোটর বাস এখান থেকে চৌত্রিশ মাইল নেমে গিয়ে পিপারিয়া রেল স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। ডাক-বাংলার সামনে এসে দাঁড়াল মোটর বাস। মালপত্র গাড়িতে তুলল বুড়ো লরেন্স। তার মেয়ে গায়তি এসে নন্দিতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল।

কমল এসে মলিন হাস্যে সদলবলে দাঁড়াল। বলল, বাতি যে এবার নিবল হে?

হেসে বললুম, না, তেল এখনও ফুরোয় নি! এখনও জ্বলবে কিছুদিন!

গাড়ি ছাড়বার সময় কমল আবার বলল, মনে রেখ কিন্তু, যা বলে দিলুম।

এবার আমি খুব হেসে উঠলুম। কেননা, প্রায় আটত্রিশ বছর

পরে এবার দেখা হয়েছিল কমলের সঙ্গে। বোধ হয় সেই সেকালেও কমলের স্নেহসিক্ত কণ্ঠ এমনি করেই কবে যেন ডাক দিয়ে কেঁপে উঠেছিল।—মনে রেখ কিন্তু! ভুলে যেয়ো না যেন!

কথা দিলুম ভুলে যাব না। কিন্তু এরপর আবার আটত্রিশ বছর পরে কে কাকে মনে রাখার জন্য এমনি করে ডাক ছেড়ে উঠবে—বলা কঠিন! হয়তো দুজনেই সেদিন থাকব না। তবু আমার বিশ্বাস, পাঁচমারির এই বেদনাবিধুর মধুর মধ্যাহ্নের ডাক সেদিনও শুনতে পাব—যেখানেই থাকি না কেন।

কমলের দিকে চেয়ে আবার হাসলুম। মোটর বাস ছেড়ে দিল।

পরিমল দাঁড়িয়েছিল বাস স্ট্যাণ্ডে। তার ছলছলে চোখের মধ্যে যেন অন্য কথা ছিল। আমাদের সঙ্গে সে যেন আরেকবার হারাল তার জননী জন্মভূমি বঙ্গদেশকে—যেখানে আর কোনওদিন সে হয়তো ফিরবে না! বঙ্গভাষা সে হারিয়েছে, বাঙ্গালীর পোশাক পরিচয় পরিবেশ---সবই সে হারিয়েছে। হারায় নি শুধু মন—সেই মন তার দুই চোখে টলটল করে উঠল!

মিলিটারি ব্যাণ্ড মাস্টার বাঙ্গালী। মিঃ চৌধুরী নমস্কার জানাতে এসেছিলেন। নিরীহ এবং মিষ্টভাষী ভদ্রলোক শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি মোটামুটি এক রকম মন্দ নয়! এমনি করেই চলে যাবে।

অর্থাৎ ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন বৃহত্তর ভারতে। নিতান্ত দুঃখে তিনি নেই! দিন চলে যাচ্ছে।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। পরিমলের মুখের দিকে আর চেয়ে থাকা গেল না।